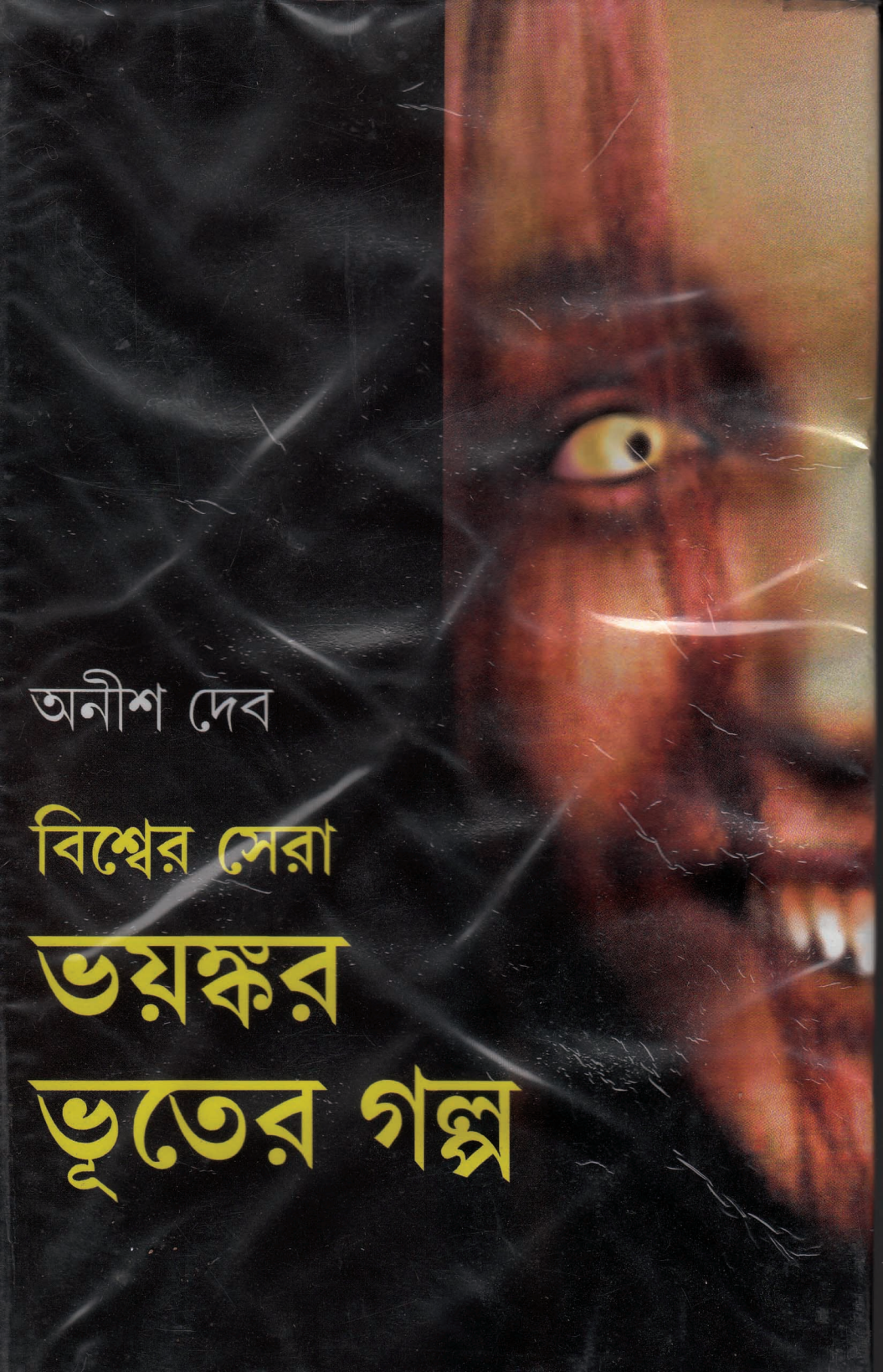

অনীশ দেব

বিশ্বের সেরা

ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প

Corvus (Pintu Das)

The social Sweeper

A Member of pathager.net

Against All Dirty Activity

বিশ্বের সেরা

ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প

pathagar.net

বিশ্বের সেরা

ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প

www.pathagar.net

সম্পাদনা ও অনুবাদ

অনীশ দেব

pathagar.net

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

পত্র ভারতী সংস্করণ
জানুয়ারি ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৭
তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৯

WORLD'S MOST FRIGHTENING GHOST STORIES
Edited & Translated by
Anish Deb

ISBN No. 81-8374-008-1

প্রচ্ছদ
সৌরীশ মিত্র

pathagar.net

মূল্য
১৩০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phone 2241 1175 Fax 2354 0462
e-mail : patrabharati@gmail.com
Website : bookspatrabharati.com
Price Rs. 130.00

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ কৃষ্ণকান্ত মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

www.pathagar.net

আনন্দ বাগচী

শ্রদ্ধাভাজনেষু

pathagar.net

পিনটু দাস
ক্রমিক সংখ্যা
তারিখ
ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

pathagar.net

সূচিপত্র

এইচ. আর. ওয়েকফিল্ড	ভূতের সন্ধানে	১১
এইচ. জি. ওয়েল্‌স	অনভিজ্ঞ প্রেত	১৭
ভিনসেন্ট ও'সালিভ্যান	জীবিত ও মৃত	২৯
আগাথা ক্রিস্টি	প্রেতচক্র	৩৪
টম ক্রিস্টেনসেন	অদৃশ্য মুখ	৪৭
ডুলসি গ্রে	নেকলেস	৫৩
ডব্লিউ. ডব্লিউ. জ্যাকব্‌স	অন্ধকার গভীর	৫৭
ট্যালমেজ পাওয়েল	১৪ নম্বর ড্রয়ার	৭০
এডগার অ্যালান পো	ছায়াছবি	৮২
এ. এম. বারেজ	লুকোচুরি	৮৫
অ্যামব্রোস বিয়ার্স	খোলা জানলা	৯৬
অ্যামব্রোস বিয়ার্স	কোনও গ্রীষ্মের রাতে	১০০
অ্যামব্রোস বিয়ার্স	অপমৃত্যু	১০৩
ই. এফ. বোজম্যান	লাল ছড়ি	১০৭
জোসেফ পি. ব্রেনান	জাদুকর	১১২
রে ব্র্যাডবেরি	নিজের সঙ্গে দেখা	১১৭
রবার্ট ব্লক	কালো পোশাক	১২৭

Corvus

রবার্ট ব্লক	আপনারই একান্ত, জ্যাক দ্য রিপার	১৪২
গী দ্য মপাসাঁ	স্বপ্ন অথবা	১৬৬
রিচার্ড ম্যাথিসন ও রিচার্ড ক্রিশ্চান ম্যাথিসন	কবর	১৭১
মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট শেলি	যযাতি	১৭৯
সাকি	নেকড়ে	১৯৪
আইজ্যাক ব্যাশেভিস সিঙ্গার	দুশমন	২০১
হেনরি সিসিল	প্রমাণ	২১০
ব্র্যাম স্টোকার	ড্রাকুলার অতিথি	২১৪
এ. ই. ডি. স্মিথ	ওভারকোট	২২৪
উইলিয়াম স্যানসম	রহস্যময়ী	২৩১
গেলর্ড স্যাবাটিনি	ক্যাকটাস	২৩৫
উইলিয়াম হোপ হজসন	আঁধার রাতের আগন্তুক	২৪৯
মাইকেল হার্ডউইক ও মলি হার্ডউইক	ঘুমপাড়ানি গান	২৬২
এডওয়ার্ড লুকাস হোয়াইট	অভিশাপ	২৬৮
লর্ড হ্যালিফ্যাক্স	ট্রেনের যাত্রী	২৮২
লর্ড হ্যালিফ্যাক্স	আবার আমি এসেছি!	২৮৬

pathagar.net

সংস্করিত ভূতের ভূমিকা

বছর পনেরো আগে এই বইটি সতেরোটি গল্প নিয়ে শীর্ণ আকারে প্রথম হাজির হয়েছিল। তারপর নানা সংস্করণে গল্পের সংখ্যা সাধ্যমতো বাড়িয়েছি। বাড়তে-বাড়তে সংখ্যাটা কখন যেন তেত্রিশ ছুঁয়ে ফেলেছে। এর পরেও আমার ভালো লাগা দু-চারটে গল্প এই সংকলনে জুড়ে দেওয়ার সাধ রইল।

সংকলনের প্রতিটি গল্প যেমন বাছাই করেছি যত্ন নিয়ে, তেমনই অনুবাদের ক্ষেত্রেও সাধ্যমতো যত্ন নিয়েছি। অনুবাদের ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি গল্পেই মূলানুগ থেকেছি, আর সম্পাদনার স্পর্ধা দেখিয়েছি ক্বচিৎ-কদাচিৎ।

সংকলনটির নামকরণে একাধিক বিশেষণ বিদগ্ধ পাঠককে বিচলিত করতে পারে। প্রশ্নও উঠতে পারে অনেক। সেই কারণেই স্বল্প পরিসরে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা। যে-গল্পগুলো সংকলনে জায়গা পেয়েছে সেগুলো আমার নিজস্ব পছন্দ। ঘটনাচক্রে অথবা প্রয়োজনে ভৌতিক-অলৌকিক-হরার গল্প প্রচুর পড়ে ফেলার সুযোগ হয়েছে। তার মধ্যে যেগুলো আমার কাছে বিশিষ্ট, সেগুলোই এখানে হাজির করেছি। সংকলনের বেশিরভাগ গল্পই অপার্থিব-অলৌকিক, ভূতের উপদ্রবও কোনও-কোনও কাহিনিতে অল্পবিস্তর রয়েছে। এ ছাড়া আছে নিতান্তই হরার (রোমহর্ষক বললে যার চরিত্রের কিঞ্চিৎ আঁচ পাওয়া যায়) কাহিনি কয়েকটি। অলৌকিক ও ভৌতিকের সূক্ষ্ম সীমারেখা অধুনা প্রায়-বিলুপ্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর হরার রসের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় বোধহয় খুব বেশি ঘটেনি। ফলে '...ভূতের গল্প' নামটাই সবকটি গল্পের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আমার তরফে সাফাই এইটুকুই। বাকি দুটি বিশেষণ 'বিশ্বের সেরা' ও 'ভয়ঙ্কর'-এর দায়-দায়িত্ব এই বইয়ের প্রথম প্রকাশকের। তাঁর মনে হয়েছিল, গল্পগুলো যথার্থই 'ভয়ঙ্কর'। এবং একইসঙ্গে আমার পছন্দের বাছাইকে প্রচণ্ড দুঃসাহসে 'বিশ্বের সেরা' বলতেও তাঁর ভয় করেনি।

এই নতুন সংস্করণে অত্যন্ত শ্রম ও সময় দিয়ে লেখা ঘষামাজা করেছি। আগের যত মুদ্রণ প্রমাদ ছিল তাদের সবিনয়ে বিদায় দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তাই এই সংস্করণকে বলা যেতে পারে 'আলটিমেট এডিশান'।

সংকলনের কাজ শেষ করতে গিয়ে আর এক সংকট ঃ সেটা হল গল্পের ক্রম। বিদেশি লেখকদের নাম-ডাক নিয়ে সব দেশেই বিতর্ক। ফলে লেখক কিংবা গল্পের গুণগত বা দৈর্ঘ্যগত বিচারে না গিয়ে স্রেফ লেখকদের পদবির বাংলা বর্ণানুক্রমে তাঁদের একে-একে হাজির করেছি। সংকলিত ভিনদেশি ভূতের ভবিষ্যৎ এখন বর্তমান পাঠকদের হাতে।

সুতরাং, গল্প পাঠের পর বিনিদ্র রজনী কামনা করে...

অনীশ দেব
জানুয়ারি, ২০০৬

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০ ০০৯

pathagar.net

লেখকের অন্যান্য বই

হিমশীতল

আমি পিশাচ

মার্ডার ডট কম

দুঃখী রাজকুমার

অন্তরে পাপ ছিল

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১ (সম্পাদিত)

রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প (সম্পাদিত)

pathagar.net

ভূতের সন্ধানে

এইচ. আর. ওয়েকফিল্ড

pathagar.net

নমস্কার বন্ধুগণ, টনি ওয়েলডন বলছি। ভূত ধরার জন্যে আমরা যে-লাগাতার অভিযানের ব্যবস্থা করেছি, এটা তারই তিন নম্বর অভিযান। আমরা আশা করছি, এবারের অভিযান আগের দুটোর চেয়ে অনেক বেশি সফল হবে। আমাদের আয়োজন বন্দোবস্ত সব শেষ, এখন ভূতেরা কৃপা করে দেখা দিলেই হয়। আজ রাতে আমার সঙ্গী প্যারিসের অধ্যাপক মিগনোঁ। প্রেততত্ত্বের গবেষক হিসেবে দুনিয়ায় সেরা। তাঁর সঙ্গী হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত।

এখন আমরা মাঝারি সাইজের চারতলা এক বাড়িতে রয়েছি। লন্ডনের কাছাকাছি রাজা জর্জের আমলের এক পুরোনো বাড়ি। এই বাড়িটা বেছে নেওয়ার কারণ একটাই ঃ বাড়িটার ইতিহাস সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর। তৈরি হওয়ার পর থেকে অন্তত তিরিশজন যে এই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে সে খবর আমরা পেয়েছি। কানাঘুষোয় শোনা যায় সংখ্যাটি আসলে নাকি তিরিশের অনেক বেশি।

এখানে বলা দরকার, এই আত্মহত্যাগুলো হয়েছিল রীতিমতো বিচিত্রভাবে। কেউ সিলিংয়ে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছে, কেউ গুলি করেছে নিজের মাথায়, কেউ-বা লাফিয়ে পড়েছে বাড়ির ছাদ থেকে, আর কম করে ন'জন এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছে—মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে তারা সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাছাকাছি এক নদীতে। বাড়ির লাগোয়া বাগান। বাগানের সীমানা থেকে প্রায় একশো গজ দূরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে খরস্রোতা নদী। শেষ যে-লোকটি এখানে আত্মহত্যা করেছিল তাকে নাকি ভোরবেলায় দেখা গিয়েছিল উদভ্রান্তের মতো ছুটন্ত অবস্থায়। আর সে

এমনভাবে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকছিল, যেন তার সঙ্গে আরও অনেকে দৌড়চ্ছে। বাড়িওয়ালা বলেছে, কোনও লোকই এ-বাড়িতে থাকতে রাজি নয়, আর দালালরা এ-বাড়ি বিক্রির চেষ্টায় জবাব দিয়ে দিয়েছে। বাড়িওয়ালা নিজেও এ-বাড়িতে থাকতে চায় না। কারণ অত্যন্তই স্পষ্ট—যদিও সে কারণ খুলে বলতে চায় না। তা হলে নাকি আমাদের মনে একপেশে চিন্তা এসে যাবে। সে বলেছে, অধ্যাপকদের গবেষণার সিদ্ধান্ত যদি মনের মতো না হয় তা হলে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে নতুন করে আবার তৈরি করবে। মন্দ কী! সেটা করলে অন্তত 'ভুতুড়ে বাড়ি' বদনামটা ঘুচবে।

যাক, পরিচয়ের পালা শেষ হল। এতক্ষণে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, এই ভয়ংকর ভুতুড়ে বাড়িটার আগাপাশতলা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তবে ফলাফল, অর্থাৎ ভূত-টুত, কিছু পাওয়া যাবে কিনা সে-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি না। কারণ দেখা গেছে, এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের সময় হঠাৎ করে বিনা নোটিশে ছুটি নিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত অভ্যেস ভূতগুলোর বেশ রপ্ত হয়ে গেছে।

আচ্ছা, এবারে কাজের কথায় আসি—আমি এখন বসে আছি একতলার একটা বড়সড় হলঘরে, পালিশ করা একটা কাঠের টেবিলের সামনে। ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র সাদা পলিথিনের চাদরে ঢাকা, যাতে ওগুলোর কোনওরকম ক্ষতি না হয়। ঘরের দেওয়াল পালিশ করা ওক কাঠের তৈরি। বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু আমার সামনে জ্বলছে একটা অল্প পাওয়ারে বাল্‌ব। আমি এখানে মাইক নিয়ে বসে আছি আপনাদের ধারাবিবরণী শোনানোর জন্যে, আর অধ্যাপক মিগনোঁ সেই ফাঁকে বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিছু পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজে। উনি মাইক পছন্দ করেন না, কারণ তাতে তাঁর কাজের অসুবিধে হয়। তা ছাড়া এ-ধরনের তদন্তের সময় আপনমনে প্রলাপ বকার এক বদঅভ্যেস তাঁর আছে—তাঁর কাছেই শুনেছি। খবর দেওয়ার মতো কোনও কিছুর খোঁজ পেলেই অধ্যাপক আমার কাছে চলে আসবেন। আশা করি বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না আপনাদের। আচ্ছা, এই নিন, অধ্যাপক এসে গেছেন, অভিযানে রওনা হওয়ার আগে উনি আপনাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে চান। আসুন, প্রফেসর মিগনোঁ—।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রফেসর মিগনোঁ বলছি। এই বাড়িটার—ইয়ে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে অশুভ শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর প্রভাব বেশ ভালোই টের পাওয়া যায়। খারাপ, খুব খারাপ! এই বাড়ির ভয়ংকর অতীতের অশুভ গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। এ-বাড়ি না ভেঙে ফেললে নিস্তার নেই। আমার বন্ধু, মিস্টার ওয়েলডন, হয়তো সেরকম কিছু টের পাচ্ছেন না, কারণ তিনি আমার মতো সাইকিক নন, প্রেততত্ত্ব-বিশারদ নন। এবারে কথা হল সত্যিই কি ভূত-প্রেতের দেখা আমরা পাব? নাঃ, সে-কথা হলফ করে বলতে পারি না। তবে অশুভ শক্তি যে এই প্রাচীন বাড়ির আনাচেকানাচে জমাট বেঁধে রয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

হয়তো কোনও বিপদও দেখা দিতে পারে। একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এবার আমি একটা টর্চ নিয়ে রওনা হব। তারপর আবার ফিরে আসব আপনাদের কাছে। জানাব আমার অনুসন্ধানের ফলাফল। তবে মনে রাখবেন, ভূত-প্রেতকে মনপ্রাণ দিয়ে আমরা ডাকতে পারি, কিন্তু সবসময় সে যে আমন্ত্রণে সাড়া দেবে তার কোনও ঠিক নেই। দেখা যাক—।'

বন্ধুগণ, বিশেষজ্ঞের মতামত আপনারা শুনলেন। সত্যি কথা বলতে কী, এই বিশাল ঘরে একা-একা বসে এই কথাগুলো শুনে আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। প্রফেসরের এ-কথা ঠিক নয় যে সাইকিক না হওয়ার ফলে আমি কিছুই টের পাচ্ছি না। কারণ, জায়গাটা আমার মোটেই সুবিধের ঠেকছে না। মনে হচ্ছে, বাড়িটা যেন আমাদের ঠিক মেনে নিতে পারছে না, আমরা চলে গেলেই যেন খুশি হয়। সদর দরজা পার হওয়ার সময়েই সেটা আমি টের পেয়েছি। না, ঠাট্টা করছি না, আর আপনাদের মিথ্যে আশা দিচ্ছি না। যা সত্যি তাই বলছি।

চারদিক চুপচাপ। আমি এখন চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছি। আলোটা নানারকম অদ্ভুত সব ছায়া ফেলছে। দরজার পাশেই দেওয়ালে একটা কিম্ভূতকিমাকার ছায়া পড়েছে। না, ওটা বোধহয় বুককেসটার ছায়া—ঘরে ঢুকেই সাদা চাদর তুলে উঁকি মেরে দেখেছিলাম। ভাবতে অবাক লাগছে যে, আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন। আপনাদের দু-চারজনকে সঙ্গী হিসেবে পেলে মন্দ হত না। বাড়িওয়ালা বলেছে, এ-বাড়িতে ইঁদুর আর ছুঁচোর ভয়ংকর উপদ্রব আছে। হ্যাঁ, এখন ওদের চলাফেরার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে বিশাল চেহারার ইঁদুরই হবে। আপনারাও আশা করি ওদের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

আপাতত আপনাদের আর বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি, ঘরে একটা বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে। না, কোনও পাখি নয়, বাদুড়ই হবে। ওটাকে ঠিক দেখিনি, তবে এইমাত্র যখন উড়ে গেল তখন ছায়াটা দেখেছি। যাওয়ার সময় আমার মুখের কাছে ডানা ঝাপটে গেল। বাদুড়ের চরিত্র সম্পর্কে আমার বিশেষ জানা নেই, তবে আমার ধারণা ছিল শীতকালে ওরা চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকে। হতে পারে এ-বেচারা হয়তো অনিদ্রায় ভুগছে। ওই, আবার আসছে—এবার আমার মাথায় ঝাপটা মেরে গেল—।

ওপরতলায় প্রফেসরের চলাফেরার শব্দ এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আপনারাও চেষ্টা করলে হয়তো শুনতে পাবেন—নিন, ভালো করে কান পাতুন—।

আরে, কী হল! শুনতে পেলেন শব্দটা? প্রফেসর নিশ্চয়ই কোনও চেয়ার-টেয়ার উলটে ফেলেছেন, বেশ ভারি চেয়ার, অন্তত শব্দটা শুনে যা মনে হচ্ছে। কে জানে, কিছুর খোঁজ পেলেন কি না! ওঃ, বাদুড়টা আবার জ্বালাতে আসছে—মনে হয় আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। প্রত্যেকবার উড়ে যাওয়ার পথে আমার মুখে ডানা

pathagar.net

ঝাপটে যাচ্ছে। বাদুড়টা মনে হয় স্নান-টান করে না। ওটার গা থেকে রীতিমতো পচা গন্ধ বেরোচ্ছে।

ওপরতলায় প্রফেসর কী উলটে ফেলেছেন কে জানে—সিলিংয়ে একটা ছোট দাগ দেখতে পাচ্ছি। হয়তো কোনও ফুলদানি উলটে গিয়ে থাকবে। আরে! শুনতে পেলেন শব্দটা? নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন। মনে হয়, কাঠের তক্তা খোলার শব্দ। ওঃ, ঠিক যেন বাজ পড়ার মতো। আমার পায়ের ওপর দিয়ে কী যেন ছুটে গেল। হয়তো কোনও ইঁদুর। ইঁদুরকে আমার ভীষণ ঘেন্না করে। অবশ্য সবারই করে—।

সিলিংয়ের দাগটা ধীরে-ধীরে বড় হয়ে উঠছে। ভাবছি উঠে গিয়ে দরজার কাছ থেকে প্রফেসরকে ডেকে দেখি উনি আছেন কি না। আশা করি আপনারা আমার ডাক ও তাঁর উত্তর, দুই-ই স্পষ্ট শুনতে পাবেন।

প্রফেসর—প্রফেসর—।

নাঃ, কোনও উত্তর নেই। ভদ্রলোক কানে একটু কম শোনেন। নিশ্চয় ভূতের খোঁজে তোফা আছেন। এসময় বারবার ডেকে বাগড়া দিলে উনি বিরক্ত হবেন। দু-চার মিনিট একটু অপেক্ষা করে দেখি। বন্ধুগণ, আপনাদের নিশ্চয়ই খুব নীরস একঘেয়ে লাগছে এই ধারাবিবরণী। কিন্তু যা দেখব, শুনব, তাই তো আমাকে—ওই তো, প্রফেসরের কাশির শব্দ শুনলাম। আপনারা শুনতে পাননি...বেশ ঘড়ঘড়ে গলায় দু-দুবার কাশির শব্দ। শব্দটা মনে হয় এল ওদিকের—আচ্ছা, প্রফেসর কি চুপিচুপি নীচে নেমে এসেছেন? তারপর লুকিয়ে-লুকিয়ে মজা করছেন আমার সঙ্গে। কারণ, সত্যি বলছি, বন্ধুগণ, জায়গাটা যেন কীরকম লাগছে। হাজার টাকা দিলেও এই বাড়িতে আমি কোনওদিন থাকছি না—সরে যা, হতচ্ছাড়া শয়তান কোথাকার। বাদুড়টা—হুঁঃ। কী বিশ্রী দুর্গন্ধ বাব্বাঃ—।

এবারে ভালো করে শুনুন—ইঁদুরগুলোর শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? ওঃ, এখান থেকে এখন বেরোতে পারলে বাঁচি। এবার বেশ বুঝতে পারছি, অতগুলো লোক কেন এ-বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে। গোটা জীবনে শান্তি না পেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তি পেয়েছে—।

এই হতচ্ছাড়া বাড়িটা মোটেই আর সুবিধের ঠেকছে না। আগে যে-দুটো বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিলাম সেখানে এরকম মনে হয়নি। অথচ এখানে—প্রফেসরের হল কী? কাশির পর তো আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না! কাশির শব্দটা ওঁরই ছিল তো? কিন্তু, তা হলে—ওঃ, সর-সর, ঘেয়ো জানোয়ার কোথাকার! এই বাদুড়গুলোই দেখছি আমাকে শেষ করবে! আমাকে মারবে—!

আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। বন্ধুগণ, আপনারা যদি পালটা কথা বলতে পারতেন তা হলে আরও ভালো হত। শুধু নিজের গলা শুনতে কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগছে। একা-একা এভাবে বসে একটানা কথা বললে

pathagar.net

নানান উদ্ভট চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করে। কখনও ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখেছেন? মনে হয়, সত্যি যেন কেউ কথার উত্তর দিচ্ছে।

ওই তো! না, শব্দটা আপনাদের শুনতে পাওয়ার কথা নয়, কারণ ওটা হয়েছে আমার মাথায়, মনের ভেতরে, কল্পনায়। অদ্ভুত না! হ্যাঁ, ওটা আমার হাসির শব্দ। আপনাদের নিশ্চয়ই খুব বিরক্তি লাগছে, বন্ধুগণ, কিন্তু আমার একটুও লাগছে না। এ পর্যন্ত ভূতের কোনও পাত্তা নেই—অবশ্য ইতিমধ্যে প্রফেসর যদি না দু-একটা ধরে থাকেন—।

ওই যে! এবার নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন! ওঃ, কাঠের কী বীভৎস শব্দ! যাক, তবুও তো কিছু শুনতে পেলেন আপনারা! হাঃ-হাঃ-হাঃ। প্রফেসর। প্রফেসর। হুঁ, জব্বর প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

এবার বন্ধুগণ, কিছুক্ষণ আমি চুপচাপ থাকব। নিশ্চয় আপনারা এতে কিছু মনে করবেন না। দেখা যাক, কোনও শব্দ আমরা শুনতে পাই কি না—শুনতে পেয়েছেন? কীসের শব্দ ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? বাড়িটা যেন একটু কেঁপে উঠল, জানলাগুলো খটখট করে উঠল। নাঃ, আমি বরং কথাই বলতে থাকি। জানি না, এরকম পরিবেশ কতক্ষণ সহ্য করা যায়। এ তো যে-কোনও মানুষকেই কাত করে দেবে দেখছি—আরে! দাগটা অনেক বড় হয়ে গেছে আগের চেয়ে—হ্যাঁ, সিলিংয়ের দাগটা। এক্ষুনি হয়তো চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ফোঁটা পড়বে। দেখে মনে হচ্ছে রঙিন কোনও তরল। প্রফেসরের কিছু হয়নি তো? না মানে, হতে পারে উনি হয়তো কোনও আলমারির ভেতরে নিজেকে বন্ধ করে রেখেছেন—ভূতের খোঁজ করছেন—আসলে এ-বাড়ির আসবাবপত্রগুলো তেমন সুবিধের নয়।

এবার হলফ করে বলতে পারি এই ছায়াটা অনেকটা সরে গেছে। অবশ্য হতে পারে, আলোটা আমি সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখেছি। সত্যি, ছায়ার খেলা বড় বিচিত্র। এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা লোক দু-হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। বেশ মজায় আছি, তাই না? আমার এক মাসি গ্যাস বার্নার খুলে আত্মহত্যা করেছিল। আসলে...জানি না, হঠাৎ এ-কথা কেন আপনাদের বলতে গেলাম। এ তো এখানকার নাটকের বাইরে—।

প্রফেসর! প্রফেসর! কোথায় গেল বেতো ফরাসি বুড়োটা? বাড়িওয়ালাকে তো আমি সোজা বলব এ-বাড়ি ভেঙে ফেলতে। তখন তোমরা কোথায় যাবে? একটু পরে ওপরে গিয়ে বরং দেখে আসব প্রফেসরের কী হল। হ্যাঁ, যে-মাসির কথা আপনাদের বলছিলাম...।

বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, এখানে আর বেশিক্ষণ থাকলে আমি স্রেফ পাগল হয়ে যাব—বদ্ধ পাগল। বড় কাহিল করে দেয়। এইভাবে বসে অপেক্ষা করার ব্যাপারটা ভীষণ কাহিল করে দেয়। আপনাদের খুব একঘেয়ে লাগছে, বন্ধুগণ? তা হলে রেডিয়ো

pathagar.net

বন্ধ করে দিন, নয় অন্য কোনও প্রোগ্রাম শুনুন। আমি হলে তাই করতাম।

দেখেছেন, একটু আগে আপনাদের কী বলেছিলাম! সিলিং থেকে চুঁইয়ে ফোঁটা-ফোঁটা করে পড়তে শুরু করেছে। টুপটাপ। টুপটাপ। টুপটাপ। যাই, গিয়ে হাত পেতে দেখি ওটা আসলে কী—।

ওঃ ভগবান!

প্রফেসর। প্রফেসর। প্রফেসর। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যাক। কোন দিকের ঘরটা? ডানদিকে...বাঁদিকে? ডান, বাঁ, ডান, বাঁ—বাঁদিকের ঘরেই রয়েছে। ভেতরে যাওয়া যাক—।

শুভ সন্ধ্যা। প্রফেসরকে নিয়ে কী করছ তোমরা? জানি, উনি মারা গেছেন—দেখছ না আমার হাতে ওঁর রক্ত? কী করেছ তোমরা ওঁকে নিয়ে! সরে যাও, সরে দাঁড়াও বলছি। কী করেছ দেখি? কী বলছ—আমাকে গান গাইতে হবে? ট্রা—লা—লা—।

রেডিয়ো বন্ধ করে দে বোকার দল।

সত্যি, কী অদ্ভুত—হা-হা-হা-হা। আমার হাসি শুনতে পাচ্ছেন, বন্ধুগণ, বন্ধ করে দে রেডিয়ো।

ওখানে কে শুয়ে আছে? ওটা প্রফেসর হতেই পারে না—তাঁর তো এমন লাল দাড়ি ছিল না। এ কী! তোমরা এমন করছ কেন? সরে দাঁড়াও, সরে যাও বলছি।

বেশ, বলো, কী করতে হবে আমাকে। কী, নদীতে যেতে হবে? হা—হা। এক্ষুনি? তোমরাও সঙ্গে আসবে? বাঃ, বেশ। চলো, তা হলে নদীতেই যাওয়া যাক। নদী। সোজা নদী।

pathagar.net

অনভিজ্ঞ প্রেত

এইচ. জি. ওয়েল্‌স

pathagar.net

যে পরিবেশের মাঝে বসে ক্লেটন তার শেষ গল্প শুনিয়েছিল সেটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। বেশিরভাগ সময়টাই সে বসেছিল ঘরের ওই কোণে বড়সড় অগ্নি-আধারের পাশে রাখা প্রাচীন সোফাটার ধার ঘেঁষে, আর তার পাশেই বসে ছিল স্যান্ডারসন—নিজের নাম লেখা ব্রোসলি মাটির পাইপ থেকে ধূমপানে মগ্ন। ইভান্স ছিল, আর ছিল অভিনয় জগতের রত্ন, উইশ—অবশ্য সে খুব বিনয়ীও বটে। সেই শনিবারটায় আমরা সকলে মিলে 'মারমেইড ক্লাব'-এ এসেছি সকালবেলায়—শুধু ক্লেটনই এর ব্যতিক্রম, কারণ গতকাল রাতটা সে ক্লাবেই কাটিয়েছে—এবং এ-ঘটনা থেকেই তার গল্পের অনিবার্য সূত্রপাত। যতক্ষণ বল দেখা যায়, ততক্ষণ আমরা গল্‌ফ খেলেছি। তারপর রাতের খাওয়াদাওয়াটাও সেরে নিয়েছি, ফলে প্রত্যেকের মেজাজে গল্পের যন্ত্রণা সহ্য করার মতো একটা শান্ত দয়ার আবেশ। ক্লেটন গল্প শুরু করতেই আমরা স্বাভাবিকভাবে ধরে নিয়েছি সে গাঁজাখুরি কোনও কাহিনি শোনাচ্ছে। তবে এ-কথা সত্যি যে, সে কাহিনির শুরু করেছিল অত্যন্ত সহজ সরল ভঙ্গিতে, যেন কোনও সত্যি ঘটনা শোনাচ্ছে। অথচ আমরা ভেবেছি, সেটা মানুষটার গল্প বলার দুরারোগ্য কায়দা।

'জানো, কাল রাতে এখানে আমি একা ছিলাম?' স্যান্ডারসনের নেড়েচেড়ে দেওয়া একটা জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ি থেকে ঠিকরে ওঠা আগুনের ফুলকিবৃষ্টির দিকে অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন চোখে তাকিয়ে থেকে ক্লেটন মন্তব্য করল।

'শুধু ক্লাবের পোষা জন্তুজানোয়ারগুলো ছাড়া,' বলল উইশ।

'হ্যাঁ, তবে ওরা বাড়ির ওদিকটায় শোয়—' বলল ক্লেটন, 'যাই হোক, কাল রাতে—' সে হাতের চুরুটে কিছুক্ষণ একমনে টান দিল, যেন নিজের আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে ইতস্তত করছে। তারপর বেশ শান্তভাবেই বলল, 'আমি একটা ভূত ধরেছি।'

'ভূত ধরেছ, বলো কী!' স্যান্ডারসন বলল, 'কই দেখি?'

তখন, চার সপ্তাহ আমেরিকায় ঘুরে আসা, ক্লেটনের একান্ত অনুগত ভক্ত, ইভান্স চিৎকার করে উঠল, 'ভূত ধরেছ, তুমি? ওঃ দারুণ। শিগগির বলো, কী করে কী হল!'

ক্লেটন বলল যে, সে গল্পটা শোনাচ্ছে এবং ওকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে অনুরোধ করল।

তারপর ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল সে ঃ 'কেউ যে আড়ি পাতবে, তা নয়; তবে ভূত নিয়ে গুজব ছড়িয়ে ক্লাবের চমৎকার পরিচর্যা পরিবেশন পণ্ড হয়ে যাক, তা আমি চাই না। তা ছাড়া এটা ঠিক রোজকার পাতি ভূত নয়। মনে হয় না, এ-ভূত আর কখনও আসবে।'

'তার মানে ভূতটা তুমি ধরে রাখোনি।' স্যান্ডারসন বলল।

'ধরে রাখতে মন চাইল না,' বলল ক্লেটন।

স্যান্ডারসন ভীষণ অবাক হল।

আমরা জোর গলায় হেসে উঠতেই ক্লেটনকে একটু বিমর্ষ মনে হল। ছোট্ট করে হেসে সে বলল, 'বুঝতে পারছি, তবে ঘটনা হল ওটা সত্যিকারের একটা ভূতই ছিল। ঠাট্টা করছি না। বিশ্বাস করো।'

স্যান্ডারসন তার লালচে চোখ ক্লেটনের ওপর রেখে পাইপে গভীর টান দিল। তারপর অনেক কথার চেয়ে বেশি অর্থবহ এক সরু ধোঁয়ার ফোয়ারা ছুড়ে দিল।

ক্লেটন ব্যাপারটা গায়ে মাখল না ঃ 'এ আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। তোমরা তো জানো, আমি ভূত-টুত একেবারে বিশ্বাস করি না; আর আমিই কিনা শেষে একটা ভূত ধরে বসলাম। তারপর গোটা ব্যাপারটাই চলে এল আমার হাতে।'

আরও কিছুক্ষণ গভীর ধ্যানে ডুবে রইল সে; তারপর দ্বিতীয় একটা চুরুট বের করে একটা অদ্ভুত-দর্শন ছুরি দিয়ে সেটা ফুটো করতে লাগল।

'তুমি ওটার সঙ্গে কথা বলেছ?' উইশ জিগ্যেস করল।

'তা ধরো প্রায় ঘণ্টাখানেক বলেছি।'

'মিশুকে, আড্ডাবাজ?' সন্দেহবাতিকদের দলে নাম লিখিয়ে আমিও শ্লেষের খোঁচাটা দিয়েছি ক্লেটনকে।

'বেচারা খুব বিপদে পড়েছিল,' চুরুটের ডগার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল সে। মুখে তার প্রতিবাদ বা বিরক্তির লেশমাত্র নেই।

'কাঁদছিল?' কে যেন জানতে চাইল।

স্মৃতি রোমন্থন করে বাস্তবিকই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লেটন। বলল, 'হা ভগবান!

pathagar.net

সত্যিই কাঁদছিল। বেচারা!'

'তুমি কোথায় মেরেছিলে ওকে?' যথাসম্ভব আমেরিকান কায়দার সুরে প্রশ্ন করল ইভান্স।

তাকে উপেক্ষা করে ক্লেটন বলল, 'কখনও বুঝিনি, ভূতদের এরকম করুণ অবস্থা হতে পারে,' সে আবার আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রাখল, পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজে বের করে চুরুটে আগুন ধরাল।

'আমি অবশ্য একটা সুযোগ নিয়েছি,' অবশেষে সে মন্তব্য করল।

আমরা এতটুকু ব্যস্ততা না দেখিয়ে প্রতীক্ষায় রইলাম।

'যেসব ভূতেরা সাধারণত ভয় দেখিয়ে বেড়ায়, তারা বুনো ঘোড়ার মতো গোঁয়ারতুমি করে একই জায়গায় বারবার ফিরে আসে। কিন্তু এ-বেচারা সেরকম নয়।' হঠাৎ সে একটু অদ্ভুতভাবে চোখ তুলে তাকাল, ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল, বলল, 'প্রথম দেখাতেই ওকে আমার দুর্বল বলে মনে হয়েছে।'

চুরুটের টানে নিজের বক্তব্যকে যতিচিহ্নিত করে ক্লেটন বলল, 'ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল লম্বা অলিন্দে। প্রথমে আমিই ওকে দেখতে পাই—আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে ওকে ভূত বলে চিনতে পেরেছি। ওর চেহারা কেমন স্বচ্ছ আর সাদাটে; সোজা ওর বুক ভেদ করে অলিন্দের শেষ মাথার ছোট্ট জানলার আলোর রেশটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম। শুধু চেহারা নয়, ওর হাবভাব পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল ঠেকছিল। যেন কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। এক হাতে কাঠের দেওয়ালে ভর রেখে অন্য হাতটা মুখের কাছে নাড়ছে। ঠিক—এইরকম।'

'চেহারা কীরকম ছিল?' স্যান্ডারসন বলল।

'রোগা। ছোট-খাটো। মাথায় খোঁচা-খোঁচা কদমছাঁট চুল। কান দুটো বিচ্ছিরি। কাঁধ ভীষণ সরু। গায়ে ভাঁজ করা কলার দেওয়া খাটো কেনা জ্যাকেট, ঢোলা প্যান্টুল পায়ের কাছটায় ছিঁড়ে গেছে। চুপিসাড়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছি। সঙ্গে আমার কোনও আলো ছিল না—পায়ে ছিল হালকা চটি। সিঁড়িতে উঠেই ওকে আমার নজরে পড়েছে। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি—ভালো করে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। ভয় কিন্তু একটুও পাইনি। বরং অবাক হয়েছি আর কৌতূহলও গেছে বেড়ে। ভাবলাম, ওঃ ভগবান, অ্যাদ্দিনে তা হলে একটা ভূতের দেখা পেলাম! আর গত পঁচিশটা বছর কিনা এক মুহূর্তের জন্যেও ভূতে বিশ্বাস করিনি!'

'হুম,' বলল উইশ।

'আমি সিঁড়ি বেয়ে ওঠামাত্রই ভূতটা আমাকে দেখতে পেল। চকিতে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। সব মিলিয়ে কচি এক যুবকের মুখ। থুতনি আর নাকের গড়ন কেমন দুর্বল, ঠোঁটের ওপরে ছোট-ছোট গোঁফ। একমুহূর্ত আমরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—ও কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—আমরা জরিপ করতে লাগলাম পরস্পরকে। তারপরেই মনে হয় নিজের উঁচুদরের পেশার কথা ওর মনে পড়ল।

ও ঘুরে দাঁড়িয়ে টানটান হয়ে খাড়া হল, মুখটা সামনে বাড়িয়ে হাত দুটো ভুতুড়ে নিয়মমাফিক দুপাশে ছড়িয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। আর আসার সময় মুখটা হাঁ করে এক হালকা টানা চিৎকার করে আমাকে ভয় দেখাতে চাইল। কিন্তু না—ওটা শুনে এক ফোঁটাও ভয় পাওয়ার প্রশ্ন নেই। খাওয়াদাওয়া করে আমি তখন এক বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছি, আর একা-একা থাকার ফলে হয়তো দু-তিন পেগ—না, হয়তো চার-পাঁচ পেগ—হুইস্কিও টেনে ফেলেছি; সুতরাং আমার শরীর তখন নিরেট শক্ত পাথরের মতো, ফলে ভয় পাওয়া তো দূরস্থান! ভূতটাকে বললাম, "বোকার মতো চেঁচিয়ো না! এটা তো তোমার আস্তানা নয়! তা হলে কী করছ এখানে?"

'স্পষ্ট দেখলাম, ও কুঁকড়ে গেল। তারপর আবার চিৎকার করল, "ওঁ-ওঁ-ওঁ—।"

' "রাখো তোমার ভুতুড়ে চিৎকার। তুমি কি এ-ক্লাবের মেম্বার?" আমি বললাম। ওকে যে পাত্তাই দিচ্ছি না সেটা দেখানোর জন্যে ওর শরীরের একটা কোণা ভেদ করে বেরিয়ে গেলাম, তারপর মনোযোগ দিলাম মোমবাতি জ্বালাতে। ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে আবার জিগ্যেস করলাম, "তুমি কি মেম্বার?"

'আমাকে জায়গা দিতে ও একটু সরে গেল, মুখের ভাব কীরকম যেন মনমরা। তারপর আমার চোখের নাছোড়বান্দা নীরব প্রশ্নের উত্তরে বলল, "না, মেম্বার নই—আমি একটা ভূত।"

' "সে যাই হও, তাতে তো আর মারমেইড ক্লাবের ভেতরে যথেচ্ছ ঘোরাঘুরি করা যায় না। তুমি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাও, না কী?" খুব সাবধানে আমাকে কথাবার্তা বলতে হচ্ছিল। কারণ, নইলে আমার হুইস্কি খাওয়ার এলোমেলো ব্যবহারকে ও ভেবে বসবে আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। জ্বলন্ত মোমবাতিটা হাতে নিয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম, "তা তুমি এখানে করছটা কী?"

'ও ততক্ষণে হাত নামিয়ে চিৎকার বন্ধ করে ফেলেছে। লজ্জা পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে ও বলল, "আমি এখানে ভয় দেখাতে এসেছি।"

' "কে বলেছে তোমাকে ভয় দেখাতে?" শান্ত গলায় বললাম।

' "বললাম তো, আমি ভূত," যেন নিজের পক্ষ সমর্থনে ও বলল।

' "সে হও গিয়ে, কিন্তু ভদ্রলোকদের প্রাইভেট ক্লাবে এসে এভাবে ভয় দেখানোর কোনও অধিকার তোমার নেই; এখানে মেয়েরা, বাচ্চারা প্রায়ই আসে। তাদের কেউ যদি হঠাৎ তোমার মুখোমুখি পড়ে যায়, তা হলে তো সত্যি-সত্যিই ভয় পেয়ে যাবে। একবারও ভেবেছ সে-কথা?"

' "না তো, স্যার—ভাবিনি।"

' "ভাবা উচিত ছিল। তা ছাড়া এ-জায়গাটার ওপর তোমার কি কোনও দাবি আছে? মানে, এখানে তুমি খুন-টুন জাতীয় কিছু হয়েছিলে?"

pathagar.net

‘ “না স্যার, সেরকম কিছু নয়; তবে আমি ভেবেছিলাম, জায়গাটা বেশ সেকেলে গোছের, ওক কাঠের দেওয়াল চারিদিকে, তাই...।”

‘ “এটা একটা অজুহাত হল?” আমি শক্ত গলায় বললাম, “এখানে আসাটা তোমার খুব ভুল হয়েছে,” বন্ধুত্বে ভরা আদেশের সুরে আরও বললাম, “আমি হলে তো মোরগের ডাক শোনার অপেক্ষাও করতাম না—এক্ষুনি উধাও হয়ে যেতাম।”

‘ও ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল। “আসলে কী জানেন, স্যার,” ও বলতে শুরু করল।

‘ “আমি হলে কিন্তু এই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেতাম,” বেশ জোর দিয়ে আমি বললাম।

‘ “আসলে, স্যার, মানে আমি—আমি অদৃশ্য হতে পারছি না।”

‘ “পারছ না?”

‘ “না, স্যার। মানে, আমি অদৃশ্য হওয়ার কায়দাটার একটা ধাপ ভুলে গেছি। কাল মাঝরাত থেকে আমি শুধু এখানে ঘোরাফেরা করছি। আলমারিতে, দেরাজে, শোওয়ার ঘরে লুকিয়ে থেকেছি। মনটা কেবলই ছটফট করছে। আগে কখনও আমি ভয় দেখাতে আসিনি—মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হত।”

‘ “না এলেই ভালো হত?”

‘ “হ্যাঁ, স্যার। আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঠিকভাবে পেরে উঠছি না। কী একটা ছোট্ট কায়দা যেন ভুলে গেছি—কিছুতেই মনে করতে পারছি না।”

‘এ-কথা শুনে, বুঝলে, আমি যেন একেবারে বোল্ড আউট হয়ে গেলাম। ও আমার দিকে এমন মনমরা চোখে তাকাল যে, আমি আর তর্জন-গর্জনের সুর বজায় রাখতে পারলাম না। “ভারী অদ্ভুত তো,” বললাম আমি। কথা বলার সময় মনে হল নীচের তলায় কারও চলাফেরার শব্দ পেলাম। “চলো, আমার ঘরে চলো। সেখানে গিয়ে তোমার সবকথা শুনব। আমি ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না।” ওকে হাত ধরে আমার সঙ্গে নিতে চাইলাম। কিন্তু, বুঝতেই পারছ, সে-চেষ্টা একরাশ ধোঁয়াকে মুঠো করে ধরার চেষ্টারই মতো। আমার ঘরের নম্বরটা কিছুতেই আমার মনে পড়ছিল না। বেশ কয়েকটা শোওয়ার ঘর খোঁজাখুঁজির পর আমার ঘরের দরজা নজরে পড়ল। একটা আরামকেদারায় গা এলিয়ে ওকে বললাম, “যাক, এইবার ধীরেসুস্থে তোমার গল্পোটা বলো দেখি। মনে হচ্ছে তুমি বেশ ভালো ঝামেলাতেই পড়েছ।”

‘যাই হোক, ও বসতে রাজি হল না; বলল, আমার আপত্তি না থাকলে ও বরং ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতে চায়। তাই হল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এক দীর্ঘ গভীর আলোচনায় ডুবে গেলাম। একটু পরে হুইস্কি ও সোডার আমেজ কিছুটা কমে এলে ক্রমে-ক্রমে বুঝতে পারলাম, কী ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ভুতুড়ে ব্যাপারেই না আমি আগাপাশতলা জড়িয়ে পড়েছি। অর্ধ-স্বচ্ছ শরীর নিয়ে পরদাঘেরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন সেকেলে শোওয়ার ঘরে ও দিব্যি এপাশ-ওপাশ নিঃশব্দে পায়চারি করছে।

pathagar.net

নিয়মমাফিক ভূতের মতোই ওর চেহারা ও চালচলন—তফাত শুধু হালকা গলার স্বরটুকুতে। তামার মোমবাতিদানের ম্লান আলো ওর শরীর ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চোখে পড়ছে দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে বাঁধানো খোদাইয়ের কাজগুলো। ও আমাকে শুনিয়ে চলল ওর করুণ জীবনকাহিনি—যা সদ্য-সদ্য শেষ হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। ওর মুখের চেহারা খুব সাধু না হলেও বলতে পারি, স্বচ্ছ হওয়ার ফলে ওর পক্ষে সত্যি বলা ছাড়া পথ ছিল না।'

'তার মানে?' হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে উইশ বলল।

'কী মানে?' ক্লেটন জানতে চাইল।

'এই—স্বচ্ছ হওয়ার ফলে—সত্যি বলা ছাড়া পথ ছিল না—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমিও বুঝিনি,' অননুকরণীয় আশ্বাসের ভঙ্গিতে ক্লেটন বলল, 'তবে কথাটা যে সত্যি এটুকু বলতে পারি। ওর কাছে শুনলাম, কীভাবে ও মারা গেছে—লন্ডনের এক পাতালঘরে ও মোমবাতি হাতে নেমেছিল কোথায় গ্যাস লিক করেছে দেখতে—আর বেঁচে থাকতে ও লন্ডনেরই এক বেসরকারি স্কুলের ইংরেজির মাস্টার ছিল।'

'বেচারা।' আমি মন্তব্য করলাম।

'যা বলেছ। বেঁচে থাকতে ওর জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন, মরে গিয়েও তাই। ও ওর বাপ, মা, মাস্টারমশাই—অনেকের কথা বলল। কেউ ওকে বুঝত না, কোনও আমল দিত না। সত্যিকারের বন্ধু বলতে কেউ ছিল না ওর। সাফল্য ওর জীবনে কোনওদিন আসেনি, খেলাধুলো ও বরাবরই এড়িয়ে চলেছে, পরীক্ষায় ফেল করেছে বারবার। একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল, আর ঠিক সেই সময়েই ঘটল ওই গ্যাসের দুর্ঘটনা।' "এখন তা হলে কোথায় আছ?" আমি জানতে চাইলাম, "মানে—।"

'দেখলাম, ব্যাপারটা ওর কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। ওর কথায় যেটুকু আবছা বুঝলাম তাতে অস্তিত্বহীন মাঝামাঝি কোনও একটা স্তরে ও রয়েছে। ওর সঙ্গে রয়েছে একদল স্বজাতীয় ভূত। কোনও একটা বাড়িতে গিয়ে আস্তানা গাড়ার কথা ওরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা করে। হ্যাঁ, ওই বাড়িটাকে ভুতুড়ে বাড়ি বানানোর মতলব আর কী। ওদের কাছে এই ব্যাপারটা ভীষণ রোমাঞ্চকর, তবে ওদের বেশিরভাগই সবসময় ভয়ে পিছিয়ে আসতে চায়। সুতরাং অবশেষে ও আবির্ভূত হয়েছে।'

'আশ্চর্য বটে।' জ্বলন্ত আগুনের দিকে চোখ রেখে উইশ বলল।

'ওর কথাবার্তা শুনে আমার মোটামুটি এইরকমই মনে হয়েছে,' ক্লেটন বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'ও একমনে পায়চারি করতে-করতে মিহি সুরে বলে গেছে—শুধু কথা—নিজের করুণ অবস্থা সম্পর্কে। ভয় দেখাতে এসে এই বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলায় পড়ে ও ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছিল। সবাই ওকে বলেছিল এতে নাকি খুব "মজা" হবে।

pathagar.net

তাই সেই "মজা" পাওয়ার আশাতেই ও ক্লাবে এসে উদয় হয়েছিল, কিন্তু কোথায় কী। ওর সারাজীবনের ব্যর্থতার লিস্টে আরও একটা ঘটনা যোগ হল মাত্র। ও বলল, যখনই যা কিছু করতে গেছে, সেটাই নাকি কেমন তালগোল পাকিয়ে ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ওর কথা আমি একটুও অবিশ্বাস করিনি। যদি অন্তত কারও সহানুভূতিও ভূতটা পেত! এই পর্যন্ত বলে ও একটু থামল, নজর করে দেখল আমাকে, তারপর মন্তব্য করল যে, শুনে অবাক লাগলেও আমিই নাকি প্রথম ব্যক্তি যে ওর প্রতি সামান্য হলেও সহানুভূতি দেখিয়েছি—এতদিন একফোঁটা দয়াও কারও কাছ থেকে ভূতটা পায়নি।

'তক্ষুনি আমি বুঝতে পারলাম, ও আসলে কী চায়। আর ওকে সাহায্য করতে মনে-মনে রাজিও হলাম। আমি এমনিতে নিষ্ঠুর হতে পারি, কিন্তু একজন যখন আমাকে সত্যিকারের বন্ধু বলে সম্মান দিয়েছে তখন তাকে সাহায্য না করাটা আমার সহ্যের বাইরে—তা সে মানুষ হোক আর ভূতই হোক। সুতরাং চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "এসব নিয়ে বেশি মন খারাপ কোরো না। যে করে হোক তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে। নাও, এবার তৈরি হয়ে চেষ্টা করো দেখি।" আমার কথায় ও বলল "আমি পারছি না।" "পারতেই হবে।" আমি বললাম, ফলে ও সত্যিই চেষ্টা করতে লাগল।'

'চেষ্টা!' বলল স্যান্ডারসন, 'কেমন করে?'

'হাত নাড়াচড়া করে।' ক্লেটন বলল।

'হাত নাড়াচাড়া করে?'

'হ্যাঁ, বিভিন্ন জটিল ভঙ্গিতে হাত নাড়াচাড়া করে। ওইভাবেই ও এখানে এসে হাজির হয়েছিল, আর একইভাবে ওকে আবার অদৃশ্য হতে হবে। ওঃ ভগবান! কী কাজেই না ফেঁসেছি!'

'কিন্তু, শুধু হাত নেড়ে কেমন করে—' আমি বলতে শুরু করলাম।

'তুমি দেখছি সবকিছুরই জট খুলতে চাও,' আমার দিকে ফিরে বিশেষ কয়েকটা শব্দের ওপর জোর দিয়ে ক্লেটন বলল, 'হাত নেড়ে কেমন করে জানি না। শুধু জানি, ও অন্তত তাই করেছিল। বহু চেষ্টার পর, বুঝলে, একসময় ওর হাতের ভঙ্গিগুলো ঠিক-ঠিক হতেই ভূতটা অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'ভঙ্গিগুলো তুমি খেয়াল করেছিলে?' স্যান্ডারসন ধীরে-ধীরে বলল।

'হ্যাঁ,' বলল ক্লেটন, মনে হল ও কিছু একটা ভাবছে, 'ভঙ্গিগুলো ভারি অদ্ভুত। আমি আর সেই রোগা আবছা ভূতটা বসে আছি সেই নিস্তব্ধ জনশূন্য ক্লাবে; আমাদের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও শব্দ সেখানে ছিল না। শুধু ছিল ওর হাতের নাড়াচাড়ায় শূন্য তৈরি এক আবছা ছবি। একটা মোমবাতি শোওয়ার ঘরের অন্ধকার দূর করছে, আর দ্বিতীয় একটা জ্বলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলে। আলো বলতে সব মিলিয়ে ওইটুকুই—কখনও-সখনও মোমবাতির আলো ক্ষণিকের জন্যে দপ করে জ্বলে উঠছে

pathagar.net

দীর্ঘ তন্বী শিখায়। আর অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে লাগল। "আমি পারছি না,' ও বলল, "আমার দ্বারা সম্ভব নয়—।" তারপর হঠাৎ একটা চেয়ারে বসে ও ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভগবান! কী হয়রানি এবার বোঝো।

'কী হচ্ছে কী এসব থামো," এ-কথা বলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু...আমার হতচ্ছাড়া হাতটা ওর শরীর ভেদ করে চলে গেল। মনে আছে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে সরিয়ে নিয়েছি আমার হাত। সামান্য শিউরে সরে এসেছি ড্রেসিং টেবিলের কাছে। তারপর, ওকে মদত দিতে, আমিও চেষ্টা করতে শুরু করলাম।'

'কী চেষ্টা!' স্যান্ডারসন বলল, 'হাত নাড়াচাড়ার ভঙ্গি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু—' কী একটা ভেবে যেন আমি বলতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা খেয়াল করে উঠতে পারলাম না।

'আশ্চর্য ব্যাপার তো,' পাইপের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে স্যান্ডারসন বলল, 'তার মানে তোমার এই ভূতটা সমস্ত রহস্যই তোমার কাছে...।'

'ফাঁস করে দিয়েছে কিনা? হ্যাঁ, দিয়েছে।'

'হতে পারে না,' বলল উইশ, 'এ সম্ভব নয়। কারণ, তা হলে তুমিও ওর সঙ্গে-সঙ্গে উধাও হয়ে যেতে।'

'ঠিক বলেছ,' আমি আমার হারানো মনের কথা ফিরে পেয়ে সায় দিলাম।

তারপর কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চুপচাপ।

'শেষ পর্যন্ত পারল?' স্যান্ডারসন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, পারল, তবে অনেক চেষ্টার পর—বলতে পারো হঠাৎই হয়ে গেল। ও তো হতাশই হয়ে পড়েছিল। তখন আমাদের দুজনের মধ্যে একচোট হল। তারপর হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে পুরো ভঙ্গিটা ধীরে-ধীরে করে দেখাতে বলল, যাতে ও ভালো করে লক্ষ করতে পারে। "আপনারটা খুঁটিয়ে দেখলে আমি বুঝতে পারব আমার ভুলটা কোথায় হচ্ছে," বলল ভূতটা। এবং সত্যি পারল! কিন্তু হঠাৎই ও একটু রুক্ষ গলায় বলল, "আপনি তাকিয়ে থাকলে আমি পারব না—এইজন্যেই তখন থেকে খালি গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনাকে দেখে আমি আরও নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি!" যাই হোক, কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে একটু কথাকাটাকাটি হল। বুঝতেই পারছ, আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ভূতটা একেবারে বুনো ঘোড়ার মতো বেঁকে বসল। সুতরাং, অগত্যা আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, তাকিয়ে রইলাম বিছানার পাশে রাখা পোশাক-আলমারির আয়নায়।

'ব্যস, ও একেবারে ঝটপট শুরু করে দিল। আয়না দিয়ে আমি ওর সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। হাত দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এইভাবে, এইরকম করে, বিচিত্র সব ভঙ্গি করতে শুরু করল ভূতটা, তারপর হঠাৎ ঝুপ করে এসে পড়ল শেষ ভঙ্গিটা—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাত টান-টান করে দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে—

এইরকম, ঠিক এইভাবে ও দাঁড়াল। তারপরই উধাও! হাপিস! হাওয়া! আয়না ছেড়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম ওর দিকে। কিন্তু কোথায় কে! জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা আর হোঁচট খাওয়া মন নিয়ে ঘরে আমি সম্পূর্ণ একা। ব্যাপারটা কী হল? সত্যিই কি কিছু ঘটেছে? না এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখেছি? আর ঠিক তখনই, সিঁড়ির দেওয়াল-ঘড়িটা যবনিকাপাতের বিচিত্র সুরে আবিষ্কার করল, রাত একটার ঘণ্টা বাজানোর পক্ষে সময়টা বেশ জমে উঠেছে। সুতরাং!—ঢং! ব্যস, আমার শ্যাম্পেন ও হুইস্কির তাবৎ নেশা তখন কেটে গেছে। আর কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে—ভীষণ অদ্ভুত! ওঃ ভগবান!'

চুরুটের ছাইটাকে একমুহূর্ত সে জরিপ করল, তারপর বলল, 'এই-ই পুরো গল্প।'

'তারপর তুমি ঘুমোতে চলে গেলে?' ইভান্স প্রশ্ন করল।

'তা ছাড়া আর কী করব?'

আমি উইশের চোখে তাকালাম। আমরা সবাই মিলে ক্লেটনকে ব্যঙ্গ করতে চাইলাম, কিন্তু ওর কথায় ও ব্যবহারে এমন কিছু একটা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত আমরা সেটা আর পেরে উঠলাম না।

'আর সেই হাত নাড়ার কায়দাগুলো?' বলল স্যান্ডারসন।

'ওগুলো আমি এখনই করে দেখাতে পারি!'

'তাই নাকি।' একটা পেনসিল-কাটা ছুরি বের করে পাইপের গর্তের ভেতরটা চাঁছতে লাগল স্যান্ডারসন ঃ 'তা হলে করে দেখাও!' ক্লিক শব্দে ছুরিটাকে বন্ধ করে সে বলল।

'দেখাচ্ছি।' বলল ক্লেটন।

'দেখো, ওতে কোনও কাজ হবে না,' ইভান্স বলল।

'কিন্তু যদি হয় তা হলে—' আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

'জানো, আমার মনে হচ্ছে এসব নিয়ে ছেলেমানুষি না করাই ভালো,' বলল উইশ, তারপর পা ছড়িয়ে আয়েস করে বসল।

উইশের সঙ্গে আমাদের বিতর্ক শুরু হল। তার মতে ওইসব ভঙ্গি যদি ক্লেটন নকল করতে যায় তা হলে সেটা একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ভীষণ ইয়ারকি করা হবে।

'কিন্তু গল্পটার এক বর্ণও কি তোমার বিশ্বাস হয়?' আমি জানতে চাইলাম।

উইশ চকিত চোখ ফেরাল ক্লেটনের দিকে। সে তখন অগ্নি-আধারের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে কী যেন ওজন করে দেখছে।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস হয়—অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বাস হয়,' উইশ বলল।

'ক্লেটন,' আমি বললাম, 'তোমার গল্পের গাঁজাখুরি ধরে ফেলা আমাদের কম্মো নয়। গল্পটা এমনি ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু ওই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা...তুমি

pathagar.net

আমাদের মনে একেবারে সত্যি ঘটনার মতো গেঁথে দিয়েছ। নাও বাবা, এবারে স্বীকার করে ফ্যালো যে, পুরোটাই গুলতাপ্পি ছাড়া আর কিছু নয়।'

আমাদের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করেই সে উঠে দাঁড়াল, অগ্নি-আধারের সামনে বিছানো কার্পেটের ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে থামল, এবং আমার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল। একমুহূর্ত সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল, তারপর সারাক্ষণ তার চোখ গভীর মনোযোগে স্থির হয়ে রইল সামনের দেওয়ালের ওপরে। ধীরে-ধীরে সে দু-হাত তুলে ধরল চোখের সমান্তরাল করে, তারপর শুরু করল ...।

এখানে বলে রাখা ভালো, প্রাচীন ও বর্তমান স্থাপত্যকর্মের নানান রহস্য নিয়ে স্যান্ডারসন অনেক গবেষণা করেছে। ফলে ক্লেটনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি সে রক্তাভ চোখে গভীর আগ্রহে লক্ষ করতে লাগল। ক্লেটনের শেষ হলে সে বলল, 'মন্দ নয়। তুমি জোড়াতালি দিয়ে মোটামুটি ভালোই দেখিয়েছ, তবে একটা জায়গা বাদ পড়ে গেছে।'

'জানি,' ক্লেটন বলল, তারপর হাত ছুড়ে, দুলিয়ে, ছোট্ট এক অদ্ভুত মোচড় দিয়ে থামল ঃ 'এইটা তো? ভূতটা তো এই জায়গাটাই বারবার ভুলে যাচ্ছিল। দাঁড়াও, এবার পুরোটা তোমাদের প্রথম থেকে করে দেখাই।' অস্তমিত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল ক্লেটন। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, সেই হাসিতে সামান্য ইতস্তত ভাব ছিল। সে বলল, 'তা হলে শুরু করছি...।'

'আমি হলে কিন্তু করতাম না,' বলল উইশ।

'না, না, ঠিক আছে।' ইভান্স বলল, 'পদার্থ অবিনশ্বর। তোমার কি ধারণা এ-সব ভোজবাজি ক্লেটনকে অশরীরী জগতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? মোটেই না। আমি তা বলব না, ক্লেটনভায়া, যতক্ষণ না তোমার হাতজোড়া কাঁধ থেকে খুলে পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তুমি আরামসে চেষ্টা করে যাও।'

'আমার মত তা নয়,' উঠে দাঁড়াল উইশ, এগিয়ে এসে ক্লেটনের কাঁধে হাত রাখল সে ঃ 'যে-করে হোক তোমার গল্পটা আমাকে তুমি অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছ। ফলে আমি চাই না, তুমি এসব নিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকি করো।'

'হায় কপাল! উইশ দেখছি ভয় পেয়ে গেছে।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, ভয় পেয়েছি।' আমার দিকে ফিরে তীব্র গলায় বলল উইশ, 'আমার ধারণা ওইসব হাতের ভঙ্গি ঠিক-ঠিক নকল করলে ক্লেটনও উধাও হয়ে যাবে।' উইশের মনোভাব হয় সত্যি, নয়তো বলতে হয় ওর অভিনয় প্রশংসা করার মতো।

'ওসব কিচ্ছু হবে না।' আমি চিৎকার করে বললাম, 'এ-পৃথিবীকে ফাঁকি দেওয়ার একটাই মাত্র উপায় মানুষের হাতে আছে, আর সে হতে ক্লেটনের এখনও তিরিশ বছর দেরি। তা ছাড়া...ওইরকম একটা ভূত! তোমার কি মনে হয়...?'

গতিশীল হয়ে আমাকে বাধা দিল উইশ। ছড়িয়ে থাকা চেয়ারের বৃত্ত ছেড়ে সে এগিয়ে এল, টেবিলের পাশে এসে থমকে দাঁড়াল।

'ক্লেটন, তুমি একটা বোকা।' সে বলল।

রসিকতার আলো দু-চোখে ঝিকিয়ে হাসি ফিরিয়ে দিল ক্লেটন।

'উইশ ঠিকই বলেছে। তোমাদের ধারণা ভুল,' ক্লেটন বলতে শুরু করল ঃ 'আমি উধাও হয়ে যাব। এইসব হাত নাড়াচাড়ার বিচিত্র ভঙ্গি যেই শেষ হবে, বাতাস কাটার শব্দের রেশ যখন শিস দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, অমনি—হুস। এই কার্পেট পড়ে থাকবে সম্পূর্ণ খালি, অবাক বিস্ময়ে সারাটা ঘর হয়ে যাবে স্তম্ভিত এবং পনেরো স্টোন ওজনের সুবেশ এক ভদ্রলোক টুপ করে গিয়ে পড়বে অশরীরী জগতে। এতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই, তোমাদেরও থাকবে না। ফালতু তর্কের মধ্যে আমি আর যেতে চাই না। সোজাসুজি চেষ্টা করেই দেখা যাক।'

'না।' চিৎকার করে সামনে এক-পা এগিয়ে এল উইশ এবং পরক্ষণেই থমকে দাঁড়াল। কারণ ক্লেটন তখন হাত তুলে সেই প্রেতাত্মার হাত নাড়ার ভঙ্গিগুলো নকল করতে শুরু করেছে।

ততক্ষণে আমরা এক অদ্ভুত উত্তেজনার চরমে পৌঁছে গেছি—তার মধ্যে আমার তখন এক বিচিত্র কঠিন নিঃসাড় অবস্থা, যেন মাথার পেছন থেকে উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত গোটা শরীর ইস্পাত হয়ে গেছে। আর ক্লেটন এক অদ্ভুত শান্ত মুখভাব নিয়ে নিজের শরীরটা ঝুঁকিয়ে হাত নাড়াচাড়ার ভঙ্গি করে চলল। যতই সে শেষের দিকে এগোতে লাগল ততই আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল। একটা হিমেল হাওয়া যেন আমাদের চোখমুখ ছুঁয়ে গেল। ওর শেষ ভঙ্গিটুকু ছিল হাত দুটোকে টান-টান করে দুপাশে ছড়িয়ে দেওয়া, আর তার সঙ্গে মুখ তুলে ধরা। সুতরাং ক্লেটন যবনিকা পতনের কায়দায় হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিল। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। যদিও মানছি এর কোনও মানে হয় না। তবে ব্যাপারটা অনেকটা যেন ছমছমে ভুতুড়ে গল্পের মতো—রাতের খাওয়াদাওয়ার পর এক অদ্ভুত ছায়াময় এক বাড়ির ভেতরে বসে এই ঘটনার সাক্ষী থাকা...। মনে-মনে ভাবতে থাকলাম, সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত ও...?

মুখ ওপরে তুলে, দু-হাত দুপাশে ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত উজ্জ্বল অভিব্যক্তি নিয়ে ঝুলন্ত আলোর আভায় এক বিস্ময়কর মুহূর্ত ধরে দাঁড়িয়ে রইল ক্লেটন। সেই একটা মুহূর্ত আমাদের কাছে যেন একটা যুগ। আর তার পরেই আমাদের বুক ভেদ করে বেরিয়ে এল স্বস্তির এক অনন্ত দীর্ঘশ্বাস এবং আশ্বস্ত হওয়ার একগুচ্ছ অস্ফুট শব্দ, 'না। কিছুই হয়নি।' কারণ চোখের সামনেই দেখছি ক্লেটন অদৃশ্য হয়নি। ব্যাপারটা পুরোটাই বোগাস। আসলে সে একটা গাঁজাখুরি গপ্পো ফেঁদে সেটা আমাদের প্রায় বিশ্বাস করানোর জন্যে এত কাণ্ড করে চলেছে।...কিন্তু ঠিক তখনই ক্লেটনের মুখটা পালটে যেতে লাগল।

এই পালটে যাওয়াটা যেন কোনও আলো ঝলমলে বাড়ির সমস্ত আলো পলকে নিভিয়ে দেওয়ার মতো। ওর চোখ হঠাৎ হয়ে উঠল স্থির, অচল, অনড়। ঠোঁটের হাসি গেঁথে গেল ঠোঁটের ওপরেই। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

ক্লেটন। শুধু ওর শরীরটা অল্প-অল্প দুলতে লাগল।

সেই মুহূর্তটাও যেন একটা যুগ। তারপরেই শোনা গেল চেয়ার নাড়াচাড়ার শব্দ, জিনিসপত্র পড়ে যাওয়ার শব্দ, এবং আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ক্লেটনের হাঁটুজোড়া যেন রণে ভঙ্গ দিল; ও হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। পলকে উঠে দাঁড়িয়ে ইভান্স ওকে ধরে ফেলল দু-হাতে...।

আমরা সকলে স্তম্ভিত। অন্তত একমিনিট কেউ গুছিয়ে কোনও কথা বলতে পারল না। আমরা বিশ্বাস করছি, আবার করতে পারছি না...জটিল হতবুদ্ধি ভাব কাটিয়ে যখন সংবিত ফিরে পেলাম, তখন দেখি, আমি ক্লেটনের পাশে হাঁটুগেড়ে বসে আছি, ওর খাটো কোট আর জামা ছিঁড়ে ফেলে স্যান্ডারসন ওর বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখছে...।

এ-রহস্যের প্রকৃত সমাধান করা আমার জ্ঞান বুদ্ধির বাইরে। ভৌতিক জাদুমন্ত্রের কোনও হাত এতে আছে কিনা আমি জানি না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, হাত নাড়াচাড়ার অদ্ভুত প্রক্রিয়া যে-মুহূর্তে ওর শেষ হল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর চেহারা পুরোপুরি পালটে গেছে, ও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের চোখের সামনে—তারপর মারা গেছে।

➤ *দ্য ইনএক্সপিরিয়েন্সড গোস্ট*

pathagar.net

জীবিত ও মৃত

ভিনসেন্ট ও'সালিভ্যান

pathagar.net

র‍্যাভেনেল হলের এটাই সবচেয়ে খারাপ। বারান্দাগুলো ছায়াময় লম্বা, ঘরগুলো অন্ধকার ছাতা ধরা। ছবিগুলো পর্যন্ত মলিন, আর তাদের বিষয়বস্তু আরও শোচনীয়। হেমন্তের কোনও সন্ধ্যায় যখন বাগানের গাছগুলোয় বাতাস কেঁদে-কেঁদে ফেরে, শুকনো পাতা শিস দেয়—গুঞ্জন তোলে, আর বৃষ্টির ফোঁটা সরবে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানলায়, তখন যে অল্প-সাহসী মানুষেরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে সে আর আশ্চর্য কী! সুতরাং আমার পরিচিত লোকেরা যখন র‍্যাভেনেল-এ থাকতে ভয় পায় তখন আমি অবাক হই না। এমন কি উইলভার্ন পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল; অথচ সে সৈন্যদলে চাকরি করে, নিয়মিত পোলো খেলে—ওর অন্তত আরও সাহসী হওয়া উচিত ছিল। ও যেদিন বিদায় নেয় তার আগের দিন রাতে আমি ওকে আমার তত্ত্ব বোঝাচ্ছিলাম ঃ যদি কয়েক ফোঁটা মানুষের রক্ত সামনে ফেলে খুব গভীর মনোনিবেশ করা যায় তা হলে কিছুক্ষণ পরে কোনও পুরুষ বা নারীকে দেখতে পাওয়া যাবে এবং সারারাত সে আমাকে সঙ্গ দেবে; এমন কি দিনের বেলায় অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় সে তোমার সঙ্গে দেখাও করতে পারে। যখন এইসব তত্ত্ব ওকে বুঝিয়ে বলছি ও আমাকে বাধা দিল।

'ভাই অ্যালিস্টেয়ার!' ও বলতে শুরু করল, 'যে-করে-হোক এ-জায়গাটা তুমি ছাড়ো, শহরে যাও, একটু ঘুরে-ফিরে—সত্যি, এ-বাড়িটা তোমার ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, যাই আর হোটেলের বাজে খাবার আর ক্লাবের বাজে

আলোচনার বিষে মরি। না ভাই, ধন্যবাদ। আমার স্বাস্থ্যের জন্যে তুমি যেরকম চিন্তিত হয়ে পড়েছ তাতে আমি মনে-মনে দুর্বল হয়ে পড়ছি।'

'ঠিক আছে, তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো,' মেঝেতে পা ঠুকে ও বলল, 'কালকের পর আমি যদি আর একটা দিনও এ-বাড়িতে থাকি তো কী বললাম—এখানে একমাত্র পাগল থাকতে পারে!'

ও-ই ছিল আমার শেষ অতিথি। ও চলে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে সামনে কয়েক ফোঁটা রক্ত ফেলে আমি লাইব্রেরি-ঘরে বসে ছিলাম। এ-ক'দিনে আমার তত্ত্ব প্রায় নির্ভুল হয়ে উঠেছে; কিন্তু তাতে একটা গোলমাল ছিল।

যাকে আমি সবসময় সামনে দেখতাম সে ছিল এক বৃদ্ধা; মাথার চুল সিঁথি কেটে সামনে দু-ভাগে ভাগ করা; সেই চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত; চুলের একপাশ সাদা আর অন্য পাশ কালো। তার বয়েসে নুয়ে পড়া চেহারাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পেতাম; কিন্তু তাতে একটা খুঁত ছিল। তার কোনও চোখ ছিল না। আমি চোখ দুটোকে কল্পনায় আপ্রাণ দেখতে চেষ্টা করতাম। আর তখনই তার শরীরটা কুঁচকে গিয়ে পচে যেত আমার চোখের সামনে। কিন্তু আজ রাতে আমি একমনে ভাবছি, শুধু ভাবছি। এত মনোযোগ দিয়ে আগে কখনও ভাবিনি। একসময় দেখতে পেলাম, চোখ দুটো ধীরে-ধীরে এসে যেন হামাগুড়ি দিয়ে মাথায় জায়গামতো বসে যাচ্ছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে ভারি কিছু একটা পড়ে যাওয়ার ভয়ঙ্কর শব্দ বাইরে থেকে ছিটকে এল আমার কানে। এক ঝটকায় দরজা খুলে গেল, দুজন ঝি ঢুকল ঘরে। ওরা আমার চেয়ারের নীচে পাতা কার্পেটটা দেখল আর সঙ্গে-সঙ্গেই ভয়ে সাদা হয়ে গিয়ে 'ওঃ ভগবান! ওঃ ভগবান!' বলে চিৎকার করে জড়োসড়ো হয়ে বেরিয়ে গেল।

'লাইব্রেরিতে এভাবে ঢুকবার সাহস তোমাদের হল কোত্থেকে?' আমি কঠোর স্বরে জানতে চাইলাম, কিন্তু কোনও উত্তর পেলাম না। সুতরাং ওদের পিছু নিলাম। দেখলাম, বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে বাড়ির সব ঝি-চাকরেরা এক জায়গায় জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'মিসেস পেব্‌ল,' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রধান পরিচারিকাকে লক্ষ করে আমি বললাম, 'কালকেই যেন ওই মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এত বড় আস্পর্ধা! আপনার আরও সাবধান হওয়া উচিত।'

কিন্তু সে আমার কথা কানেই তুলল না। তার মুখ তখন আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

'ওঃ ভগবান! সর্বনাশ!' মিসেস পেব্‌ল বলল, 'চলো, আমরা সবাই মিলে লাইব্রেরিতে যাই।' সবাইকে লক্ষ করে শেষ কথাগুলো বলল সে।

'এ-বাড়ির মালিক এখনও আমি, না আর কেউ, মিসেস পেব্‌ল?' একটা টেবিলে সজোরে ঘুষি মেরে জানতে চাইলাম।

ওদের কেউ যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, বা আমার কথা শুনেও শুনছে

না; বলতে গেলে আমি যেন এক মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছি। ওদের অনুসরণ করে আমিও বারান্দা ধরে রওনা হলাম, এবং নানারকম আদেশের সুরে বারবার করে বারণ করলাম লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকতে। কিন্তু ওরা আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল, অগ্নি-আধারের সামনে পাতা কার্পেট ঘিরে জটলা করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ওদের তিন-চার জন কীসব টানাটানি করতে লাগল, ধরে তুলতে লাগল—যেন কোনও নিস্তেজ দেহ টেনে তুলে নিয়ে আসছে। তারপর সেই অদৃশ্য বোঝা নিয়ে হোঁচট খেতে-খেতে একটা সোফায় নিয়ে গিয়ে রাখল। আমার পুরোনো পরিচারক সোম্‌স কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

'বেচারা, দাদাবাবু!' চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে সে বলল, 'আমি তাঁকে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি! আর উনি কিনা এভাবে মারা গেলেন—এই কচি বয়েসে!'

'এসব কী ব্যাপার, সোম্‌স?' আমি ওর কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলাম। চিৎকার করে বললাম, 'আমি মরিনি, এই তো আমি—এই তো, তোমার সামনে।' সে কিন্তু এতটুকু নড়ল না। তখন আমি একটু ভয় পেলাম।

'সোম্‌স—' ওকে ডাকলাম, 'তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? ছোটবেলায় আমার সঙ্গে কত খেলা করেছ, মনে নেই? ওদের বলো যে আমি মরিনি, প্লিজ, সোম্‌স, সোম্‌স!'

সে ঝুঁকে পড়ে সোফায় চুমু খেল।

'আমার মনে হয় কোনও গ্রামে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনা উচিত,' মিস্টার সোম্‌স,' মিসেস পেবল বলল। সঙ্গে-সঙ্গে সোম্‌স কাউকে পাঠানোর জন্যে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

এই ডাক্তার লোকটা একটা অপদার্থ গর্দভ। তাকে আমি বাড়ি থেকে একবার বের করে দিয়েছিলাম, কারণ ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে সে বিশ্বাসী ছিল, আবার একইসঙ্গে নিজেকে একজন বিজ্ঞানের লোক বলে দাবি করত। সে আমার বাড়ির চৌকাঠ যেন না মাড়ায়—এই ছিল আমার ইচ্ছে। সুতরাং আমি মিসেস পেব্‌লকে সারা বাড়িময় অনুসরণ করে বেড়াতে লাগলাম আর চিৎকার করে বারণ করতে থাকলাম, ডাক্তারবাবুকে যেন না ডাকা হয়। কিন্তু তার তরফ থেকে না পেলাম কোনও উত্তর, না পেলাম কোনও ইশারা, যাতে বোঝা যায় সে আমার কথা শুনতে পেয়েছে।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হল লাইব্রেরি-ঘরের দরজায়।

'এই যে!' তার মুখে এক ধাক্কা মেরে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বললাম, 'আবার কোনও নতুন প্রার্থনা শেখাতে এসেছেন বুঝি?'

সে এমনভাবে আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল যে আঘাতের লেশমাত্র টের পেয়েছে বলে মনে হল না। তারপর সে সোফার কাছে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল।

pathagar.net

'মাথার শিরা ছিঁড়ে গেছে মনে হয়,' সোম্‌স এবং মিসেস পেব্‌লকে লক্ষ করে একটু পরে সে বলল, 'মারা গেছেন ঘণ্টাখানেক হবে। বেচারা! তোমরা টেলিগ্রাম করে ওঁর বোনকে খবর দাও, আর আমিই কফিনওয়ালাকে খবর দিচ্ছি, সে এসে মৃতদেহ সাজানোর ব্যবস্থা করবে।'

'মিথ্যেবাদী কোথাকার!' আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'ছোটলোক পাজি মিথ্যেবাদী! কোন সাহসে আমার চাকরবাকরদের তুই বলছিস যে, আমি মরে গেছি! যেখানে আমি তোর চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি!'

সোম্‌স ও মিসেস পেব্‌ল-এর সঙ্গে ডাক্তার ততক্ষণে বারান্দা ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। আমার দিকে ওরা একবার ফিরেও তাকাল না।

সারাটা রাত আমি লাইব্রেরিতে বসে রইলাম। আশ্চর্যই বলতে হবে, আমার একটুও ঘুম এল না, আর খিদেও পেল না। সকাল হতেই সব লোকেরা এসে গেল, এবং আমার শত বারণ সত্ত্বেও ওরা অদৃশ্য কোনও জিনিসকে ঘিরে কীসব কাজ করতে লাগল। সুতরাং সারাটি দিন আমি লাইব্রেরিতে বসে রইলাম, নয় তো গোটা বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাতে লোকজন আবার ফিরে এল—এবার সঙ্গে একটা কফিন নিয়ে। তখন নিতান্তই রসিকতাবশে ভাবতে লাগলাম, এত সুন্দর একটা কফিন খালি পড়ে থাকবে, ফলে রাতটা আমি সেই কফিনে শুয়েই কাটিয়ে দিলাম। নিশ্চিন্ত আরামে স্বপ্নহীন ঘুম নেমে এল চোখে—এত আরামে আগে কোনওদিন ঘুমোইনি। পরদিন সবাই যখন এসে হাজির হল, তখন আমি বিশ্রামে মগ্ন। তারপর কফিনওয়ালা আমার দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিল। আশ্চর্য অনুগত লোক বটে!

সেই দিন সন্ধ্যায় নীচের তলায় আসতেই নজরে পড়ল হলঘরে কিছু মালপত্র রাখা আছে। জানতে পারলাম, আমার বোন এসে পৌঁছেছে। বিয়ের পর এতদিন ওকে দেখিনি। তা ছাড়া এই নোংরা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কাউকে যদি আমি ঘেন্না করে থাকি তো সে আমার ওই বোন। ওকে দেখতে খুব সুন্দর—লম্বা, তামাটে রং ও ঋজু শরীর। আর ওর সবচেয়ে প্রিয় দুটো জিনিস হল ঃ পরনিন্দা-পরচর্চা ও পোশাক-পরিচ্ছদ। হয়তো এইজন্যেই আমি ওকে অপছন্দ করি। সাড়ে ন'টা নাগাদ ভীষণ সুন্দর ঢিলে পোশাক গায়ে দিয়ে আমার বোন লাইব্রেরি-ঘরে এল। খুব শিগগিরই বুঝতে পারলাম, আর সকলের মতো ও আমার উপস্থিতি একটুও টের পাচ্ছে না। যখন দেখলাম ও কফিনের পাশে—আমার কফিনের পাশে—হাঁটুগেড়ে বসল, তখন আমি রাগে কাঁপতে লাগলাম; কিন্তু যখন ও কফিনের বালিশে ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল, আমি জ্ঞানগম্যি হারিয়ে বসলাম।

সুতো কাটার একটা ছুরি সামনের টেবিলের ওপরে পড়ে ছিল ঃ সেটা তুলে নিয়ে ওর ঘাড় লক্ষ করে সজোরে বসিয়ে দিলাম। আমার বোন চিৎকার করে ঘর ছেড়ে ছুটে পালাল।

'শিগগির এসো! শিগগির এসো!' ও চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগল—

ভয়ে রীতিমতো কাঁপছে ঃ মৃতদেহের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে!' তখন আমি মনে-মনে অভিসম্পাত দিলাম।

তৃতীয় দিন সকালে ভীষণ তুষারপাত হল। এগারোটা নাগাদ দেখলাম, কালো পোশাক পরে গ্রামের লোকেরা বাড়িতে এসে ভিড় করেছে—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্যে। আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শিগগিরই সব লোকজন সেখানে এসে হাজির হল। কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে কাঁধে তুলে নিল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর আমি বসেই রইলাম। বিষণ্ণ হয়ে ভাবলাম, আমার কাছ থেকে কোনও জিনিস যেন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ঃ কিন্তু সেটা যে কী, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রায় আধঘণ্টা চিন্তায় বিভোর রইলাম, স্বপ্ন দেখলাম। তারপর আমি এগিয়ে গেলাম নীচে হলঘরের দরজার দিকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোনও চিহ্নই আর চোখে পড়ছে না; কিন্তু একটু পরেই দূরে নজরে পড়ল, তুষারের সাদা পটভূমিতে একটা কালো সুতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে।

আমি মরিনি! যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। তাজা তুষারে মুখ ঘষলাম, তুষারের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম ঘাড়ে, মাথায় ঃ 'ওঃ ভগবান, আমি মরিনি! আমি বেঁচে আছি। বেঁচে আছি।'

➤ *হোয়েন আই ওয়াজ ডেড*

pathagar.net

প্রেতচক্র

আগাথা ক্রিস্টি

pathagar.net

আপনমনে গুনগুন করতে-করতে রাউল দব্রোয় সেন নদী পার হল। সে বছর বত্রিশের সুদর্শন ফরাসি যুবক, সজীব মুখে ছোট কালো গোঁফ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। কার্দোনে পৌঁছে রাউল ঢুকে পড়ল সতেরো নম্বর বাড়িতে। পরিচারিকা বিরক্তভাবে সুপ্রভাত জানালেও সে খুশিমুখে তার উত্তর দিল। তারপর চারতলার ফ্ল্যাটের উদ্দেশে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। দরজার ঘণ্টি বাজিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে সে আরও একবার গুনগুন করে উঠল একই সুরে। আজ সকালে রাউল দব্রোয়কে বেশ খুশি-খুশি লাগছে। জনৈক বয়স্কা ফরাসি মহিলা দরজা খুলে দিল। অতিথিকে দেখে তার ভাঁজপড়া মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'সুপ্রভাত, মঁসিয়ে।'

সদর দরজা বন্ধ করে এলিস ঘুরে দাঁড়াল রাউলের দিকে।

'মঁসিয়ে ছোট বৈঠকখানায় যদি একটু বসেন তা হলে মাদামের সঙ্গে মিনিটখানেকের মধ্যেই দেখা হবে। উনি এখন বিশ্রাম করছেন।'

রাউল চমকে চোখ তুলে তাকাল ঃ 'কেন, মাদামের শরীর কি ভালো নেই?'

'ভালো আর কোথায়।'

এলিস ফোঁস করে উঠল। রাউলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে বৈঠকখানার দরজা খুলে দিল। সে ভেতরে ঢুকতে এলিস তাকে অনুসরণ করল।

'বেচারা মাদাম কী করে ভালো থাকবেন?' ও বলে চলল, 'খালি প্রেতচক্র,

প্রেতচক্র আর প্রেতচক্র! এ ঠিক নয়—ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় আমরা এসব করি। আমার কথা যদি বলেন তা হলে আমি তো সোজা বলব, এ হল শয়তানের সঙ্গে লেনদেন।'

রাউল ওর কাঁধে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিল।

'রাগ কোরো না এলিস,' রাউল মিষ্টি কথায় ওকে ভোলাতে চাইল ঃ 'যা বোঝো না তার সবকিছুর মধ্যে শয়তানকে টেনে এনো না।'

এলিস সন্দেহে মাথা নাড়ল।

'সে মঁসিয়ে যাই বলুন,' ও চাপা গলায় গজগজ করে উঠল, 'এসব ব্যাপার-স্যাপার আমার ভালো লাগছে না। মাদামের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, দিনকে দিন তিনি শুধু রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে চলেছেন, আর সেইসঙ্গে মাথাধরা। না, এসব প্রেতাত্মা-টেতাত্মার ব্যাপার মোটেই ভালো নয়। প্রেতাত্মাই বটে! ভালো আত্মারা সব স্বর্গে, আর বাকিরা নিজেদের পাপের ফল ভোগ করছে।

'মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই সহজ-সরল, এলিস,' একটা চেয়ারে বসতে-বসতে রাউল বলল।

'বিয়ের পর এসব আর করবেন না, মঁসিয়ে,' অনুনয়ের সুরে বলল ও।

রাউল ওর দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসল।

'তুমি খুব বিশ্বাসী এলিস,' সে বলল, 'আর তোমাদের দিদিমণিকে খুব ভালোওবাসো। কোনও ভয় নেই, আমাদের বিয়েটা শুধু হতে দাও, তারপর থেকে, তোমার ভাষায়, এ-সব "প্রেতাত্মা-টেতাত্মার ব্যাপার" একদম বন্ধ। মাদাম দব্রোয়কে আর কোনও প্রেতচক্র নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

এলিসের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'সত্যি বলছেন?' আগ্রহের সঙ্গে জিগ্যেস করল ও।

গম্ভীরভাবে সম্মতি জানাল রাউল।

অনেকটা আত্মমগ্নভাবেই সে বলল, 'হ্যাঁ, এসবের একটা ইতি হওয়া উচিত। সিমোনের এক আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে, আর ও সেটা যথেচ্ছভাবে ব্যবহারও করেছে। কিন্তু এবারে ওর ক্ষান্ত হওয়া দরকার। তুমি ঠিকই বলেছ এলিস, ও দিনকে দিন শুধু ফ্যাকাসে আর রোগা হয়ে চলেছে। একজন মিডিয়ামের জীবন ভীষণ পরিশ্রম আর কষ্টের—সেইসঙ্গে রয়েছে ভয়ঙ্কর স্নায়ুর চাপ। যাই বলো এলিস, তোমার দিদিমণি প্যারিসের সবচেয়ে সেরা মিডিয়াম—শুধু প্যারিস কেন, গোটা ফ্রান্সের। সারা পৃথিবীর লোকেরা ওর কাছে আসে, কারণ তারা জানে, ওর কাছে কোনও ফাঁকিবাজি বা জালিয়াতি নেই।'

এলিস প্রতিবাদে ফোঁস করে উঠল ঃ জালিয়াতি! হুঁঃ, মাদাম চেষ্টা করে একটা কচি বাচ্চাকেও ঠকাতে পারেন না।'

'সে-কথা ঠিক। ও একটা দেবদূত।' উৎসাহের সঙ্গে বলল রাউল, 'মাদাম

pathagar.net

যে এখন থেকে প্রেতাত্মার যাবতীয় কারবার ছেড়ে দেবেন সে-কথা শুনে তুমি খুশি তো?'

সে ভেবেছিল এ-কথায় এলিস সত্যিই খুশি হবে, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বৃদ্ধ পরিচারিকাটি গম্ভীর হয়েই রইল।

'মনে করুন, মঁসিয়ে, যদি প্রেতাত্মারা মাদামকে ছেড়ে না দেয়?' ইতস্তত করে বলল ও।

রাউল অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ঃ 'তার মানে?'

'যদি প্রেতাত্মারা মাদামকে ছেড়ে না দেয়,' এলিস আবার বলল।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করো না, এলিস।'

'সে কে করে,' একগুঁয়েভাবে বলল ও, 'ওসবে বিশ্বাস করাটাই বোকামি। কিন্তু তবুও—।'

'তবুও কী?'

'আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, মঁসিয়ে। জানেন, আমি সবসময় ভাবতাম এসব মিডিয়ামরা চালাক ফেরেপবাজ। যারা নিজেদের আপনজনকে হারিয়েছে তাদের কায়দা করে শুধু ঠকায়। কিন্তু মাদাম সেরকম নন। উনি খুব ভালো। সৎ, আর—।'

ও গলা নামিয়ে ভয়ার্ত সুরে বলল, 'আর সত্যি-সত্যিই অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে। না, কোনও ছলচাতুরি তাতে নেই—সত্যিই অনেক কিছু ঘটে। সেইজন্যেই আমি ভয় পাচ্ছি। আমি নিশ্চিন্ত জানি, মঁসিয়ে, এ ঠিক নয়। এ প্রকৃতি আর ভগবানের পুরোপুরি বিরুদ্ধে। এর জন্যে কাউকে-না-কাউকে গুনে-গুনে দাম দিতেই হবে।'

রাউল উঠে এসে ওর কাঁধে হাত বুলিয়ে দিল।

'শান্ত হও, এলিস,' সে হেসে বলল, 'এসো, তোমাকে একটা ভালো খবর দিই। আজই আমাদের শেষ প্রেতচক্র। আজকের পর আর কোনও চক্র বসবে না।'

'ও, আজ তা হলে একটা চক্র আছে?' সন্দিহান সুরে প্রশ্ন করল বৃদ্ধা মহিলাটি।

'এটাই শেষ, এলিস, এটাই শেষ।'

এলিস অসন্তোষে মাথা নাড়ল।

'মাদাম মোটেই সুস্থ নন—' ও বলতে শুরু করল।

কিন্তু ওর কথায় বাধা পড়ল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক দীর্ঘকায় গৌরী মহিলা। ছিপছিপে সুন্দর চেহারার বত্তিচেলির ম্যাডোনার মুখ। রাউলের মুখ উজ্জ্বল হল, এবং বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এলিস চটপট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'সিমোন।'

ওর দীর্ঘ শুভ্র দু-হাত নিজের হাতে তুলে নিল রাউল, দু-হাতে চুমু খেল। সিমোন অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল রাউলের নাম।

pathagar.net

'রাউল, আমার সোনা—।'

আবার ওর দু-হাতে চুমু খেল রাউল, গভীর চোখে ওর দিকে তাকাল।

'সিমোন, তোমাকে কী ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। এলিস বলল যে, তুমি বিশ্রাম করছ; তোমার শরীর খারাপ নয়তো, সোনা?'

'না, শরীর খারাপ ঠিক নয়—' ও ইতস্তত করল।

ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসাল রাউল। নিজেও পাশে বসল।

'তা হলে বলো, কী হয়েছে।'

মিডিয়াম সিমোন আবছাভাবে হাসল।

'তুমি আমাকে বোকা ভাববে,' ও অস্ফুট কণ্ঠে বলল।

'আমি? বোকা ভাবব তোমাকে? কক্ষনও নয়।'

রাউলের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল সিমোন। মেঝের গালিচার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দু-এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল ও। তারপর নিচু গলায় দ্রুত বলে উঠল, 'আমার ভয় করছে, রাউল।'

মিনিট-কয়েক রাউল অপেক্ষা করল, ভাবল সিমোন কিছু বলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না বলায় সে উৎকণ্ঠায় বলে উঠল, 'ভয়? কীসের ভয়?'

রাউলের বিস্ময় বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল সিমোন, 'হ্যাঁ, অবাক লাগলেও কথাটা সত্যি। আমার কেন যেন ভয় করছে—এর বেশি কিছু জানি না। কীসের ভয়, কেন ভয় তাও বলতে পারব না, কিন্তু সবসময় একটা দুশ্চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—আমার কিছু একটা হবে—ভয়ঙ্কর কিছু...'

ও শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। রাউল আলতো হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল ঃ 'সোনা, ভেঙে পোড়ো না—লক্ষ্মীটি। এ মিডিয়ামের জীবনের মানসিক চাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমার এখন শুধু বিশ্রাম দরকার—বিশ্রাম আর শান্তি।'

সিমোনের মুখে নেমে এল কৃতজ্ঞতার ছায়া।

'হ্যাঁ, রাউল, ঠিকই বলেছ। শান্তি আর বিশ্রামই আমি চাই।'

ও চোখ বুজে এলিয়ে পড়ল রাউলের বাহুতে। সে ওকে আরও কাছে টেনে নিল। সিমোনের বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

'তুমি কাছে থাকলে আমি একটুও ভয় পাই না, রাউল। মিডিয়ামের ভয়ঙ্কর জীবন আমি ভুলে যাই। সব জেনেও তুমি এ-জীবনের অনেক কিছু জানো না।'

রাউলের আশ্লেষে শক্ত হল সিমোনের শরীর, চোখ খুলে ও শূন্য দৃষ্টি মেলে দিল সামনে।

'অন্ধকার কুঠরির মধ্যে আমি বসে থাকি, অপেক্ষা করি। সে-অন্ধকার বড় ভয়ঙ্কর রাউল, কারণ, এ-অন্ধকার শূন্যতায় ভরা। স্ব-ইচ্ছায় সেই অন্ধকারে নিজেকে সঁপে দিই আমি, হারিয়ে যাই। তারপর আর কিছুই জানতে পারি না, কিছু টেরও

pathagar.net

পাই না। কিন্তু শেষে একসময় আবার ফিরে আসতে হয়। অত্যন্ত ধীরে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমার ঘুম ভাঙে। কী ভীষণ ক্লান্ত লাগে—ভীষণ ক্লান্ত।'

'জানি সোনা, জানি,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল রাউল, 'কিন্তু তোমার তুলনা নেই, সিমোন—তুমি এ-দুনিয়ার সেরা মিডিয়াম।'

অল্প হেসে সিমোন মাথা ঝাঁকাল।

'হ্যাঁ, সত্যি।' রাউল বলল। পকেট থেকে দুটো চিঠি বের করল সে ঃ 'এই দ্যাখো, প্রফেসর রোশ এবং ড. জেনি একান্ত অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন তুমি যেন অন্তত তাঁদের প্রেতচক্রে মাঝেমধ্যে মিডিয়াম হয়ে বসো।'

'না-না!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সিমোন ঃ 'কক্ষনও না। এসবের শেষ হওয়া উচিত। তুমি আমাকে কথা দিয়েছ, রাউল।'

রাউল অবাক অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ও কাঁপছে। কোণঠাসা জন্তুর দৃষ্টি নিয়ে রাউলকে দেখছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরল ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো একশোবার সত্যি। কিন্তু তুমি আমাদের গর্ব সিমোন। সেইজন্যেই ওই চিঠি দুটোর কথা বললাম।'

সন্দেহের চকিত দৃষ্টিতে তাকাল সিমোন।

'তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি আবার প্রেতচক্রে বসি?'

'না, না। তবে এইসব পুরোনো বন্ধুদের জন্যে যদি তুমি মাঝে-মাঝে বসতে চাও তা হলে—।'

ও উত্তেজিতভাবে বাধা দিল রাউলকে ঃ 'না, কখনও না। এতে বিপদ আছে—আমি বলছি। আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি—ভয়ঙ্কর বিপদ।' সিমোন দু-হাতে নিজের কপাল চেপে ধরল, এগিয়ে গেল জানলার কাছে।

রাউল ওকে অনুসরণ করল, ওর কাঁধে অন্তরঙ্গভাবে হাত রাখল।

'সোনা,' কোমল সুরে বলল, 'তোমাকে কথা দিচ্ছি, আজকের পর আর কোনওদিন তোমাকে কোনও চক্রে বসতে হবে না।'

ওর হঠাৎ-চমকে-ওঠা স্পষ্ট টের পেল রাউল।

'আজ—' অস্ফুট স্বরে বলল সিমোন, 'ও, হ্যাঁ—মাদাম এক্সের কথা আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।'

রাউল নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল।

'উনি এখুনি এসে পড়বেন। কিন্তু সিমোন, তোমার যদি শরীর ভালো না থাকে—।'

সিমোন তার কথা শুনতেই পেল না। ও তখন নিজের চিন্তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

'উনি ভারি অদ্ভুত মহিলা, রাউল, ভারি অদ্ভুত মহিলা। জানো, ওঁকে দেখে

pathagar.net

আমার কেমন যেন—কেমন যেন ভয় করছিল।'

'সিমোন!'

রাউলের স্বরে ভর্ৎসনার সুর তৎক্ষণাৎ ওর কানে বাজল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি রাউল, তুমি আর সব ফরাসির মতো। তোমার কাছে মা একটা পবিত্র বস্তু, আর কোনও মা যখন তার হারানো বাচ্চার জন্যে কেঁদে আকুল হয় তখন তার সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করলে আমাকে নিষ্ঠুর বলেই মনে হবে। কিন্তু—আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না—ভদ্রমহিলা এত মোটা, তামাটে, আর তাঁর হাত দুটো—কখনও তাঁর হাত দুটো লক্ষ করেছ, রাউল? বিশাল শক্তিশালী দুটো হাত—ঠিক যেন কোনও পুরুষের। ওঃ!'

শিউরে উঠে চোখ বুজল সিমোন। রাউল হাত সরিয়ে নিয়ে শীতল স্বরে বলল, 'তোমাকে সত্যি বুঝে উঠতে পারলাম না, সিমোন। নিজে মেয়ে হয়ে আর-একজন মেয়ের জন্যে তোমার তো করুণাই হওয়া উচিত, বিশেষ করে যে-মেয়ে তার একমাত্র শিশুকে হারিয়েছে।'

সিমোন একটা অধৈর্যের ভঙ্গি করল।

'না, তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারছ না। এসব জিনিস কারও ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপরে নির্ভর করে না। প্রথম যখন আমি মাদাম এক্সকে দেখি তখনই আমার মনে দেখা দিয়েছে—আতঙ্ক। মনে আছে, তাঁর হয়ে প্রেতচক্রে বসতে রাজি হয়েছিলাম অনেক দেরিতে। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, তাঁর জন্যে আমার ভয়ঙ্কর কোনও ক্ষতি হবে।'

রাউল কাঁধ ঝাঁকাল।

'কিন্তু আসলে ঠিক উলটোটাই হয়েছে,' শুকনো স্বরে সে বলল, 'আমাদের প্রত্যেকটা চক্রই সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। ছোট্ট আমেলির আত্মা খুব সহজেই তোমাকে বশ করতে পেরেছে, আর তার দেহধারণগুলো হয়েছে এক কথায় অপূর্ব। শেষ চক্রটায় প্রফেসর রোশের থাকা উচিত ছিল।'

'দেহধারণ,' নিচু গলায় বলল সিমোন, 'খুলে বলো, রাউল। তুমি তো জানো, ওই আচ্ছন্ন অবস্থায় কী হয় না হয় কিছুই আমি টের পাই না। দেহধারণগুলো সত্যিই কি খুব সুন্দর হয়?'

উৎসাহভরে মাথা নাড়ল সে।

'প্রথম কয়েকটা চক্রে একটা আবছা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বাচ্চাটাকে দেখা গিয়েছিল,' রাউল বলল, 'কিন্তু শেষ চক্রটায়—।'

'হ্যাঁ, বলো?'

সে অস্ফুট স্বরে বলল, 'সিমোন, বাচ্চাটা যেন রক্তমাংসের কোনও শিশুর মতো চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এমনকী আমি ওকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেছি—কিন্তু

pathagar.net

তাতে তোমার যন্ত্রণা, কষ্ট ভয়ঙ্কররকম বেড়ে যায়। মাদাম এক্সকেও তাঁর বাচ্চাকে ছুঁতে দেব না। আমার তো ভয় করছিল যে, তিনি হয়তো নিজেকে আর সামলে রাখতে পারবেন না। হয়তো তোমার কোনও ক্ষতি করে ফেলবেন।'

সিমোন আবার জানলার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

'যখন জেগে উঠেছি তখন ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল,' ও বিড়বিড় করে বলল, 'রাউল, তুমি ঠিক—তুমি ঠিক বলছ তো, এসব করে আমরা কোনও অন্যায় করছি না? জানো, এলিস কী বলে, আমরা নাকি শয়তানের সঙ্গে লেনদেন করছি?'

ও অনিশ্চিতভাবে হাসল।

'জানো, আমি কী বিশ্বাস করি?' রাউল গম্ভীর স্বরে বলল, 'অজানাকে নিয়ে খেলা করার মধ্যে সবসময়েই বিপদ রয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ। আমাদের এই খেলা নিছকই বিজ্ঞানের প্রয়োজনে।'

শান্ত হল সিমোন, তার দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসল। তারপর দেওয়াল-ঘড়িতে চোখ রেখে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'মাদাম এক্সের বেশ দেরি হচ্ছে। উনি হয়তো শেষ পর্যন্ত আসবেন না।'

'উহুঁ, আমার মনে হয় আসবেন।'

'খালি ভাবছি, কে এই ভদ্রমহিলা, কে এই মাদাম এক্স?' ঘরে পায়চারি করতে-করতে মন্তব্য করল সিমোন, 'কোথায় তিনি থাকেন, কারাই বা তাঁর আত্মীয়স্বজন? আশ্চর্য, তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।' ও ঘরের টুকিটাকি আসবাবপত্র নতুন করে গুছিয়ে রাখতে লাগল।

রাউল কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, 'মিডিয়ামের কাছে যারা আসে তাদের বেশিরভাগই নিজের পরিচয় যথাসম্ভব গোপন রাখতে চায়। এটা একরকম প্রাথমিক সাবধানতা।'

'হতে পারে,' উদাস ভঙ্গিতে একমত হল সিমোন।

ওর হাতে ধরা একটা ছোট চিনেমাটির ফুলদানি খসে পড়ল অগ্নি-আধারের বাঁধানো টালিতে, ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। ও চকিতে ফিরে তাকাল রাউলের দিকে।

'দেখলে, আমি আর আমিতে নেই। মাদাম এক্সকে যদি বলি আমি আজ চক্রে বসতে পারব না, তা হলে তুমি আমাকে ভীষণ—ভীষণ ভিতু ভাববে, না?'

রাউলের মুখে যন্ত্রণাময় বিস্ময় দেখে সিমোন লাল হল।

'তুমি আমাকে কথা দিয়েছ, সিমোন—' রাউল শান্ত স্বরে বলতে শুরু করল।

সিমোন পিছিয়ে গেল দেওয়ালের দিকে।

'না, আমি পারব না, রাউল। আমি পারব না!'

রাউলের চোখে আবার সেই দৃষ্টি—কোমল ভর্ৎসনা। সিমোন কুঁকড়ে গেল।

'আমি টাকার কথা ভাবছি না, সিমোন—যদিও তুমি জানো এই মহিলা

pathagar.net

শেষবারের মতো চক্রে বসানোর জন্যে তোমাকে যে-অঙ্কের টাকা দিতে চাইছেন তা এককথায় বিশাল। তা ছাড়া এই মহিলা মা—যে তাঁর নিজের সন্তানকে হারিয়েছে। তুমি যদি সত্যি-সত্যি অসুস্থ না হও তা হলে নিছকই খেয়ালবশে একজন ধনী মহিলাকে নিরাশ করতে পারো, কিন্তু কোনও মা যদি তাঁর সন্তানকে শেষবারের মতো দেখতে চায়, তাকে ফেরাতে পারবে?'

হতাশায় দু-হাত ছুড়ে সিমোন বলল, 'আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না। তোমার কথা হয়তো ঠিক। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার ভয়ের কারণটা কী—শুধু একটা শব্দ ''মা''।'

'সিমোন!'

'কিছু-কিছু আদিম মৌলিক শক্তি আছে, রাউল। তাদের বেশিরভাগকেই সভ্যতা ধ্বংস করেছে, কিন্তু মাতৃত্ব আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। পশু—মানুষ, এই একটা ব্যাপারে সবাই সমান। নিজের সন্তানের প্রতি যে-ভালোবাসা, পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। সে ভালোবাসা কোনও আইন মানে না, কাউকে ভয় পায় না, পথ আগলে দাঁড়ানো সমস্ত বাধাকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেয়।'

ও থামল। সামান্য হাঁপাচ্ছে। রাউলের দিকে ফিরে তাকাল চকিত হেসে।

'আমি আজ কী বোকার মতো কথা বলছি, তাই না?'

রাউল ওর হাত ধরল ঃ 'দু-একটা মিনিট বিশ্রাম করো, অন্তত মাদাম এক্স না আসা পর্যন্ত।'

'ঠিক আছে।' অল্প হেসে ও চলে গেল ঘর থেকে।

রাউল মিনিট-কয়েক চিন্তায় ডুবে রইল, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল হলঘরে। হলঘরের অন্য প্রান্তে একইরকম আর-একটা ঘরে এসে দাঁড়াল সে। ঘরের একদিকে একটা ছোট কুঠরি। তাতে একটা বিশাল আরামকেদারা বসানো। কালো ভেলভেটের ভারি পরদা দিয়ে ইচ্ছে করলে কুঠরি-ঘরটাকে ঢেকে ফেলা যায়। এলিস তখন ঘরটা সাজাতে ব্যস্ত ছিল। কুঠরি-ঘরের খুব কাছে দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল সাজিয়ে দিয়েছে ও। টেবিলে একটা খঞ্জনি, একটা শিঙে, আর কিছু কাগজ ও পেনসিল রয়েছে।

'এই শেষবার,' গম্ভীর মুখে বিড়বিড় করে বলল এলিস।

এমনসময় একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল।

'যাও, এলিস, দেখো কে এল,' উদ্ধত কর্তৃত্ব নিয়ে বলল রাউল।

তার দিকে একপলক তাকিয়ে আদেশ পালন করল এলিস। মিনিটখানেকের মধ্যেই অতিথিকে নিয়ে সে ঘরে এল।

'দিদিমণিকে বলছি যে, আপনি এসেছেন, মাদাম।'

মাদাম এক্সের সঙ্গে করমর্দন করতে এগিয়ে এল রাউল। সিমোনের কথাগুলো

pathagar.net

তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল আবার।

'ভদ্রমহিলা এত মোটা, তামাটে...।'

ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে বিশাল চেহারার, আর তার ফরাসি শোকের পোশাক ঘোর কালো রঙের। তাঁর গলার স্বর যে বেশ গম্ভীর সেটা কথা বলতেই বোঝা গেল।

'আমার হয়তো সামান্য দেরি হয়ে গেছে, মঁসিয়ে। মাদাম সিমোন কোথায়? চক্রে বসবেন তো?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মাদাম এক্স। রাউলের হাতের ওপর তার হাতের চাপ হঠাৎই কঠিন হল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

মাদাম এক্স স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর হাত আলগা হল। মুখমণ্ডলকে ঘিরে থাকা ভারি কালো ওড়নার বাঁধন ঢিলে করে একটা চেয়ারে ডুবে গেলেন তিনি।

'ওঃ, মঁসিয়ে!' আপনমনে বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'এই সব চক্রে আমার আনন্দ, খুশি, আপনি বুঝতে পারবেন না, কল্পনাও করতে পারবেন না। আমার ছোট্ট সোনা! আমার আমেলি! ওকে দেখা, ওর কথা শোনা, এমনকী—এমনকী—হয়তো হাত বাড়িয়ে ওকে ছুঁতে পর্যন্ত পারব আমি!'

রাউল তৎক্ষণাৎ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, 'মাদাম এক্স, একমাত্র আমার নির্দেশ ছাড়া কোনও কিছুই আপনি করবেন না। নইলে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা আছে।'

'আমার বিপদ?'

'না, মাদাম, মিডিয়ামের।' বলল রাউল, 'প্রেতচক্রে মিডিয়ামের দেহধারণের সময় যেসব ঘটনা ঘটে সেগুলো বিজ্ঞান একভাবে ব্যাখ্যা করে। আমি আপনাকে খুব সহজ কথায় ব্যাপারটা বলছি। কোনও আত্মা যখন দেহধারণ করতে চায় তখন তাকে মিডিয়ামের কাছ থেকে সত্যিকারের দেহবস্তু ধার নিতে হয়। আপনি তো দেখেছেন, সেই সময় মিডিয়ামের মুখ দিয়ে কেমন ধোঁয়ার মতো বাষ্প বেরোয়। সেটা ধীরে-ধীরে ঘন হয়ে আত্মার মৃতদেহের শরীরী আকার নেয়। কিন্তু এই এক্টোপ্লাজ্‌ম মিডিয়ামের দেহবস্তু বলেই আমাদের বিশ্বাস। হয়তো কোনওদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা সূক্ষ্ম ওজন করে আমরা এ-কথা প্রমাণ করতে পারব—কিন্তু সে-পরীক্ষার প্রয়োজনে এ-ঘটনার সামান্য এদিক-ওদিক করতে চাইলেই মিডিয়ামের অসহ্য যন্ত্রণা ও মৃত্যুর আশঙ্কা। আত্মার ধারণ করা দেহকে কেউ যদি চেপে ধরে তা হলে মিডিয়ামের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।'

রাউলের কথা গভীর মনোযোগে শুনলেন মাদাম এক্স।

'এ বড় অদ্ভুত, মঁসিয়ে। বলুন তো, এমন কোনও দিন কি আসবে না যেদিন দেহধারণের পদ্ধতি এত উন্নত হবে যে, আত্মার ধারণ করা দেহ নিজেকে আলাদা করে নিতে পারবে স্রষ্টার কাছ থেকে, মিডিয়ামের কাছ থেকে?'

pathagar.net

'এ ভয়ঙ্কর অবাস্তব কল্পনা, মাদাম।'

কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে বলে চললেন, 'কিন্তু অসম্ভব তো নয়?'

'আজকের দিনে সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

'কিন্তু ভবিষ্যতে?'

রাউল উত্তর দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পেল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছে সিমোন। ওকে দেখে ক্লান্ত বিবর্ণ মনে হলেও নিজের ওপর ও নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। ও এগিয়ে এসে মাদাম এক্সের সঙ্গে করমর্দন করল। হাত মেলানোর সময় সিমোন যে একটু শিউরে উঠল সেটা রাউলের নজর এড়াল না।

'চক্রে বসবেন তো?' মাদাম এক্স জিগ্যেস করলেন।

'নিশ্চয়ই,' একটু রূঢ় স্বরে বলল সিমোন, 'আসুন, শুরু করা যাক।'

কুঠরি-ঘরে ঢুকে আরামকেদারায় বসে পড়ল ও। আচমকা এক ভয়ের ছায়া পড়ল রাউলের মনে। সে বলে উঠল, 'তোমার শরীর ঠিক নেই, সিমোন। আজ থাক।'

'মঁসিয়ে!' ঘৃণাভরা ক্রোধে উঠে দাঁড়ালেন মাদাম এক্স ঃ 'মাদাম সিমোন আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, আমার জন্যে উনি শেষবারের মতো একবার চক্রে বসবেন।'

'হ্যাঁ, কথা দিয়েছি,' শান্ত স্বরে বলল সিমোন, 'আর সে-কথা আমি রাখবও।' রাউলের দিকে ফিরে তাকাল ও ঃ 'ভয় পেয়ো না, রাউল। এই তো আমার শেষ চক্রে বসা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর কখনও আমাকে এ-কষ্ট পেতে হবে না।'

ওর ইশারায় কুঠরি-ঘরের চারদিকে ভারি কালো পরদা টেনে দিল রাউল। তারপর টেনে দিল ঘরের জানলার পরদাগুলো। ঘরটা ছেয়ে গেল আধো-অন্ধকারে। ইশারায় মাদাম এক্সকে একটা চেয়ার দেখিয়ে নিজে একটা চেয়ারে বসতে গেল। কিন্তু মাদাম এক্স ইতস্তত করতে লাগলেন।

'আমাকে ক্ষমা করবেন, মঁসিয়ে। আপনাকে বা মাদাম সিমোনকে আমি অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, লোকে যাতে আমার কথার আরও বেশি দাম দেয় সেজন্যে এই জিনিসটা আমি সঙ্গে এনেছি।'

নিজের হাতব্যাগ খুলে একটা সরু দড়ি বের করলেন তিনি।

'মাদাম!' চিৎকার করে উঠল রাউল, 'এ অত্যন্ত অপমান...।'

'উহুঁ, শুধু সাবধানতা।' শীতল স্বরে বললেন মাদাম এক্স, 'আপনি কেন আপত্তি করছেন বুঝতে পারছি না, মঁসিয়ে। যদি আপনাদের কাজে কোনও জালিয়াতি না থাকে তা হলে এতে ভয় পাওয়ার কী আছে?'

অবজ্ঞার হাসি হাসল রাউল ঃ 'নিশ্চিন্ত থাকুন, মাদাম, আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ইচ্ছে হলে আমার হাত-পা বাঁধতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।' মাদাম এক্স দড়ি নিয়ে এগোলেন রাউলের দিকে।

হঠাৎ পরদার ওপাশ থেকে ভেসে এল সিমোনের চিৎকার, 'না রাউল, খবরদার

pathagar.net

রাজি হয়ো না।'

উপহাসের হাসি হাসলেন মাদাম এক্স। ব্যঙ্গভরা সুরে মন্তব্য করলেন, 'মাদাম দেখছি ভয় পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'কী বলছ, সিমোন,' চিৎকার করে উঠল রাউল, 'মাদাম এক্স ভাবছেন আমরা জালিয়াত, ভণ্ড।'

'আমাকে নিঃসন্দেহ হতে হবে,' গম্ভীরভাবে মাদাম এক্স বললেন। নিয়মমাফিক নিজের কাজ শুরু করলেন তিনি। শক্ত করে রাউলকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধলেন।

বাঁধা শেষ হলে রাউল ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, 'এবার খুশি তো?'

মাদাম এক্স সে-কথার উত্তর দিলেন না। ঘরের চারিদিকে ঘুরে-ফিরে দেওয়ালের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপরে হলঘরে যাওয়ার দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা রাখলেন নিজের কাছে। অবশেষে এসে বসলেন চেয়ারে।

'নিন, এবার আমি তৈরি।' তাঁর কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত সুর।

সময় বয়ে চলল। পরদার পিছনে সিমোনের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে ভারি হয়ে এল, অনেকটা নাক ডাকার শব্দের মতো। তারপর সে-শব্দ পুরোপুরি মিলিয়ে গিয়ে শোনা গেল একটানা চাপা গোঙানি। আবার কিছুক্ষণ নীরবতা; নিস্তব্ধতা ভাঙল খঞ্জনির ঝনঝন শব্দে। শিঙেটা কেউ যেন টেবিল থেকে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল মেঝেতে। শোনা গেল বিদ্রুপের হাসি। কুঠরির ভারি পরদা যেন সামান্য সরে গেল। খোলা অংশ দিয়ে চোখে পড়ছে মিডিয়ামের দেহ। তার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। হঠাৎ মাদাম এক্স জোরে শ্বাস নিলেন। সরু ফিতের মতো কুয়াশার রেখা বেরিয়ে আসছে মিডিয়ামের মুখ থেকে। সেটা জমাট বেঁধে ক্রমে একটা আকার নিতে লাগল —একটা শিশুর আকার।

'আমেলি! আমার ছোট্ট সোনা আমেলি!' কর্কশ ফিসফিসে স্বর বেরিয়ে এল মাদাম এক্সের ঠোঁট চিরে। ঝাপসা দেহ আরও ঘন হল, স্পষ্ট হল। রাউল অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এর চেয়ে সুন্দর দেহধারণ আগে কখনও সম্ভব হয়নি। এ যেন সত্যিকারের শিশু—রক্তমাংসের জীবন্ত শিশু দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে।

'ম্-মা!' হালকা শিশুসুলভ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'সোনামণি আমার!' চিৎকার করে উঠলেন মাদাম এক্স। তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠে পড়লেন।

'খবরদার, মাদাম,' চিৎকার করে সাবধান করল রাউল।

ধারণ করা দেহটা ইতস্ততভাবে বেরিয়ে এল পরদার বাইরে। একটা ছোট্ট মেয়ে। সামনে দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

pathagar.net

'মা—।'

মাদাম এক্স এক অদ্ভুত শব্দ করে আবার উঠে দাঁড়ালেন।

'মাদাম,' ভয়ে পেয়ে চিৎকার করে উঠল রাউল, 'মিডিয়ামের এতে...।'

'ওকে আমি কোলে নেব,' কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন মাদাম এক্স। এক পা এগিয়ে গেলেন সামনে।

'ভগবানের দোহাই মাদাম, নিজেকে সংযত করুন। এক্ষুনি বসে পড়ুন চেয়ারে।' রাউল চিৎকার করে বলল। এবারে সে সত্যিই ভয় পেয়েছে।

'আমার সোনা! ওকে একটিবার আমি বুকে নেব।'

'আপনাকে আমি হুকুম করছি, মাদাম, বসে পড়ুন!'

বাঁধনের মধ্যে রাউলের শরীরটা মরিয়া হয়ে সাপের মতো নড়ছে, কিন্তু মাদাম এক্স তাঁর কাজে কোনওরকম খুঁত রাখেননি। রাউল একান্ত অসহায়। ধ্বংসের আতঙ্কে ডুবে গিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'ভগবানের দোহাই, মাদাম, বসে পড়ুন! মিডিয়ামের কথা খেয়াল রাখবেন!'

মাদাম এক্স তার কথায় কোনও কান দিলেন না। তিনি যেন বদলে যাওয়া এক মানুষ। তাঁর মুখমণ্ডল ছেয়ে গেছে উলঙ্গ উচ্ছ্বাস আর আনন্দে। পরদার ফাঁকে দাঁড়ানো ছোট্ট শরীরটাকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন তিনি। মিডিয়ামের কাছ থেকে এক ভয়ঙ্কর গোঙানি ভেসে এল।

'ওঃ ভগবান!' চিৎকার করে উঠল রাউল, 'ওঃ ভগবান! এ অসহ্য! মিডিয়ামের—।'

মাদাম এক্স কর্কশ হাসিতে ফিরে তাকালেন রাউলের দিকে।

'আপনার মিডিয়ামের কথা আমি ভাবতে বসে আছি!' তীব্র স্বরে তিনি বললেন, 'আমি শুধু আমার সোনামণিকে চাই।'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন!'

'সোনামণিকে আমার চাই! আমার! আমার নিজের রক্তমাংস! মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরে আয়, সোনা। এই তো তুই বেঁচে আছিস।'

রাউল কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার ঠোঁট চিরে কোনও শব্দ বেরোল না। ভদ্রমহিলা তখন ভয়ানক হয়ে উঠেছেন। দয়াহীন, নৃশংস, নিজের আবেগে মত্ত। শিশুর ঠোঁট ফাঁক হল তৃতীয়বারের জন্য, প্রতিধ্বনিত হল একই শব্দ—'মা'।

'আয়, আমার সোনা, আয়—।' মাদাম এক্স ডেকে উঠলেন। চকিতে শিশুটিকে তুলে নিলেন বুকে। পরদার ওপিঠ থেকে ভেসে এল নিদারুণ যন্ত্রণার এক দীর্ঘস্থায়ী আর্তচিৎকার।

'সিমোন!' রাউল চিৎকার করে ডাকল, 'সিমোন! সিমোন!'

ভাসা-ভাসাভাবে সে টের পেল মাদাম এক্স ছুটে তাকে পার হয়ে গেলেন।

pathagar.net

শোনা গেল বন্ধ দরজার তালা খোলার আওয়াজ। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল অস্থির পায়ের শব্দ।

পরদার পিছন থেকে তখনও ভেসে আসছে একটানা আর্তচিৎকার—এ-চিৎকার রাউল জীবনে কখনও শোনেনি। সেটা ক্রমে মিলিয়ে গেল এক ভয়ঙ্কর ঘড়ঘড় শব্দে। তারপর কানে এল ধপ করে কারও পড়ে যাওয়ার শব্দ।

রাউল তখন পাগলের মতো নিজের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে। উন্মাদ শক্তির কাছে অসম্ভব সম্ভব হল। নিছক গায়ের জোরেই দড়িটা ছিঁড়ে গেল। সে যখন ঠিকঠাক হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে, এলিস ঘরে ঢুকল চিৎকার করতে করতে, 'মাদাম, মাদাম!'

'সিমোন!' রাউল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠল।

দুজনে ছুটে গিয়ে সরিয়ে দিল কালো পরদা।

রাউল থমকে পিছিয়ে গেল।

'ওঃ ভগবান! লাল—সব লাল...।'

তার পাশ থেকে কর্কশ কাঁপা গলায় এলিস বলে উঠল, 'মাদাম শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন। শেষকালে এই হল পরিণতি। কিন্তু, মঁসিয়ে, কী হয়েছে বলুন তো! মাদাম এরকম কুঁকড়ে গেছেন কেন—তাঁর শরীর যে অর্ধেকের চেয়েও ছোট হয়ে গেছে! সত্যি-সত্যি কী হয়েছে, বলুন না?'

রাউল পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, 'জানি না! জানি না! আমি পাগল হয়ে যাব...সিমোন! সিমোন!'

➤ *লাস্ট সিয়াঁস*

pathagar.net

অদৃশ্য মুখ

টম ক্রিস্টেনসেন

pathagar.net

একটা সময় ছিল যখন আমি প্রতি রাতে শহরতলির পথে-পথে বহুক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে বেরিয়ে পড়তাম। আমার বাবা-মা এই নৈশভ্রমণে মোটেই খুশি ছিলেন না, ফলে আমার শোওয়ার ঘরের কাঠের দেওয়ালের প্রতিটি ফাটলের ওপরে ধর্মীয়বিধি লেখা কাগজের টিরকুট আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতেন। কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা। প্রতি সন্ধ্যায় আমি বেরিয়ে পড়তাম, আর গভীর রাতে এসে এমন একটা জায়গায় দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়তাম যেখানে মা-বাবা কাগজ লাগাতে ভুলে যাওয়ায় সামান্য ফাটল দিয়ে বাইরের বাতাস ঘরে এসে ঢুকত। এতে আমি এক অদ্ভুত দুষ্টুমির আনন্দ পেতাম। কারণ, সেই ফাটল দিয়ে সমস্ত অশুভ আত্মা ঘরে এসে ঢুকতে পারে। তা ছাড়া ওদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগত না। কারণ, মনের অস্থির ভাবটা আমি কখনও খোয়াতে চাই না।

পথে বেড়াতে বেরিয়ে আমি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতাম। গভীর রাতে অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হয়ে পড়ায় ওদের সেইসব মুখ আমি দেখতে পেতাম যেগুলো লুকিয়ে ফেলতে পারলেই ওরা স্বস্তি পেত। আমি লক্ষ করতাম, ওদের মুখের ওপর অন্ধকারের আতঙ্কের অসংখ্য রেখা, ভয় পাওয়ার করাল ছায়া। এইসব মুখ আমি সংগ্রহ করতাম, আর দিনের বেলা তুহিন-আনন্দে সেগুলোকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতাম। অনেকটা যেন শয়তান-নাচের মুখোশ সংগ্রহ করার মতো। তবে শুধু একটা মুখোশই তাতে নেই—আমার নিজেরটা।

একদিন সন্ধ্যায় কিয়োবাশি জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখি আমার বন্ধু, কাপড়

ব্যবসায়ী মাৎসুয়ার দোকান থেকে হালকা আলো বেরিয়ে আসছে। ওর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছে আজ থেকে দু-বছর আগে, সুতরাং আনমনেই হেসে উঠে ওর দোকানে ঢুকে পড়লাম। মনে এক অদ্ভুত শীতল ঘৃণা। নিজের আচরণে আমি নিজেই অবাক। মুখোশ সংগ্রহ করতে-করতে আমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি?

আমাকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে মাৎসুয়া চা-পানের অনুরোধ করল। পিতলের ধুনিটা সামনে এগিয়ে দিল যাতে আমি হাত দুটো গরম করতে পারি।

'শুনেছি তুমি নাকি অন্ধকারে পথে-পথে ঘুরে বেড়াও? এ কি সত্যি?' আমার দিকে না তাকিয়েই ও প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ!'

'কখনও কোনও আত্মার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'না!'

'কখনও "মুজিনা" দেখেছ?'

'না! মুজিনা কী আমি জানি না।'

'আমিও জানি না, তবে এক ধর্মযাজককে একবার জিগ্যেস করেছিলাম যে, আমি যা দেখেছি সেটা কী, তাতে উনি বলেছিলেন, ওটা মুজিনা।'

'কিন্তু মুজিনা কী?' আমি জানতে চাইলাম।

'জানি না—সেই ধর্মযাজকও বলতে পারেননি।'

নিজের হাঁটুতে চোখ রেখে আমি বসে রইলাম। কিন্তু মাৎসুয়া আর কিছু বলছে না দেখে বিদ্যুৎঝলকের মতো ওর দিকে চোখ তুলে দেখলাম, ও মুখ হাঁ করে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। মনে হল, ওর ভেতরটা যেন ফাঁপা।

তারপর দুটো আলোর কণা ওর কালো চোখের গভীরে হঠাৎই যেন জন্ম নিল এবং ক্রমশ কাছে আসতে লাগল। অনেকটা অন্ধকার রাস্তা ধরে এগিয়ে আসা লণ্ঠনের মতো। অবশেষে ওরা ওপরের স্তরে উঠে এল। ও চোখ বন্ধ করে আর্তনাদ করে উঠল, তারপর সংবিত ফিরে পেল।

'ওঃ কী ভয়ঙ্কর!' মাৎসুয়া বলল, 'মুজিনা কী বীভৎস—সে আমি বলে বোঝাতে পারব না, কারণ বোঝানোর মতো কিছু নেই—মুজিনা নৃশংস, তবে পালানোর সুযোগ দেয়—আপাতভাবে। যদি ওটা একটা কান ছিঁড়ে নিত—অথবা কাউকে খেয়ে ফেলত—তা হলে একটা মানে বুঝতে পারতাম—কিন্তু মুজিনা সেসব কিছুই করে না—ওঃ, আমার ভীষণ ভয় করছে।'

মাৎসুয়া হাঁ করল, যেন এক্ষুনি চিৎকার করে উঠবে, তারপর সেইভাবে অনেকক্ষণ বসে রইল। অনিঃসৃত সেই পাগল করা দীর্ঘ চিৎকারে আমার কানে যেন তালা লেগে গেল।

তারপর একসময় ওর মুখ বন্ধ হল। কোনওরকম ভূমিকা না করেই চাপা গলায় অনেকটা গানের ভঙ্গিতে ও বলতে শুরু করল—যেন এ-গল্প ওর মুখস্থ হয়ে

pathagar.net

গেছে।

'একদিন রাতে একটা মাঠের ওপর দিয়ে সংক্ষেপে হাঁটছিলাম। সাধারণত এইসব সময়েই লোকে অশুভ জিনিসের দেখা পায়। চারিদিকে অন্ধকার, কিছুই নজরে পড়ছে না। তা হলে কেমন করে আমি সেই ছোট্ট পুকুর, একটা গাছ আর ওই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম? আকাশে চাঁদ ছিল না, আর সেই পুকুর, গাছ কিংবা মেয়েটির কাছ থেকে কোনও আলো আমার চোখে আসেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি দেখতে পেলাম। মেয়েটি মাথা ঝুঁকিয়ে বিষণ্ণভাবে বসে ছিল। কান্নার তীব্র দমকে ওর কাঁধ দুটো থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে।

'আমি এগিয়ে গিয়ে ওর কাছে বসলাম। ভয় হচ্ছিল, হতাশায় ও হয়তো পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

' ''এখানে কোনও যুবতীর বসে থাকা ঠিক নয়,'' আমি ওকে বললাম। ওর কাঁধে হাত রাখলাম। একইসঙ্গে লক্ষ করলাম, ওর পরনের কিমোনো অদ্ভুত সুন্দর রেশমের তৈরি। আমি তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিলাম। আমার দোকানে কখনও এত ভালো রেশমী কাপড় আসেনি। এখনও যেন সে কাপড় আমি অনুভব করতে পারছি।

' ''রাতে এই সময়ে এ-জায়গায় ভয় আছে।'' আমি বলে চললাম। কিন্তু ও আরও ঝুঁকে পড়ল, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলল। পোশাকের চওড়া হাতায় নিজের মুখ লুকিয়ে রইল।

' ''আপনার কোনও সাহায্যের দরকার থাকলে বলুন। কীসের দুঃখ—'' ও একটু সরে বসল।

' ''আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমি কিছুতেই আপনাকে আত্মহত্যা করতে দেব না! দয়া করে কাঁদবেন না!''

'ও ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল, যেন আমার কথায় শান্তি পেয়েছে; তারপর আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল; কিন্তু আমি চলে যেতে পারলাম না। ওকে ওখানে একা রেখে আমি যেতে পারি না। সুতরাং উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাছে গেলাম।

' ''আসুন! এই বিপজ্জনক পুকুরের কাছ থেকে আমরা চলে যাই!'' আমি বললাম। তখন ও ঘুরে দাঁড়াল। দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে রেখেছে। মনে হল ওর কান্না-ভেজা চোখ দুটো আমার কাছ থেকে লুকোতে চাইছে। তারপর ও কপাল আর নাকের ওপর দিয়ে হাত বোলানোর একটা ভঙ্গি করল। আমি ঝুঁকে পড়লাম। ওর মুখটা দেখতে চাইলাম, ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, ওর চোখে চোখ রাখতে চাইলাম; কিন্তু—ওর কোনও চোখ নেই, নাক নেই, মুখ নেই। ওর গোটা মুখমণ্ডল ডিমের মতোই মসৃণ।' মাৎসুয়া আমার দিকে চোখ ফেরাল, যেন সাহায্যের আশায়, কিন্তু আমি দেখলাম ওর গাল দুটো ডাঙা এবং সেগুলো ওর মুখোশের ওপরে মজাদার ভাঙাচোরা রেখার জন্ম দিয়েছে। ওর মুখের প্রতিটি অদ্ভুত খুঁটিনাটি আমি নিষ্ঠুর

pathagar.net

স্পষ্টভাবে দেখতে লাগলাম। অবশ্য কেন তা বলতে পারি না।

আমি শব্দ করে হাসলাম। নিজের দৃঢ় ভরাট গালে আত্মতুষ্টিতে হাত বুলিয়ে বললাম, 'এই তোমার মুজিনা?' আমার কথায় নিষ্করুণ ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

'এমনি করে হেসে উড়িয়ে দিয়ো না!' মাৎসুয়া অনুনয় করে বলল, 'সে যে কী ভয়ঙ্কর কী বলব! আর-একটু হলে আমি ভয়েই মরে গিয়েছিলাম। মাঠ ধরে আমি তখন ছুটতে শুরু করেছি। উঁচু-নিচু জমিতে হোঁচট খেতে-খেতে ছুটে চলেছি, আর এমন ভয়ঙ্কর চিৎকার করে চলেছি যেন আমার আত্মা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পালাতে চাইছে, আরও জোরে ছুটতে চাইছে। ওই মেয়েটি তারপর কী করেছে জানি না। আমি ঘুরে তাকাতে সাহস পাইনি—।'

মাৎসুয়া একমুহূর্ত থামল। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি একজায়গায় জড়ো করে আবার তার কাহিনি শুরু করল। ও আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

এক টুকরো টিস্যু কাগজ নিয়ে আমি নাক মুছলাম। তারপর ভুরু ওপর-নীচ করে শরীরের হালকা ক্লান্তিটুকু দূর করতে চাইলাম।

গল্পের খেই ধরে একইরকম একঘেয়ে গুনগুন স্বরে মাৎসুয়া আবার শুরু করল ঃ

'তখন সৌভাগ্যবশে কিছু দূরে একটা ছোট্ট আলো আমার নজরে পড়ল। ঠিক বুঝতে পারলাম না, আলোটা কোনও খোলা জানলা দিয়ে আসছে, না রাস্তা থেকে আসছে; কিন্তু এটুকু মনে হল, কাছাকাছি কোনও লোকালয় রয়েছে। তখন আমি যেন ভীষণ স্বস্তি পেলাম। আলোটা ক্রমশ বড় হতে লাগল। সামান্য নড়েও উঠল, তারপর আবছাভাবে যেন কাউকে দেখতে পেলাম। আলোটা রাস্তা ধরেই এগিয়ে আসছে।

'আমি ছুটে গেলাম সেই আলো লক্ষ করে। গিয়ে দেখি এক ফেরিওয়ালা তার জিনিসপত্রের ডালা নামিয়ে সবে সাজাতে শুরু করেছে।

' "বাঁচান! বাঁচান!" আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'ছোট্ট আলোটা লোকটার সস্তা নীল প্যান্টের ওপর এক লালচে আভা ছড়িয়ে দিয়েছে, তার হাতের কয়েকটা ছোট বাটিতে প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়ছে।

' "কী হয়েছে? চিৎকার করছেন কেন?" সে রুক্ষ সংক্ষিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করল।

' "ওঃ, সে আমি বলতে পারব না।"

' "রাস্তায় চোর-ডাকাত বেরিয়েছে নাকি।" সে অবজ্ঞার সুরে বলল।

' "না, না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না! আর আপনাকে বলতেও পারব না।" যন্ত্রণাকাতর চিৎকার করে আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।'

' "ও, তা হলে বোধহয় এই ব্যাপার।" নিজের মুখের ওপর হাত বুলিয়ে সে উত্তর দিল। আর তখনই আমি দেখতে পেলাম। লণ্ঠনের আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, তার চোখ, নাক, মুখ কিছু নেই—মুখটা ঠিক একটা ডিমের মতো!

pathagar.net

'কী করে যে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরেছিলাম জানি না।'

মাৎসুয়া সামনে ঝুঁকে বসল। ও এখনও আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে। ওর কপালে অসংখ্য খাপছাড়া রেখা। ঠোঁট যেন ঝুলে পড়েছে।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না!' ও ফিসফিস করে বলল, 'মাঝরাতে হঠাৎ আমি জেগে উঠি, এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা টের পাই—সেই আতঙ্ক যেন এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি। কী করে সেই রাতের কথা আমি ভুলব? কী করব আমি এখন? আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।'

ওর জন্যে আমার মনে এতটুকু দরদ হল না। ওর মুখের চেহারা এত হাস্যকর আর কথাগুলো এত গতানুগতিক যে, আমি হেসে উঠে বললাম, 'এ-ই সব?'

মাৎসুয়া বিহ্বলভাবে চোখ তুলে তাকাল এবং একইসঙ্গে আমি আমার ঠান্ডা কপাল মুছলাম। আমার কপালে ওর মতো কোনও ভাঁজ নেই ভেবে এক শয়তানি আনন্দ অনুভব করলাম।

হঠাৎই মাৎসুয়ার মুখ পালটে গেল। উদভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ হাঁ করে এক বিকট চিৎকার করে উঠল।

আমি ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি নিয়ে চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে রইলাম।

'মুজিনা!' আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ও চিৎকার করে উঠল। বিরাট এক গর্তের মতো ওর মুখ এখনও হাঁ করা। ওর গলা থেকে এক অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ উঠে এল, আর তারপরই শুরু হল আকস্মিক দীর্ঘ, ধারাবাহিক চিৎকারের মিছিল। ও লাফিয়ে উঠল, ধুনিটাকে উলটে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল দোকানের বাইরে।

ও পাগল হয়ে গেছে, এই কথা ভেবে আমি যেমন বসেছিলাম তেমনই বসে রইলাম। লক্ষ করলাম, ধুনির জ্বলন্ত কাঠকয়লাগুলো মেঝের কার্পেট পুড়িয়ে গর্ত করে ফেলেছে। একটা ছোট্ট আগুনের শিখা কার্পেটের এক প্রান্ত লেহন করে তার যাত্রা শুরু করল। অন্য প্রান্ত ধরে আরও একটা শিখা একইভাবে এগিয়ে চলল। একসময় ওদের দেখা হল, এবং এক বিশাল শিখা জন্ম নিল। সেটা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। মনে হল, ধোঁয়ায় আমার চোখ জ্বলছে, ফলে আমি হাত তুলে চোখ ঘষতে গেলাম। তখনই আবিষ্কার করলাম আমার কোনও চোখ নেই। মুখের ওপর হাত বোলালাম। আমার মুখ ডিমের মতো মসৃণ। নিঃসীম আতঙ্কে আমি লাফ দিয়ে উঠলাম, ছুটে গেলাম একটা ড্রয়ারের কাছে, এক হ্যাঁচকায় ড্রয়ার খুলে একটা আয়না বের করে তাতে দেখলাম। একটা সাদা ডিম্বাকৃতি খোল, তাতে কোনও আঁচড়টি পর্যন্ত নেই। আমার চুলগুলো অপার্থিব ভঙ্গিতে ডিমের ওপরে গজিয়ে উঠেছে।

কিন্তু চোখ, যা দিয়ে আমি এসব দেখছি! আমার সেই চোখ কোথায়?

ডিমের সাদা খোলা ভেদ করে আমি আয়নায় তাকালাম। দেখলাম, ডিমটা আমার মাথার নড়াচড়া অবিকল নকল করে চলেছে—আমার চুল নিয়ে আমারই ঘাড়ের ওপরে বসে আছে।

আতঙ্কে সবকিছু ভুলে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। ছুটে বেরিয়ে গেলাম রাস্তায়। চারপাশে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন লোক চুপচাপ শান্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা এখনও আগুন দেখতে পায়নি।

চট করে হাত তুলে মুখ ঢাকা দিয়ে ছুটে চললাম বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে একটা টুপি দিয়ে মুখ আড়াল করে আয়নাটা হাতে নিয়েই মা-বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'তোমাদের কাছে ধর্মীয়বিধি লেখা আর কোনও কাগজ আছে? আমার ঘরে এখনও একটা ফাটল রয়েছে, সেটা দিয়ে মুজিনা ঢুকে পড়তে পারে।'

কয়েক চিলতে কাগজ এনে ওঁরা তৎক্ষণাৎ সেই ফাটলের ওপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমি মাৎসুয়ার আয়নাটা তুলে ধরলাম; গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো পুরোনো দামি হাত-আয়না, পেছনে কতগুলো সারসের ছবি খোদাই করা। আয়নায় তাকিয়ে আমি আবার নিজের পুরোনো মুখটা ফিরে পেলাম।

পরদিন শুনলাম, কিয়োবাশির একটা বিরাট এলাকা সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং এক মাঠের ওপরে এক ছোট্ট পুকুরে মাৎসুয়ার মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া গেছে।

তারপর থেকে অন্ধকার হয়ে এলেই আমি বাইরে বেরোতে সাহস পাই না। আমার মা-বাবা ভাবেন আমি পড়াশোনা করি, প্রার্থনা করি। কিন্তু আমি বসে থাকি মাৎসুয়ার আয়নাটা হাতে নিয়ে, পরীক্ষা করি নিজের মুখ। মুখটা কোথাও কি শক্ত হয়ে উঠেছে? ওটা কি পালটে যাচ্ছে একটা মসৃণ ডিমে? এখন আমি শুধু একটা মুখোশই খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করি—সেটা আমার নিজের মুখ। নিজের মুখটাকে আমি ভীষণ ভয় পাই।

➤ *দ্য ভ্যানিশ্‌ড ফেসেস*

নেকলেস

ডুলসি গ্রে

pathagar.net

খুদে বার্নার্ড স্টাব্‌স অন্যান্য ছেলের মতো ছিল না। তার মাথাটা বিরাট বড়, চেহারা ছোটখাটো আর একটা পা পঙ্গু। সে কথা খুব কম বলত, তবে যখন বলত তখন আধো-আধো উচ্চারণের সঙ্গে তোতলামি দেখা দিত। তার স্বভাব ছিল তার চেহারার মতোই খারাপ। অল্পেতে সে রেগে উঠত, দয়ামায়া বলে কিছু ছিল না। ফলে তাকে দেখে মোটেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করত না।

তার বাবা-মা তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা হয়ে উঠল অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। স্থানীয় সমাজসেবীরা পরামর্শ দিয়েছে ছেলেটির 'ব্যবস্থা' করতে, কিন্তু বাবা-মা'র মন চায়নি। তাদের ধারণা, বাড়িতে থেকে মানুষ হলে ছেলের পক্ষে ভালো হবে। ফলে সমাজসেবীদের নিরস্ত হতে হয়েছে।

বার্নার্ড স্টাব্‌স সেলাই করতে ভালোবাসে। এমনিতে জড়বুদ্ধি হলেও তার হাতের কাজ বেশ পোক্ত আর চটপটে ছিল। সে সবচেয়ে ভালোবাসত বড়-বড় চিনে পুঁতি গেঁথে নেকলেস কিংবা ব্রেসলেট তৈরি করতে। তারপর সেই গয়না দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে সে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে থাকত আয়নার সামনে। দৃশ্যটা তাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

এ ছাড়াও সে মাছির ডানা টেনে ছিঁড়তে ভালোবাসত। পাশের বাড়ির পোষা বেড়ালটার লেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। ক্বচিৎ কদাচিৎ সে তার মাকে 'সুন্দর' পুঁতির নেকসেল উ-উ-উপহার দিত। তারপর কয়েকদিন ধরে মাকে সেই নেকলেসটা পরে থাকতে বাধ্য করত। যদি মা না পরত, তা হলে সে প্রচণ্ড রেগে

খেপে উঠে এক কেলেঙ্কারি বাধাত।

বার্নার্ডের মা-বাবার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

ভালোর মধ্যে বলতে গেলে সে যখন হাতের কাজ নিয়ে ডুবে থাকত, তখন ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বেশ সুখেই কাটাত। ফলে সেই সময়টাতে সে শান্তশিষ্ট চড়ুই কিংবা রবিন পাখিগুলোকে ধরে তাদের ঘাড় মটকাতে পারত না।

বার্নার্ডের অষ্টম জন্মদিনে তাকে একটা ট্রাউট মাছ খেতে দেওয়া হল। এই প্রথম তার প্লেটে একটা গোটা মাছ দেওয়া হয়েছে, আর নিজে কাঁটা বেছে খাওয়ার স্বাধীনতা সে পেয়েছে। গোটা মরা মাছ সে আগে কখনও দেখেনি, কারণ অতি সাবধানী মা কখনও তাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিত না। ট্রাউট মাছটাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

'মাত্। মাত্! তমৎকার মাত্।' সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

'হ্যাঁ, সোনা,' তার মা বলল, 'মাছ খেয়ে নাও।'

'তোখ, তোখ।' সে খুশিতে বলেই চলল, 'কী তুন্দর তোখ। মাতের তোখ। মাতের তোখ। কী তুন্দর।'

'হ্যাঁ, বাবা, খুব সুন্দর মাছের চোখ।' তার মা আদর করে সমর্থন জানাল।

একান্ত মনোযোগে চুপচাপ বার্নার্ড মাছ খাওয়া শেষ করল। বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রতিটি কাঁটা সে বেছে ফেলল। তবে বাবা ও মা সেটা না দেখার ভান করে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ করে বাবা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, উঠে চলে গেল বাগানের দিকে। মা টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করল। কিন্তু বার্নার্ড যেন একটা গভীর ঘোরের মধ্যে বসে রইল। মাছ, বাঁধাকপির পাতা, আইসক্রিম, মুখে সব মাখামাখি হয়ে আছে।

এমনসময় টেলিফোন বেজে উঠলে মিসেস স্টাব্স সেটা ধরতে গেল। বার্নার্ড টেবিল ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

ঠিক সাড়ে তিনটেয় জিনিসটা সম্পূর্ণ হল। চিনে পুঁতি আর ট্রাউট মাছের চোখ দিয়ে তৈরি একটা নিখুঁত ছোট ব্রেসলেট।

'তমৎকার! তমৎকার! মাতের তোখ তুন্দর।' বার্নার্ড ব্রেসলেটটা তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে মা। তোমার জন্যে।'

'কী সুন্দর।' গা গুলিয়ে উঠলেও মিসেস স্টাব্স মুখে বাহবা জানাল ছেলেকে। অস্বস্তির সঙ্গে দু-দুটো দিন ব্রেসলেটটা পরে রইল। তারপর যেন দয়াপরবশ হয়েই মাছের চোখ দুটো গলে ঝরে গেল।

এরপর থেকে বার্নার্ডকে চোখের নেশা পেয়ে বসল। সে সর্বক্ষণ আয়নায় নিজের চোখের দিকে চেয়ে থাকে। বাবা-মা'র চোখের দিকেও চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকে বাগানের পাখিদের চোখের দিকে। পড়শিদের অসুস্থ বেড়ালের চোখের দিকে, আশপাশের মাঠে চরে বেড়ানো গোরুদের চোখের দিকে, অচেনা যেসব মানুষের সঙ্গে দেখা হয় তাদের চোখের দিকে, এমনকী মায়ের সঙ্গে মাছের বাজারে গেলে সে তাকিয়ে

থাকে মার্বেল পাথরে শোয়ানো মরা মাছগুলোর চোখের দিকে।

'তোখ! তোখ! কী তুন্দর!' সে খুশিতে বলে ওঠে। আর বাড়িতে বসে একমনে পুঁতির ব্রেসলেট তৈরি করে চলে।

যতই সে বড় হতে লাগল, তার রাগ এতই বেড়ে চলল যে, বাবা-মা আবার ডাকল সমাজসেবীদের। রেগে উঠলে বার্নার্ডের শক্তি অসম্ভবরকমভাবে বেড়ে যেত। তার শরীর এত পুষ্ট নয়, একটা পা এখনও অকেজো, তবুও রেগে গেলে সে এমন কাণ্ড বাঁধাত যে, তার বাবাও তাকে সামলে রাখতে পারত না। আর ষোলো বছর বয়েসে পৌঁছে তার চেহারাটা ছোটবেলার চেয়ে আরও কদাকার হয়ে উঠল।

কাজে লাগতে পেরে সমাজসেবীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা বলল, 'আমাদের কাছে ও অনেক সুখে থাকবে। ওকে কী করে সামলে রাখতে হয় তা আমরা জানি। তা ছাড়া আমাদের কর্মচারীদের কাজ অন্ত প্রাণ। সেখানে গিয়ে ও ওর মতো আরও বহু ছেলের সঙ্গে থাকতে পারবে।'

মানসিক হাসপাতালে যাওয়ার আগে ক'টা দিন বেশ দুশ্চিন্তায় কাটল। বাবা-মা'র মতলবের কথা শুনে বার্নার্ড প্রথমে সাঙ্ঘাতিক খেপে গেল। পরে যখন সে শান্ত হল, তখন তার মা বুঝিয়ে বলল, তার ভবিষ্যৎ কী উজ্জ্বল! সমাজসেবীদের কথার পুনরাবৃত্তি করে মা বলল, 'সেখানে ঠিক তোর মতো আরও কত ছেলে আছে।'

বাবা বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'ওটা এক ধরনের স্কুল, খোকা। জানিস তো, সব ছেলেমেয়েকেই একদিন স্কুলে যেতে হয়।'

বার্নার্ড চিন্তাকুল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেখানে আমাকে নেকলেস তৈরি করতে দেবে তো?'

'নিশ্চয়ই দেবে।' মা-বাবা দু-জনেই একসঙ্গে বলে উঠল।

'সেখানে ক'জন ছেলে আছে?' বার্নার্ড প্রশ্ন করল।

'যতদূর শুনেছি চৌত্রিশজন।' বেশ চিন্তিতভাবে উত্তর দিল মা।

'ওদের প্রত্যেকের চোখ আছে?' বার্নার্ড জানতে চাইল।

'নিশ্চয়ই আছে, বাবা।' মা-বাবাকে দেখে মনে হল তারা আশ্বস্ত হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হল খবরটা ছেলেকে বেশ সন্তুষ্ট করেছে। পরের দুটো বছর নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল। মানসিক হাসপাতালে বার্নার্ড চালচলনে বেশ সুস্থির ও শান্ত থাকল, এবং তার অনুপস্থিতিতে মা-বাবাও বেশ সুখে দিন কাটাতে লাগল। অবশ্য ঘরছাড়া ছেলের জন্য মাঝে-মাঝে তারা অপরাধবোধের খোঁচা টের পেত।

এদিকে বার্নার্ডের ব্যবহার এত চমৎকার হয়ে উঠল যে, কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, পরীক্ষামূলকভাবে তাকে শনি-রবি, দুটো দিন, বাড়িতে থাকতে দেওয়া যেতে পারে।

বার্নার্ড বাড়ি আসার আগে থেকেই মায়ের বুক ঢিপঢিপ শুরু হয়ে গেল। ফলে তাকে ঘুমের ওষুধ খেতে হল।

বাবা ভয় কাটাতে মদের বোতল খুলে বসল।

বার্নার্ড এল। পরনে নতুন নীল রঙের স্যুট, সবুজ সাটিনের টাই। বিশাল মাথার ওপরে চুল পেতে আঁচড়ানো, আর তোতলামি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

রাতে খাওয়ার সময় সে ট্রাউট মাছ খেতে চাইল। তাকে দেখে মনে হল, বাড়িতে ফিরতে পেরে, মা-বাবাকে কাছে পেয়ে, সে যেন ভীষণ খুশি হয়েছে। খাওয়ার আগে তাকে নিয়ে যাওয়া হল ওপরে, তার ঘরে। সেখানে সে পুরোনো পুঁতির মালাগুলো খুঁজে পেল। খাওয়ার সময় সেগুলো তার গলায় বিচিত্রভাবে ঝুলতে লাগল। মাকে সে একটাও নেকলেস দিল না।

খাওয়ার সময় সে একেবারে চুপচাপ রইল, এবং তার বাবা-মাকে অবাক করে দিয়ে সাততাড়াতাড়ি শুতে চলে গেল নিজের ঘরে।

মানসিক দিক থেকে ক্লান্ত বাবা-মাও একই পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

মাঝরাতের কিছু পরে বার্নার্ড চুপিসাড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। তারপর রওনা হল বাগান করার যন্ত্রপাতি রাখার ঘরের দিকে। সেখান থেকে একটা ছোট কুড়ুল নিয়ে এসে মাকে এবং বাবাকে সে কুপিয়ে শেষ করল। তারপর পাশের বাড়িতে গিয়ে পড়শি, তার স্ত্রী ও তাদের বেড়ালটারও একই গতি করল।

যখন পুলিশ এল, তখন সে বসবার ঘরের মেঝেতে শান্তভাবে বসে আছে। মানসিক হাসপাতালের মেট্রনের জন্য একটা নেকলেস গেঁথে চলেছে সে। নেকলেসের পুঁতির মধ্যে রয়েছে—আটটা মানুষের চোখ, ছ'টা ট্রাউট মাছের চোখ, দুটো বেড়ালের চোখ, আর বাকি সব সত্যিকারের রঙিন পুঁতি।

➤ *নেকলেস*

pathagar.net

অন্ধকার গভীর

ডব্লিউ. ডব্লিউ. জ্যাকব্‌স

pathagar.net

এক প্রাচীন গ্রাম্য বাড়িতে বিলিয়ার্ড-ঘরে দাঁড়িয়ে দুজন পুরুষ কথা বলছিল। এতক্ষণ ওরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও খেলায় মগ্ন ছিল, এখন খেলা শেষ করে বসল গিয়ে খোলা জানলার কাছে। নীচে এক বিশাল পার্ক। সেদিকে চোখ রেখে অলস কথোপকথন শুরু হল দুজনের।

'তোমার তো সময় হয়ে এল, জেম,' কিছুক্ষণ নীরবতার পর একজন বলল, 'এবার ছ' সপ্তাহ ধরে হাই তুলে তোমার হানিমুন কাটাবে আর অভিশাপ দেবে সেই লোকটাকে—মানে, সেই মহিলাকে, হানিমুন ব্যাপারটা যে আবিষ্কার করেছিল।'

জেম বেনসন তার লম্বা হাত-পা চেয়ারে ছড়িয়ে বসল। তারপর প্রতিবাদের এক অদ্ভুত গম্ভীর শব্দ করল।

'জিনিসটা কখনও আমার মাথায় ঢুকল না।' হাই তুলে বলে চলল উইলফ্রেড কার, 'অবশ্য, এ আমার না বোঝারই কথা; নিজের চাহিদা মেটানোর পয়সা কখনও আমার ছিল না, দুজনের তো দূরের কথা। তবে আমি যদি তোমার মতন বড়লোক হতাম, বা লিডিয়ার রাজা ক্রিসাসের মতো, তা হলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য চোখে দেখতে পারতাম।'

এই মন্তব্যের শেষ অংশে এমন ইঙ্গিত ছিল যে, তার তুতোভাই জেম বেনসন উত্তর দেওয়ার কোনও চেষ্টা করল না। বরং জানলা দিয়ে নির্নিমেষ তাকিয়ে শান্তভাবে ধূমপান করে চলল।

'তোমার কিংবা ক্রিসাসের মতো বড়লোক আমি নই,' অর্ধনিমীলিত চোখের

কোণ দিয়ে বেনসনের দিকে জরিপ-নজরে তাকিয়ে মিস্টার কার আবার বলতে শুরু করল, 'সময়ের স্রোতে আমি আমার নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে যাই, কখনও-কখনও বন্ধুবান্ধবের দরজায় নোঙর ফেলি, তাদের ঘরে গিয়ে নৈশভোজে ভাগ বসাই।'

'ভেনিসবাসীদের মতো,' জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রেখেই জেম বেনসন বলল, 'তোমার পক্ষে এ নেহাত খারাপ নয়, উইলফ্রেড। তোমার নোঙর ফেলার দরজা আছে—আর আছে বন্ধুবান্ধব।'

এবার মিস্টার কার-এর গম্ভীর শব্দ করার পালা। ধীর স্বরে সে বলল, 'সত্যি বলছি, জেম, তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি, মহাভাগ্যবান ব্যক্তি। যদি পৃথিবীতে অলিভ-এর চেয়ে ভালো কোনও মেয়ে থাকে, তা হলে তাকে একটিবার আমি দেখতে চাই।'

'হুঁ।' অপরজন শান্ত স্বরে বলল।

'মেয়েটির তুলনা নেই,' কার বলে চলল, চোখ এখনও তার জানলার দিকে, বাইরে : 'এত ভালো, এত ভদ্র। ওর ধারণা তুমি বুঝি নীতি-ধর্মের গুরুমশাই!' কথাটা বলে প্রাণখোলা আনন্দের হাসি হাসল সে, কিন্তু অন্যজন এ-হাসিতে যোগ দিল না।

'ওর ন্যায়-অন্যায় বোধটা খুব চড়া,' আনমনাভাবে বলে চলল কার, 'জানো, ও যদি একবার টের পায় যে, আসলে তুমি একটি—।'

'আসলে কী?' ভয়ানকভাবে মুখিয়ে উঠল বেনসন, জানতে চাইল, 'বলো, আসলে আমি একটি কী?'

'লোকে তোমাকে যা জানে, আসলে তুমি তা নও,' বর্ণচোরা হাসিতে মুখ ভরিয়ে উত্তর দিল উইলফ্রেড কার, 'আর এ-কথা টের পেলে, আমার ধারণা, অলিভ তোমাকে ছুড়ে ফেলে দেবে।'

'অন্য কোনও আলোচনা করো।' ধীর স্বরে বেনসন বলল, 'তোমার রসিকতা সবসময় আমার ভালো লাগে না।'

উইলফ্রেড কার উঠে দাঁড়াল, র‍্যাক থেকে একটা বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল, নিজের প্রিয় দু-একটা মার রেওয়াজ করতে লাগল।

'এই মুহূর্তে অন্য আর একটাই আলোচনা আমি করতে পারি—সেটা হল আমার আর্থিক অবস্থা।' বিলিয়ার্ড টেবিলের অন্য প্রান্তে যেতে-যেতে ধীর স্বরে সে বলল।

'অন্য কোনও আলোচনা থাকলে করো,' সরাসরিভাবে আবার বলল বেনসন।

'এই দুটো বিষয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে,' বলল কার। বিলিয়ার্ড-লাঠিটা রেখে দিয়ে টেবিলের ওপর আধ-বসা ভঙ্গিতে থিতু হল, জরিপ করতে লাগল তার তুতোভাইকে।

এক সুদীর্ঘ নীরবতা। চুরুটের শেষ প্রান্তটুকু জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল বেনসন, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

'আমার কথা কোন পথে এগোচ্ছে ধরতে পেরেছ?' অবশেষে কার বলল।

pathagar.net

বেনসন চোখ খুলে তাকাল, জানলার দিকে ইশারা করে মাথা নাড়ল : 'তুমি কি আমার চুরুটের পথে যেতে চাও?' সে জানতে চাইল।

'তোমার কথা চিন্তা করেই আমি স্বাভাবিক পথে যেতে চাই,' নির্লজ্জভাবে পালটা উত্তর দিল অন্যজন, 'আমি জানলা দিয়ে বিদায় নিলে হাজারো প্রশ্ন উঠবে, আর তুমি তো জানো আমার একটু বাচাল স্বভাব আছে—জিভ-পাতলা মানুষ।'

নিজেকে অনেক চেষ্টায় সংযত রেখে বেনসন উত্তর দিল, 'আমার ব্যাপারে তুমি কথা না বললেই হল—তুমি বকবক করে গলা ভেঙে ফেললেও আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'আমি খুব বিপদে পড়েছি,' কার ধীরে-ধীরে বলল, 'ভীষণ বিপদে পড়েছি। আগামী দু-সপ্তাহের মধ্যে যদি পনেরোশো পাউন্ড জোগাড় করতে না পারি, তা হলে আমাকে হয়তো পথে দাঁড়াতে হবে।'

'সে তোমার কাছে আর নতুন কী?' প্রশ্ন করল বেনসন।

'পথে দাঁড়ানোরও রকমফের আছে,' উত্তর দিল অপরজন, 'তা ছাড়া এবারে বাড়ির ঠিকানাটাও জুতসই হবে না। সত্যি বলছি জেম, তোমার কাছে পনেরোশো হবে?'

'না,' জেন বেনসন সহজ সুরে বলল।

কারের মুখ ফ্যাকাসে হল। ভারি গলায় বলল সে, 'আমাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বলছি—।'

'তোমাকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে আমি ক্লান্ত,' কারের দিকে ফিরে তাকে খুঁটিয়ে মেপে নিল বেনসন, বলল, 'আর বাঁচিয়েই বা লাভ কী! যদি বিপদে পড়ে থাকো তা হলে নিজেই সে-বিপদ কাটিয়ে ওঠো। তোমার অটোগ্রাফ বিলিয়ে বেড়ানোর বাতিকটা এবার একটু কমাও।'

'ওটা বোকামি—মানছি,' কার মাপা স্বরে বলল, 'ওরকম আর করব না। ও, ভালো কথা—আমার কাছে কিছু অটোগ্রাফ বিক্রি আছে, নেবে? মুখ কোঁচকানোর দরকার নেই—ওগুলো আমার অটোগ্রাফ নয়।'

'তা হলে কার?' অপরজন প্রশ্ন করল।

'তোমার!'

বেনসন চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল ওর কাছে।

'এসবের মানে কী?' সে শান্তস্বরে জিগ্যেস করল, 'ব্ল্যাকমেল?'

'সে তুমি যে-নামে খুশি ডাকো,' কার বলল, 'আমার কাছে কিছু চিঠি বিক্রি আছে, দাম পনেরোশো পাউন্ড। আর আমি এমন একজন লোককে জানি, যে শুধু তোমার কাছ থেকে অলিভকে পাওয়ার জন্যে ওই চিঠিগুলো পনেরোশো দিয়ে কিনতে রাজি আছে। তা আমি তোমাকেই প্রথম কেনার সুযোগটা দিচ্ছি।'

'যদি তোমার কাছে আমার সই করা কোনও চিঠিপত্র থেকে থাকে তা হলে

pathagar.net

ভালোয়-ভালোয় সেগুলো আমাকে দিয়ে দেওয়া উচিত,' খুব আস্তে-আস্তে বলল বেনসন।

'চিঠিগুলো আমার,' হালকা সুরে কার বলল, 'যাকে তুমি লিখেছিল সেই মেয়েটি আমাকে দিয়েছে। এ-কথা হলফ করে বলতে পারি যে, সবক'টা চিঠিই ভদ্রলোকের মতো লেখা নয়।'

হঠাৎই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেনসন, কোটের কলার ধরে টেবিলের ওপরে ধরাশয়ী করল কারকে, চেপে ধরে রাখল।

'চিঠিগুলো ফেরত দাও,' বড়-বড় শ্বাস ফেলে বলল সে। তার মুখ ভাইয়ের মুখের কাছাকাছি।

'ওগুলো আমার সঙ্গে নেই,' ধস্তাধস্তি করতে-করতে কার বলল, 'আমি বোকা নই। এখুনি আমাকে ছেড়ে দাও, নইলে দাম আরও বেড়ে যাবে।'

বেনসন শক্ত সমর্থ হাতে কারকে টেবিল থেকে তুলল, হয়তো টেবিলে ওর মাথা ঠুকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু হঠাৎই একজন হতবাক পরিচারিকা চিঠিপত্র হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বেনসনের হাতের বাঁধন শিথিল হল। কার ঝটিতি উঠে বসল।

'ঠিক এইভাবে করে, বুঝলে,' পরিচারিকাটিকে শুনিয়ে উইলফ্রেড কারকে লক্ষ করে বেনসেন বলল, তারপর চিঠিগুলো নিল মেয়েটির হাত থেকে।

'তা হলে এর জন্যে লোকটাকে যদি পনেরোশো পাউন্ড গুনে-গুনে দিতে হয়, তাতে আমি অবাক হব না।' শান্ত স্বরে কার বলল।

মেয়েটি ঘর ছেড়ে চলে যেতেই ইঙ্গিতবহ সুরে বেনসন বলল, 'তা হলে তুমি চিঠিগুলো আমাকে দেবে না?'

'নিশ্চয়ই দেব, তবে যে-দাম বলেছি সেই দামে,' কার বলল, 'কিন্তু মনে রেখো, যদি তোমার ওই নোংরা হাত দ্বিতীয়বার আমার গায়ে ওঠে তা হলে চিঠির দাম দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যাক, এখন আমি চললাম। তোমাকে ব্যাপারটা ভাবার জন্যে কিছু সময় দিয়ে গেলাম।'

বাক্স থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে ধরাল সে, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার তুতোভাই জেম বেনসন দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর জানলার দিকে ঘুরে থমথমে রাগে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল।

পার্কের দিক থেকে বয়ে আসা বাতাস সতেজ ও মিষ্টি, সঙ্গে রয়েছে সদ্য ছাঁটা ঘাসের গাঢ় গন্ধ। এখন তাতে গিয়ে মিশেছে চুরুটের সুবাস। একটু পরেই বাইরে তাকিয়ে সে তার ভাইকে দেখতে পেল। ধীরে-ধীরে পা ফেলে চলে যাচ্ছে। উঠে দরজার কাছে গেল বেনসন, তারপর কী ভেবে ফিরে এল জানলার কাছে, লক্ষ করতে লাগল তার ভাইয়ের অপস্রিয়মাণ শরীরটা; চাঁদের আলোয় ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। এবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বেনসন। ঘরটা বহুক্ষণ খালি পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেকে শুভরাত্রি জানাতে মিসেস বেনসন যখন ঘরে এসে

ঢুকলেন তখনও ঘরটা খালিই ছিল। টেবিলটা ঘুরে ধীর পায়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন জানলার কাছে, থমকে দাঁড়িয়ে অলস চিন্তায় তাকিয়ে রইলেন বাইরে। একসময় তিনি দেখতে পেলেন দ্রুত পা ফেলে তাঁর ছেলে বাড়ির দিকে ফিরে আসছে। সে জানলার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

'শুভরাত্রি,' গম্ভীর স্বরে বেনসন বলল।

'উইলফ্রেড কোথায়?'

'ও চলে গেছে—' বেনসন বলল।

'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল...ও আবার টাকা চাইছিল, আর আমিও খোলাখুলি বলে দিয়েছি। মনে হয় না ও আর এখানে আসবে।'

'বেচারা উইলফ্রেড!' মিসেস বেনসন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঃ 'সবসময় ও একটা না একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। তুই ওকে আজেবাজে কথা কিছু বলিসনি তো?'

'যতখানি বলা উচিত তার বেশি বলিনি,' কঠোর স্বরে তাঁর ছেলে উত্তর দিল। তারপর বলল 'শুভরাত্রি।'

২

কুয়োটা পুরোনো পার্কের এক কোণে দাঁড়িয়ে। বহু বছর অব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খল ঘন আগাছার ঝোপে ওটা প্রায় চোখের আড়ালে চলে গেছে। একটা ভাঙা ঢাকনায় কুয়োর মুখ অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে। তার ঠিক ওপরেই একটা মরচে ধরা পুরোনো কপিকল। জোরালো বাতাসে এলোমেলো পাইন গাছের সমবেত সঙ্গীতের তালে-তালে কপিকলটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তোলে। সূর্যের সরাসরি আলো কখনও কুয়ো পর্যন্ত পৌঁছয় না, ফলে তার আশেপাশের মাটি ভিজে স্যাঁতসেঁতে এবং ঘাসের রং সবুজ। অথচ পার্কের বাকি অংশটা ঝাঁ-ঝাঁ গরমে হাহাশ্বাস তুলছে।

গ্রীষ্মের নিঝুম সুগন্ধী সন্ধ্যায় দুজন মানুষ পার্কে পায়চারি করছিল। হাঁটতে-হাঁটতে তারা এগিয়ে চলল কুয়োটার দিকে।

'এই জঙ্গলে ঢোকার কোনও মানে হয় না, অলিভ,' পাইন গাছের সীমানার কাছে দাঁড়িয়ে অন্তবর্তী বিষণ্ণতার দিকে অস্বস্তিভরে অনিমেষ তাকিয়ে জেম বেনসন বলল।

'এটা পার্কের সবচেয়ে সেরা জায়গা,' সপ্রাণ সুরে বলল মেয়েটি, 'জানো, এ-জায়গাটা আমার দারুণ লাগে।'

'জানি, কুয়োর পাড়ে বসে থাকতে তোমার আরও ভালো লাগে,' বেনসন ধীরে-ধীরে বলল, 'কিন্তু আমার সেটা পছন্দ নয়। কোনওদিন বেশি ঝুঁকে পড়লে তুমি পড়ে যাবে।'

'আর সত্যের মুখোমুখি হব,' অলিভ হালকা সুরে বলল, 'এসো—।'

pathagar.net

ও ছুটে হারিয়ে গেল পাইনের ছায়ার ঘেরাটোপে। আগাছার ডালপালা শব্দ করে ভাঙতে লাগল ওর ছুটন্ত পায়ের নীচে। বেনসন ধীর পায়ে ওকে অনুসরণ করল। আবছায়া পরিসীমা পার হয়েই সে দেখতে পেল অলিভকে। কুয়োর কিনারায় চমৎকার ভঙ্গিতে বসে আছে ও। পা দুটো লুকিয়ে আছে কুয়ো ঘিরে থাকা ঘাস ও আগাছার ঘন বিন্যাসের গভীরে। ও ইশারায় বেনসনকে ওর পাশে বসে থাকতে বলল, এবং একটা বলিষ্ঠ হাতের বাঁধনে ওর কোমর ধরা পড়তেই অনুচ্চ গলায় হাসল।

'জায়গাটা আমার দারুণ লাগে,' দীর্ঘ নীরবতাকে ছুটি দিয়ে ও বলল, 'কী অন্ধকার—ছমছমে। জানো, জেম, এখানে একা বসে থাকতে আমার সাহসই হবে না। মনে হবে, সব ঝোপ আর গাছের পেছনে কত কী ভয়ঙ্কর জিনিস লুকি রয়েছে। এখুনি হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। ও বাবা!'

'তার চেয়ে বরং চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি,' নরম গলায় বলল বেনসন, 'এই কুয়ো-এলাকাটা সবসময় খুব স্বাস্থ্যকর নয়, বিশেষত গরমের সময়। চলো, চলে যাই!'

মেয়েটি অবাধ্য ঝাঁকুনিতে প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের জায়গায় আরও ভালো করে বসল।

'তুমি শান্তিতে তোমার চুরুট খাও।' ও শান্ত স্বরে বলল, 'এখানে বসে নির্জনে কথা বলতে আমার বেশ ভালো লাগছে। উইলফ্রেড-এর কোনও খবর পেয়েছ?'

'উহুঁ, কোনও খবর নেই।'

'বড় অদ্ভুতভাবে উধাও হয়ে গেল, তাই না?' ও বলে চলল, 'মনে হয়, আবার নতুন কোনও বিপদ, তারপর তোমার নামে আবার সেই গদগদ ভাষায় চিঠি পাঠাবে ঃ "প্রিয় জেম, আমাকে এবারের মতো বাঁচাও।" '

জেম বেনসন একরাশ সুগন্ধী ধোঁয়ার মেঘ উড়িয়ে দিল বাতাসে, চুরুটটা দাঁতের ফাঁকে চেপে কোটের হাতা থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলল মাটিতে।

'তুমি না থাকলে ওর যে কী হাল হত কে জানে,' বেনসনের হাতে অনুরাগী চাপ দিয়ে অলিভ বলল, 'অনেক আগেই হয়তো তলিয়ে যেত। আমাদের বিয়ের পর, জেম, নতুন সম্পর্কের সুবাদে আমি ওকে কিছুটা জ্ঞান দেব। ও একটু ছন্নছাড়া, কিন্তু কয়েকটা ভালো গুণও আছে বেচারার।'

'দুর্ভাগ্যবশত সেই চমৎকার গুণগুলো আমার ঠিক নজরে আসেনি।' অস্বাভাবিক তিক্ততায় বলল বেনসন।

'ও আর কারও শত্রু নয়, নিজেরই শত্রু।' বেনসনের এই আকস্মিক বিস্ফোরণে চমকে উঠে বলল অলিভ।

'তুমি ওর সম্পর্কে কতটুকু জানো?' সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল অপরজন, 'ব্ল্যাকমেল করতে ওর বাধত না; নিজের সামান্য লাভের জন্যে বন্ধুর জীবন ধ্বংস করতে পর্যন্ত ওর বিবেকে আটকায়নি। একটা লোফার, ইতর, মিথ্যেবাদী!'

pathagar.net

গম্ভীর অথচ শান্ত দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকাল তার দিকে। কোনও কথা না বলে তার একটা হাত টেনে নিল কাছে, তারপর ওরা নিশ্চুপে বসে রইল।

এদিকে সন্ধ্যা গভীর হয়ে নীল হয়ে যায় রাতে। গাছের শাখা-প্রশাখায় পরিস্রুত চাঁদের পর্যাপ্ত আলো ওদের ঘিরে ফেলে রুপোলি তন্তুজালে। অলিভের মাথা তখন বেনসনের কাঁধে। হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ও লাফিয়ে উঠল।

'কী হল?' রুদ্ধশ্বাসে আর্তনাদ করে উঠল অলিভ।

'কীসের কথা বলছ?' জানতে চাইল বেনসন, লাফিয়ে উঠে ওর হাত চেপে ধরল সুদৃঢ় মুঠিতে।

'হঠাৎই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম,' বেনসনের কাঁধে, হাত রাখল ও ঃ. 'মনে হল, এইমাত্র যে-কথাগুলো বললাম, সেগুলোই আমার কানে বাজছে। আমি স্পষ্ট শুনলাম কেউ যেন আমাদের ঠিক পেছনে এসে ফিসফিস করে বলল, জেম, আমাকে এবারের মতো বাঁচাও।'

'কল্পনা,' বলল বেনসন, কিন্তু তার গলা কেঁপে গেল, 'আসলে তুমি এই অন্ধকারে গাছের ছায়ায় ভয় পেয়েছ। চলো, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না, ভয় আমি পাইনি,' বলল মেয়েটি, আবার বসল নিজের জায়গায় ঃ 'তুমি সঙ্গে থাকলে আমি কাউকে ভয় পাই না, জেম। কেন যে বোকার মতো চেঁচিয়ে উঠলাম!'

বেনসন কোনও উত্তর না দিয়ে কুয়োর কাছ থেকে গজদুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রইল, যেন এক বলিষ্ঠ ছায়ামূর্তি অলিভের জন্য অপেক্ষা করছে।

'আসুন, মশাই—বসুন,' ইট বাঁধানো কুয়োর ছোট্ট সাদা হাত বুলিয়ে বেনসনকে ডাকল অলিভ ঃ 'নইলে লোকে ভাববে, আপনার সঙ্গিনীকে আপনার পছন্দ হচ্ছে না।'

অলিভের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধীরে-ধীরে ওর পাশে গিয়ে বসল সে। চুরুট টানতে লাগল। চুরুটের টান এত গভীর হল যে, প্রতি টানে চুরুটের আগুনে তার মুখ আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল। দৃঢ় কঠিন ইস্পাতসুলভ একটা হাত সে বাড়িয়ে দিল অলিভের পিছন দিয়ে। অবশেষে থামল এসে ইট বাঁধানো পাঁচিলের ওপর।

'তোমার শীত করছে না তো?' ও একটু নড়ে উঠতেই নরম গলায় জানতে চাইল জেম বেনসন।

'না,' অলিভ কেঁপে উঠল, 'বছরের এ-সময়টা তো শীত থাকার কথা নয়, তবে কুয়োর ভেতর থেকে কেমন একটা ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে বাতাস উঠে আসছে।'

ওর কথা শেষ হতে-না-হতেই কুয়োর গভীর থেকে একটা জলের ছলকানির শব্দ ভেসে এল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে চাপা আতঙ্কিত চিৎকার করে কুয়োর পাড় থেকে দ্বিতীয়বার লাফিয়ে উঠল অলিভ।

'কী হল আবার?' ভয়ার্ত সুরে জিগ্যেস করল বেনসন। ওর পাশে দাঁড়িয়ে

pathagar.net

উঁকি মারল কুয়োর মধ্যে, যেন অলিভের ভয়ের কারণটা এখুনি উঠে আসবে কুয়ো থেকে।

'ওঃ, আমার ব্রেসলেট!' দুঃখে কেঁদে ফেলল অলিভ : 'আমার মায়ের দেওয়া! ওটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে।'

'তোমার ব্রেসলেট! যান্ত্রিকভাবে পুনরাবৃত্তি করল বেনসন, 'তোমার ব্রেসলেট! কোনটা, হীরেরটা?'

'যেটা আমার মায়ের ছিল,' অলিভ বলল, 'ওটা সহজেই তোলা যাবে, কী বলো? আগে যে করে হোক কুয়োর জলটা আমাদের বের করে দিতে হবে।'

'তোমার ব্রেসলেট!' বোকার মতো আবার বলল বেনসন।

'জেম, কী হয়েছে তোমার?' ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল অলিভ।

কারণ, যে-মানুষটাকে ও ভালোবাসে, সে এখন নিঃসীম আতঙ্কে জরিপ করছে অলিভকে। তার বিকৃত মুখের ফ্যাকাসে পাণ্ডুর রঙের জন্য চাঁদের আলোই একমাত্র দায়ী নয়। ভয়ে কুঁকড়ে কুয়োর কিনারার দিকে সরে গেল অলিভ। ওর আতঙ্ক বেনসনের চোখ এড়াল না। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে স্বাভাবিক করে ওর হাত ধরল সে। চাপা স্বরে বিড়বিড় করে বলল, 'আমার ছোট্ট খুকু সোনা! আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ তো! যখন তুমি চিৎকার করে উঠলে তখন আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই হঠাৎই ভেবেছি, তুমি বোধহয় আমার কাছ থেকে পড়ে যাচ্ছ কুয়োর ভেতরে—নীচে—অনেক নীচে—।'

বেনসনের কথা মাঝপথে থেমে গেল, আর উদভ্রান্ত অসহায় মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে, তাকে আঁকড়ে ধরে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল।

'এই, কী হচ্ছে! কেঁদো না, লক্ষ্মীটি, কেঁদো না—' আদরের সুরে বলল বেনসন।

'কাল সকালে আমরা কাঁটা-বঁড়শি-দড়ি নিয়ে এখানে আসব, তারপর মাছ ধরার মতো খুঁজে তুলে আনব ব্রেসলেটটা। একটা নতুন খেলা হবে, না?' অর্ধেক হাসি অর্ধেক কান্না মেশানো গলায় বলল অলিভ।

'না, ওটা অন্যভাবে তুলতে হবে,' বেনসন বলল, 'তবে দেখো, কাল সকালের মধ্যেই জিনিসটা তুমি ফেরত পাবে। কিন্তু কথা দাও, তার আগে ব্রেসলেটটা যে হারিয়েছে সে-কথা কাউকে তুমি বলবে না? কথা দাও।'

অবাক হয়ে অলিভ বলল, 'কথা দিলাম। কিন্তু কেন?'

'প্রথমত, জিনিসটা অনেক দামি, আর তা ছাড়া—তা ছাড়া—অন্য আরও কারণ আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, জিনিসটা তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া তো আমারই কর্তব্য।'

'কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে আনবে নাকি?' দুষ্টুমি করে ও জানতে চাইল। তারপর হঠাৎই বলল, 'শোনো।'

ঝুঁকে পড়ে একটা পাথর তুলে নিয়ে সেটা কুয়োর ভেতরে ফেলল ও।

pathagar.net

তারপর গভীর জমাট অন্ধকারের দিকে উঁকি মেরে বলল, 'পাথরটা যেখানে গেল সে-জায়গাটা কেমন কে জানে। ইঁদুর যেমন জলভরা গামলায় খালি ঘুরে-ঘুরে সাঁতারে বেড়ায়, পেছল গা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে, অনেকটা সেরকম। জল খেয়ে-খেয়ে পেট ভরে যাবে, আর ওপরে তাকালে দেখা যাবে শুধু এক টুকরো আকাশ।'

'চলো, বাড়ি চলো,' শান্ত গলায় বেনসন বলল, 'তোমার মাথায় যতসব আজেবাজে বীভৎস খেয়াল চাপছে।'

মেয়েটি ফিরে তাকিয়ে বেনসনের হাত ধরল। আলগা পায়ে দুজনে রওনা হল বাড়ির দিকে।

মিসেস বেনসন বাইরের উঠোনে বসেছিলেন, ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। অনুযোগের সুরে ছেলেকে বললেন, 'ওকে এতক্ষণ বাইরে রেখেছিস কী করতে? কোথায় ছিলি তোরা?'

'কুয়োর পাড়ে গেছিলাম,' হেসে বলল অলিভ, 'আমাদের ভবিষ্যৎ আলোচনা করছিলাম।'

'জায়গাটা মোটেই ভালো নয়,' জোরের সঙ্গে বললেন মিসেস বেনসন, 'আমার মনে হয়, কুয়োটা ভরাট করে ফেলা উচিত, জেম।'

'ঠিক আছে,' ধীরে-ধীরে সে বলল, 'অনেক আগে যে কেন করা হয়নি কে জানে।'

তার মা অলিভকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই খালি চেয়ারটায় বসল বেনসন, দু-হাত দুপাশে অলসভাবে এলিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হল। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে পড়ল, রওনা হল দোতলার একটা বিশেষ ঘরের দিকে। ঘরটায় খেলাধুলোর নানান সাজ-সরঞ্জাম থাকে। সেখান থেকে সমুদ্রে মাছ ধরার একটা দড়ি ও কয়েকটা বঁড়শি নিয়ে সে চুপিসাড়ে আবার নেমে এল নীচে। পার্ক পেরিয়ে হালকা পায়ে রওনা হল কুয়োটার দিকে।

গাছের ছায়াঘন সীমানায় ঢুকবার আগে পিছন ফিরে একবার সে তাকাল বাড়ির আলোকিত জানলাগুলোর দিকে। তারপর দড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে এগোল। কুয়োর পাড়ে বসে সেটা ধীরে-ধীরে নামিয়ে দিল ভেতরে।

ঠোঁট টিপে বসে রইল বেনসন। শুধু কখনও-কখনও চমকে উঠে তাকাতে লাগল চারপাশে, যেন এখুনি কাউকে দেখতে পাবে—এমন কাউকে, যে গাছের সারির আড়াল থেকে উঁকি মেরে তার দিকে লক্ষ রাখছে। বারবার যে দড়ি ফেলে চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে, সে শুনতে পেল কুয়োর ভেতরের দেওয়ালে কিছু একটা ধাক্কা খাওয়ার ছোট্ট ধাতব শব্দ।

বেনসনের শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ হল। ভয় ও ত্রাস ভুলে গিয়ে সে এক ইঞ্চি-এক ইঞ্চি করে দড়িটাকে টেনে তুলতে লাগল, যাতে বঁড়শিতে গাঁথা জিনিসটা খুলে পড়ে না যায়। তার নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হল, চোখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল। দড়ি ক্রমে ছোট

pathagar.net

হয়ে আসতেই সে বঁড়শিতে গাঁথা জিনিসটা অস্পষ্ট দেখতে পেল, এবং অবিচলিত হাতে বাকি দড়িটুকু টেনে তুলল। দেখল, ব্রেসলেটের বদলে একগোছা চাবি বঁড়শিতে গেঁথেছে।

অস্ফুট চিৎকার করে বঁড়শিতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চাবির গোছাটা সে আবার জলে ফেলে দিল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙতে কোনও শব্দ সাহসী হল না। কিছুক্ষণ পায়চারি করে, হাত-পা ছড়িয়ে, আবার কুয়োর কাছে ফিরে এসে সে তার কাজ শুরু করল।

আরও একঘণ্টা কি তারও বেশি সে দড়ি নিয়ে বৃথাই চেষ্টা করল। আগ্রহের তেজে ভয়ডর সে ভুলেই গেল, এবং কুয়োর ভেতরে চোখ নামিয়ে ধীরে অথচ সতর্কভাবে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। দু-দুবার বঁড়শিটা কীসে যেন গাঁথল। সেটা অতিকষ্টে ছাড়াল সে। আবার তৃতীয়বার বঁড়শি বিঁধল। শত চেষ্টা করেও এবার সে আর ছাড়াতে পারল না। তখন দড়িটাকে কুয়োর ভেতরে ফেলে দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে ফিরে এল বাড়িতে।

প্রথমে সে গেল বাড়ির পিছন দিকের আস্তাবলে। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। অবশেষে জামাকাপড় না ছেড়েই বিছানায় গা-এলিয়ে দিল। তলিয়ে গেল অস্বস্তি ভরা ঘুমে।

pathagar.net

৩

আর-কেউ জেগে ওঠার আগেই সে ঘুম থেকে উঠল। চুপিসাড়ে নেমে এল নীচে। প্রতিটি ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঠিকরে পড়েছে, অন্ধকার ঘরগুলোকে চিরে ফেলেছে জ্বলন্ত রেখায়। ধীরে নিঃশব্দে হলঘরের দরজা খুলে সুরভিত বাতাসে বেরিয়ে এল বেনসন। ভিজে ঘাস ও গাছের পাতায় সূর্যের আলো ঝিলিক মারছে। ক্রমে মিলিয়ে আসা এক সাদা কুয়াশা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো মাঠের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। এক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে রইল, ভোরের মিষ্টি বাতাসে গভীর শ্বাস নিল, তারপর ধীর পায়ে রওনা হল আস্তাবলের দিকে।

মরচে ধরা পাম্পের হাতলের ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ এবং লাল টালি বাঁধানো উঠোনে ছড়িয়ে থাকা জলের দাগ জানিয়ে দেয় আরও একজনের ঘুম ভেঙেছে। মাত্র কয়েক পা এগোতেই বেনসনের নজরে পড়ল শক্তিশালী চেহারার বালি রং চুল একটি লোক পাম্পের কাছে বসে প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে।

'সবকিছু তৈরি, জর্জ? সে শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, বাবু,' হঠাৎই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ছুঁইয়ে লোকটি বলল, 'বব ভেতরে সব ব্যবস্থা শেষ করে এনেছে। নাইবার পক্ষে চমৎকার সকাল। ও-কুয়োর জল নিশ্চয়ই বরফের মতো ঠান্ডা হবে।'

'জলদি কাজ শেষ করো,' অধৈর্যভাবে বলল বেনসন।

'ঠিক আছে, বাবু,' বলল জর্জ, পাম্পের ওপরে রাখা একটা খুব ছোট্ট তোয়ালে তুলে নিয়ে জোরে-জোরে মুখে ঘষল : 'ঝটপট শেষ কর, বব?'

তার ডাকে সাড়া দিয়ে আস্তাবলের দরজায় একটা লোক আবির্ভূত হল, কনুইয়ের কাছে জড়ানো একগাছি শক্ত দড়ি ও হাতে বড় ধাতব বাতিদানে বসানো একটা মোমবাতি।

তার বাবুর নজর অনুসরণ করে জর্জ বলল, 'শুধু হাওয়াটা পরখ করার জন্যে, বাবু। অনেক সময় এঁদো কুয়োর হাওয়াতে বিষ থাকে। ওতে এই মোমবাতি যদি জ্বলে তা হলে বুঝতে হবে মানুষের কিছু হবে না।'

বেনসন সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল এবং জর্জ তড়িঘড়ি তার শার্টের কলার তুলে জহরকোটের পকেটে হাত গলিয়ে তাকে অনুসরণ করল। সঙ্গে বব। বেনসন তখন শ্লথ পায়ে এগিয়ে চলেছে কুয়োটার দিকে।

'মাপ করবেন, বাবু,' তার পাশে এসে জর্জ বলল, 'আপনার শরীরটা আজ ভালো ঠেকতেছে না। যদি বলেন তা হলে আমিই নামতে পারি। কুয়োর জলে নাইতে আমার ভালোই লাগবে।'

'না, না,' কর্তৃত্বের সুরে বলল বেনসন।

'আপনি নামতে পারবেন না, বাবু, আপনার শরীরে দেবে না,' জর্জ নাছোড়বান্দা ঃ আপনার এত খারাপ চেহারা আগে দেখিনি। যদি আপনি—।'

'নিজের চরকায় তেল দাও,' বেনসন সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

জর্জ নীরব হল। ওরা তিনজন বড়-বড় ভিজে ঘাসের মধ্যে দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল কুয়োর কাছে। বব দড়িটাকে ছুড়ে ফেলল মাটিতে। তারপর বাবুর কাছ থেকে ইশারা পেয়ে বাতিদানে বসানো মোমবাতিটা তার দিকে এগিয়ে দিল।

'এই যে মোমবাতি নামানোর রশি, বাবু,' পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে বব বলল।

বেনসন তার কাছ থেকে মোমবাতিটি নিয়ে দড়ির সঙ্গে বাঁধল। সেটা কুয়োর পাড়ে বসিয়ে দেশলাই জ্বেলে ধরাল, তারপর ধীরে-ধীরে নামতে শুরু করল নীচে, কুয়োর ভেতরে।

'শক্ত করে ধরেন, বাবু,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল জর্জ, হাত রাখল বেনসনের পাঁজরে, 'একটু-একটু করে না নামালে রশিটাই যাবে পুড়ে—।'

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই দড়িটা পুড়ে গিয়ে মোমবাতিটা ছিটকে পড়ল জলে।

বেনসন চাপা স্বরে দিব্যি কাটল।

'দাঁড়ান, এক্ষুনি আর-একটা নিয়ে আসি,' রওনা হতে উদ্যত হয় জর্জ।

'না, কুয়োর হাওয়া ঠিক আছে,' বেনসন বলল।

pathagar.net

'ঝট করে নিয়ে আসব, বাবু,' যেতে-যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল সে।

'বলি এখানে মালিকটা কে? তুমি না আমি?' কর্কশ গলায় বলল বেনসন।

জর্জ ধীর পায়ে আবার ফিরে এল। বাবুর চোখে একপলক তাকিয়ে তার প্রতিবাদ জিভেই থেমে গেল। সে গম্ভীর মুখে বেনসনের কার্যকলাপ দেখতে লাগল। বেনসন ততক্ষণ কুয়োর পাড়ে বসে গায়ের জামাকাপড় খুলতে শুরু করেছে। জর্জ ও বব দুজনেই অবাক কৌতূহলী চোখে তাকে লক্ষ রাখতে লাগল। প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নীরব মুখমণ্ডলে হিংস্র প্রতিজ্ঞার ছাপ।

'আমি বরং নামি, বাবু,' মনে সাহস জুগিয়ে বাবুকে লক্ষ করে আবার বলল জর্জ, 'আপনার শরীর ঠিক নেই, বোধহয় ঠান্ডা লেগেছে। টাইফয়েড হলেও আশ্চয্যি হওয়ার নয়। শুনলুম, গাঁয়ে নাকি খুব হতেছে।'

একমুহূর্ত তীব্র রাগে ওর দিকে তাকাল বেনসন, তারপর তার দৃষ্টি নরম হল।

'আজ নয়, জর্জ,' শান্ত স্বরে সে বলল। দড়ির ফাঁস দেওয়া প্রান্তটা নিয়ে দু-হাতের তলায় গলিয়ে নিল বেনসন, তারপর কুয়োর পাড়ে বসে একটা পা ঝুলিয়ে দিল ভেতরে।

জর্জ দড়িটা শক্ত করে চেপে ধরল, এবং ববকেও একই কাজ করতে ইশারা করল।

'জল পেলেই আমি চেঁচিয়ে বলব,' বলল বেনসন, 'তখন আরও গজ-তিনেক ঝটপট ছেড়ে দিয়ো যাতে কুয়োর তলায় পৌঁছতে পারি।'

'ঠিক আছে বাবু,' দুজনেই সমস্বরে উত্তর দিল।

বেনসন দ্বিতীয় পা-টাও ঝুলিয়ে দিল ভেতরে, তারপর নিশ্চল হয়ে বসে রইল। মাথা ঝুঁকিয়ে চাকর দুজনের দিকে পিছন ফিরে সে বসে আছে, নজর কুয়োর গভীরে। এত বেশিক্ষণ সে ওভাবে বসে রইল যে, জর্জ অস্বস্তি পেতে লাগল।

'সব ঠিক আছে তো, বাবু? সে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' ধীরে-ধীরে বলল বেনসন, 'জর্জ, দড়িতে টান দেওয়ামাত্রই কিন্তু আমাকে তুলতে শুরু করবে। নাও, এখন দড়ি নামাও।'

ওদের হাত থেকে দড়ি নেমে চলল। একসময় অন্ধকার গহ্বর থেকে এক প্রতিধ্বনিময় চিৎকার ও হালকা ছলাৎ শব্দ ওদের জানিয়ে দিল বেনসন জলে পৌঁছে গেছে। আরও তিন গজ ওরা দড়ি ছাড়ল, তারপর হাতের মুঠো আলগা করে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষায় রইল।

'বাবু নীচে নেমে গেছে,' চাপা গলায় বব বলল।

অপরজন সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল, হাতের তালু দুটো সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে আরও শক্ত হাতে দড়ি চেপে ধরল।

পুরো একমিনিট কেটে গেল। ওরা দুজনে অস্বস্তিভরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর হঠাৎই এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি ও তার পরবর্তী অপেক্ষাকৃত দুর্বল

pathagar.net

ধারাবাহিক ঝাঁকুনিতে দড়িটা ওদের হাত থেকে প্রায় ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল।

'টান! টান!' চিৎকার করে উঠল জর্জ। তারপর কুয়োর গায়ে এক পা চেপে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল।

'রশিটা শিগগির টান! মনে হচ্ছে, বাবু কোথাও ঠেকে গেছে। নড়ছে না। টান!'

ওদের আসুরিক পরিশ্রমে দড়িটা একইঞ্চি-একইঞ্চি করে ধীরে-ধীরে উঠতে লাগল। অবশেষে শোনা গেল জলের ভেতরে এক ভয়ঙ্কর হুটোপাটির শব্দ, এবং তাকে অনুসরণ করে অন্ধকার গহ্বর থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে এল অমানুষিক আতঙ্কের এক হিমেল চিৎকার।

'ওঃ, কী ভারি লাগছে বাবুকে!' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল বব, 'কোথাও আটকে গেছে নাকি! বাবু, চুপচাপ থাকুন। দোহাই, নড়াচড়া করবেন না!'

কারণ টান-টান দড়িটা তখন তার শেষ প্রান্তে ঝুলন্ত ওজনের ধস্তাধস্তিতে ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে।

ওরা দুজনে 'উঃ-আঃ' করে হাঁপাতে-হাঁপাতে একফুট-দু-ফুট করে দড়িটাকে টেনে তুলতে লাগল।

'এই তো হয়ে গেছে বাবু,' আনন্দে চিৎকার করে বলল জর্জ।

ওর একটা পা কুয়োর গায়ে সর্বশক্তিতে গাঁথা, আর দু-হাতে দড়ি টেনে চলেছে অক্লান্তভাবে। দড়ির বোঝা ক্রমে উঠে আসছে ওপরে। অবশেষে সজোরে এক লম্বা টান মারতেই একটা মৃত মানুষের মুখ উঁকি মারল কুয়োর কিনারায়। তার দু-চোখ ও নাকের ফুটো কাদায় বোজা। তার ঠিক পিছনেই তাদের বাবুর অমানুষিক বীভৎস মুখ। কিন্তু এটা জর্জের নজরে পড়ল অনেক দেরিতে, কারণ ততক্ষণে এক বিকট চিৎকার করে দড়ি ছেড়ে দিয়ে সে পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় তার সঙ্গী ছিটকে পড়েছে মাটিতে, দড়ি পিছলে গেছে তার হাতের মুঠো থেকে। সুতরাং পরক্ষণেই শোনা গেল প্রচণ্ড এক 'ঝপাং' শব্দ।

'বোকা কোথাকার!' থতিয়ে বলল বব, অসহায়ভাবে ছুটে গেল কুয়োর কাছে।

'ছোট! ছোট!' জর্জ চিৎকার করে উঠল, 'ছুট্টে আর-একটা রশি নিয়ে আয়!'

কুয়োর ভেতরে ঝুঁকে পড়ে প্রাণান্ত চিৎকারে ডাকতে লাগল সে। তাঁর সঙ্গী তখন পাগলের মতো চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে চলেছে আস্তাবলের দিকে। জর্জের কণ্ঠস্বর নির্মম পৌনঃপুনিকতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল কুয়োর ওপর থেকে নীচে, নীচ থেকে ওপরে। কিন্তু আর সবকিছু তখন একেবারে চুপচাপ।

pathagar.net

১৪ নম্বর ড্রয়ার

ট্যালমেজ পাওয়েল

pathagar.net

আমার চাকরি নিয়ে ঠাট্টা করবেন না, প্লিজ। কলেজ এলাকার ছেলে-ছোকরাদের কাছ থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনেক খোঁচা সহ্য করেছি। শহরের লাশ রাখা ঘরে রাতের কেরানির কাজ যে আমার খুব একটা পছন্দ তা নয়, তবে তার কতগুলো সুবিধেও আছে।

প্রথমত, এ-চাকরিতে দিনের বেলায় কলেজে পড়াশোনা করার সুবিধে রয়েছে, আর রাতে সামান্য নিয়মমাফিক কাজ ও তন্দ্রার ফাঁকে-ফাঁকে বই নিয়ে বসার সময় পাওয়া যায়।

ক্যালকুলাসের কোনও অঙ্ক নিয়ে যখন মাথার মধ্যে তোলপাড় করছি, তখন লেবেল লাগানো নম্বর দেওয়া ড্রয়ারে শুয়ে থাকা বাসিন্দারা আমাকে একটুও বিরক্ত করে না। অন্তত আমি তাই ভাবতাম।

আজ রাতেও আমি এসে রোজকার মতো ওলাফ ডেলিকে ছুটি দিলাম। ওলাফ সবসময় কাজ নিয়ে লেগে থাকে। কাজ নিয়ে লেগে থাকার কারণ ওর বয়েস আর খোঁড়া পা। চাকরি ছেড়ে পালানোর এই মুহূর্তটার জন্যেই যেন প্রতিদিন ও বেঁচে থাকে। সুতরাং বরাবরের মতো এক নিশ্বাসে ঘোঁতঘোঁত করে 'হ্যালো' এবং 'বিদায়' বলল ওলাফ। তারপর খোঁড়া পায়ে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে লাশ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

গভীর নিস্তব্ধতায় ভরা পাশের ঘরে এসে ফ্লাস্ক, ট্রানজিস্টর রেডিয়ো ও কয়েকটা পড়ার বই ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলাম। আমি এখন সম্পূর্ণ একা। রেকর্ডের ভারি

খাতাটা সামনে টেনে নিলাম চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্যে।

রোজকার নাম-ধামগুলো ওলাফ পরিষ্কার টানা হাতের লেখায় লিখে রেখেছে। জলে ডোবা যুবক। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত মহিলা ও পুরুষ। বিছানায় আগুন লাগা সত্ত্বেও জেগে ওঠেনি এমন এক মাতাল। ছুরির লড়াইয়ে হেরে যাওয়া যুবক। নদীতে পাওয়া মহিলার মৃতদেহ।

নাঃ, ওলাফের দিনটা রোজকার মতোই কেটেছে। গত সপ্তা'র বুড়িটার মতো কোনও লাশ আসেনি।

বুড়িটা জঘন্য, নোংরা, আর সেইরকমই নোংরা এক আস্তানায় একা-একা থাকত। এমনিতে ছিল বদ্ধ পাগল, কিন্তু সবসময়েই এক স্বপ্নের দেশে বাস করত। সেখানে সে নোংরা নয়, সকলের করুণার পাত্রী নয়। বরং সে ভাবত, অন্ধকারের শক্তির ওপর তার খবরদারির ক্ষমতা রয়েছে; সে 'এন্ডরের চতুর্থ মায়াবিনী'।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ডিপো ছিল সেই বস্তি অঞ্চলটা। সেখানে বুড়ির প্রতিবেশীরা সত্যি-সত্যিই তাকে ডাইনি ভাবত, তার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। অবশ্য তাকে দেখেও তাই মনে হত; কঙ্কালের মতো মুখ, লম্বা নাকের ডগায় একটা আঁচিল, মুখে একটাও দাঁত না থাকায় থুতনিটা ছুঁচলো ও লম্বা মনে হত, আর ভাঙা দু-গালের ওপরে ঝুলে থাকত নোংরা চুলের গোছা। হাত গুনে, ভবিষ্যৎ বলে, ভালোবাসার মন্ত্রপূত ওষুধ বেচে তার আধপেটা খাবার জুটে যেত। তবে বুড়িটার একটা গুণ ছিল : কারও খারাপ সে করত না—অন্তত তার প্রতিবেশীরা তাই বলত।

কিন্তু একদিন, এক ভ্যাপসা গরমের রাতে, নিজের বাড়ির ছাদে উঠে গেল সেই 'এন্ডরের চতুর্থ মায়াবিনী'। কেউ ঠিক জানে না, সে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, না উড়ে চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সে যাই হোক, ছ'তলা নীচের অ্যাসফাল্টের রাস্তা থেকে তাকে চেঁছে তোলা হয়, নিয়ে আসা হয় এখানে, এবং চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারে জমা দেওয়া হয়। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাক্সে বন্দি হয়ে সে চারদিন ছিল। তারপর দূরের কোনও রাজ্য থেকে তার এক কেতাদুরস্ত ছেলে এসে হাজির হল মৃতদেহ দাবি করতে।

সে চলে যাওয়ার পরেও ওলাফ ডেলি স্বস্তি পায়নি। বুড়ো খালি বলেছে, মাইরি বলছি, চোদ্দো নম্বর ড্রয়ার থেকে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছে—ঠিক যেন গন্ধকের মতো।

আমি কিন্তু কিছু টের পাইনি। যে-বদ গন্ধ আমার নাকে ধরা পড়ে তা হল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির গন্ধ। সেখানে ক্লাসের পড়াশোনার সঙ্গে তাল রাখতে আমাকে রোজ হিমসিম খেতে হয়।

রেকর্ডের খাতা থেকে চোখ সরিয়ে ঘরগুলোর নিয়মমাফিক টহলে বেরোলাম।

পাশের ঘরটা মাপে বেশ বড়, উজ্জ্বল আলোয় আলোময়, ঠান্ডা এবং নিষ্প্রাণ।

pathagar.net

ঘরের মেঝে তকতকে ধূসর টালিতে বাঁধানো, এবং তা থেকে সামান্য অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ নাকে আসছে। ঘরের ও-প্রান্তে বড় দু-পাল্লার দরজা। সেটা পেরোলেই ছোট্ট বারান্দা : মৃতদেহ প্রথম সেখানে এনে রাখা হয়। দরজার কাছেই ছোট-ছোট চাকা লাগানো লম্বা সরু একটা মার্বেল পাথরের টেবিল। সুখের কথা, এই মুহূর্তে সেটা খালি, ঘষে-মেঝে পরিষ্কার করা, এবং অনিবার্য ব্যবহারের জন্যে অপেক্ষা করছে। শীততাপযন্ত্রের চাপা ফিসফিসে গুঞ্জন যেন শোনার চেয়ে অনুভব করা যায় বেশি।

আমার ডানদিকে অতিকায় মৌচাকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি-সারি ড্রয়ারের থাক। এখানেই মৃতদেহগুলো রাখা হয় কেউ দাবি করবে বলে। নয়তো শেষমেশ কোম্পানির খরচায় সেগুলো কবর দেওয়া হয়।

যে যে ড্রয়ারে লাশ আছে, সেগুলোয় জাহাজের টিকিটের মতো কার্ড লাগানো আছে। লাশ রাখার সময়েই সরু তার দিয়ে ড্রয়ারের হাতলের সঙ্গে কার্ড বেঁধে দেওয়া হয়।

নিছক কোনও শব্দ শোনার আশাতেই হালকা সুরে শিস দিতে-দিতে ড্রয়ারের কার্ডগুলো রেকর্ড খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে মনে-মনে মিলিয়ে নিতে লাগলাম আমি।

চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারের কাছে আসতেই একটা গন্ধ নাকে এল। গন্ধ শুঁকতে গিয়ে হাঁচি পেল।

'এই তা হলে ওলাফ ডেলির গন্ধকের গন্ধ।' আপনমনেই বিড়বিড় করে বললাম।

চোদ্দো নম্বর ড্রয়ার পেরিয়ে দু-পা গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। তারপর ধীরে-ধীরে ফিরে তাকালাম।

চোদ্দো নম্বরে কোনও মৃতদেহ আছে বলে রেকর্ড খাতায় ওলাফ কোনও নাম লেখেনি। কিন্তু ড্রয়ারের হাতলে দেখছি কার্ড ঝুলছে।

ড্রয়ারের কাছে এসে ঝুঁকে পড়লাম, হাত বাড়ালাম কার্ডটার দিকে। আমার ঠোঁট থেকে শিসের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে গেল নিস্তব্ধতায়।

অন্যমনস্কভাবেই কার্ডটাকে একবার উলটে দেখলাম; তারপর আবার, আরও একবার—আগের চেয়ে আরও বেশি ক্ষিপ্রতায়।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগলাম। কার্ডের দুপাশটাই সাদা। ওলাফ বুড়ো হতে পারে, কিন্তু এখনও ওর ভীমরতি ধরেনি। ড্রয়ারের কার্ডে নাম লিখতে ভুলে যাওয়াটা তো ওর স্বভাব নয়!

তারপর আপনমনে হেসে উঠলাম। ব্যাটা বুড়ো বোধহয় আমার সঙ্গে মশকরা করতে চাইছে। ওলাফ যে ঠাট্টা-মশকরাও করতে পারে এ-ধারণা আমার আগে ছিল না।

pathagar.net

আমার ঠোঁটে শিসের সুর আবার ফিরে এল। ড্রয়ারের হাতল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। ছোট-ছোট রোলারে ভর করে ড্রয়ারটা সরসর করে খুলে এল। আমার শিসের সুর পালটে গেল এক চাপা চিৎকারে, এবং মাঝপথেই থমকে গেল।

ড্রয়ারের মেয়েটা বয়েসে যুবতী। মাথার চুল সোনালি। যথেষ্ট সুন্দরী—এমনকী মরে যাওয়ার পরেও।

জুতোর ভেতরে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল গুটিয়ে যেতে চাইল। মেয়েটির দিকে অপলকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটার মুখের গড়ন চমৎকার। গায়ের চামড়া বিবর্ণ তামাটে সাটিনের মতো। চোখ দুটো এমনভাবে বোজা ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে; লম্বা-লম্বা চোখের পাতা যেন ঘন ছায়ার রেখা। পরনে সাদা নাইলনের ইউনিফর্ম, কলারে নার্সদের পিন আঁটা। একমাত্র ব্যক্তিগত সাজসজ্জা বলতে একটা সোনার ব্রেসলেট। সরু চেনের সঙ্গে লাগানো একটা ছোট লকেট। লকেটে দুটি আদ্যক্ষর খোদাই করা ঃ জেড. এল.।

স্বর্ণকেশীর থেকে চোখ সরিয়ে চটপট ফিরে এলাম পাশের ঘরে। টেবিলে রাখা রেকর্ডের খাতাটা এক ঝটকায় টেনে নিলাম। বুড়ো ডেলির প্রতি আমি অবিচার করতে চাই না।

রোজকার ভরতির নামের লিস্টে আঙুল বুলিয়ে চললাম। ইতস্তত করলাম। আগের পাতা উলটে গতকালের লিস্টে চোখ বোলালাম। তারপর তার আগের দিন। নাঃ, চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারে কাউকেই ভরতি করা হয়নি।

আবার লাশ-ঘরের দিকে রওনা হলাম। শিস দিতে ঠোঁট ছুঁচল করলাম, তবে শিসের শব্দ বেরোল না। দু-ঘরের মাঝের দরজার ওপর দিকটা কাচের। কাচ ভেদ করে চোখ মেলে দিলাম। দরজা খোলার কোনও প্রয়োজন নেই। চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারটা আমি খোলাই রেখে এসেছি, এবং স্বর্ণকেশী জেড. এল. এখনও সেখানে রয়েছে; এ-সত্য জীবনের মতোই বাস্তব ও মৃত্যুর মতোই অমোঘ।

সন্তর্পণে টেবিলে বসলাম, রুমাল বের করে কপালে বুলিয়ে নিলাম।

একটা গভীর শ্বাস টেনে ফোন তুলে নিলাম। ডায়াল করলাম ওলাফ ডেলির নম্বর। ওর ফোন বাজছে, আমি তখন একটা চোরা চাউনি ছুড়ে দিলাম লাশ-ঘরের দিকে।

ছ'বার কি সাতবার ফোন বাজার পর ওলাফের বউ ঘুম জড়ানো গলায় জবাব দিল। না, ওলাফের পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। সে এখনও বাড়ি ফেরেনি।

তারপর হঠাৎই ও একটু নরম সুরে বলে উঠল, এক মিনিট ধরুন। মনে হয় ও ফিরে এসেছে।

গলাখাঁকারি দিয়ে বউয়ের কাছ থেকে ফোনটা নিল ওলাফ।

হ্যালো, কী ব্যাপার?

pathagar.net

আমি টুলি ব্র্যানসন বলছি, মিস্টার ডেলি।

তোমার ইয়ার-দোস্ত কে কোথায় বোতল খুলেছে তার জন্যে আমি তোমার জায়গায় ডিউটি দিতে পারব না।

না, স্যার, তা নয়।—আমি বললাম, আসল ব্যাপারটা হল, চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারের মেয়েটা সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান দরকার।

চোদ্দো নম্বরে তো কেউ নই, টুলি।

হ্যাঁ, স্যার, আছে। চোদ্দো নম্বরে একটা মেয়ে আছে। অল্পবয়েসি সোনালি-চুল ফুটফুটে একটা মেয়ে, মিস্টার ডেলি। মরেছে বলে বিশ্বাসই হতে চায় না। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। শুধু খাতায় মেয়েটার নাম এন্ট্রি করতে আপনি ভুলে গেছেন।

শুনতে পেলাম মিসেস ডেলি ওলাফকে জিগ্যেস করছে, কী ব্যাপার!

বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওলাফের স্বর পালটে গেল : মনে হয় ব্র্যানসন ছোকরা আজ রাতে ওর ফ্লাস্কে হুইস্কি নিয়ে এসেছে।

না, স্যার।—ওলাফকে লক্ষ করে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, যা অবস্থা তাতে আমার হুইস্কির দরকার, কিন্তু সঙ্গে তো একফোঁটাও নেই। মোদ্দা কথা হল, চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারে একটি সোনালি-চুল মেয়ের বডি রয়েছে, যার নামটা আপনি খাতায় টুকতে ভুলে গেছেন।

এরকম ভুল আমার কী করে হবে?

ওই তো মেয়েটা, চোখের সামনেই রয়েছে! বিশ্বাস না হলে স্বচক্ষে এসে দেখে যান!

তাই করতে হবে দেখছি, খোকা! তুমি আমার নামে বিরাট বদনাম দিচ্ছ!

ও এত জোরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল যে, আমার কানের পরদা কেঁপে উঠল। অত্যন্ত শান্তভাবে ফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢাললাম, একটা সিগারেট ধরিয়ে কফিতে চুমুক দিলাম, এবং একটা সিগারেট ধরালাম।

আর-এক ঢোঁক কফি খেয়ে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে আবার হাত বাড়ালাম। আর তখনই লক্ষ করলাম, ইতিমধ্যেই তিনটি সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছি। এবং অ্যাশট্রে থেকে সেগুলোর ধোঁয়া এঁকেবেঁকে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্লিষ্ট হাসি হেসে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্যে দুটো টান দিয়ে সিগারেটটা নিভিয়ে দিলাম।

ঝোড়ো সমুদ্রে টলমলে জাহাজের মাস্তুলের মতো ওর খোঁড়া পা নিয়ে ওলাফ এসে হাজির হল। ওর আগুনঝরা দৃষ্টির উত্তর দিলাম হাসি দিয়ে। যতখানি সম্ভব আশ্বাস ঢেলে দিলাম সে-হাসিতে। তারপর ওকে ইশারা করলাম লাশ-ঘরের দিকে!

সুইংডোর ঠেলে ওলাফ লাশ-ঘরে ঢুকল; আমি ঠিক ওর পেছনে-পেছনে।

pathagar.net

চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারটা এখনও হাট করে খোলা। ও ড্রয়ার পর্যন্ত যাওয়ার কষ্টটা করল না। বরং ড্রয়ারটার দিকে একপলক দেখেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি।

—ও রাগে গর্জে উঠল, আমার বয়েস বিশ বছর কম হলে তোমার নাকটা থেঁতলে দিতাম। তোমার সাহস আছে বলতে হবে। সময় নেই, অসময় নেই, একটা ক্লান্ত বুড়ো মানুষকে এই হতচ্ছাড়া জায়গায় টেনে এনেছ। আর আমি ভাবতাম আজকালকার ছেলেছোকরার মধ্যে তুমি অনেক ভালো।

কিন্তু, মিস্টার ডেলি...।

আর কিন্তু বলে লাভ নেই, ছোকরা! তোমার নামে আমি রিপোর্ট করব।

উদভ্রান্তের মতো আবার তাকালাম চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারের দিকে। ওই তো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে। সোনালি চুল, সুন্দরী এবং মৃত।

আমাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে ওলাফ চলে যেতে চাইল ঘর থেকে। আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। ভয়ে আমার অবস্থা তখন মুরগির ছানার মতো এবং পারলে পালকসমেত খোলস ছেড়ে দিই।

শুনুন, শুনুন! —আমি চিৎকার করে উঠলাম, মেয়েটাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো! আমি জানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

আমার গা থেকে হাত সরাও,—ওলাফ চেঁচিয়ে জবাব দিল, ঠিক যা আছে আমি স্পষ্ট তাই দেখতে পাচ্ছি। একটা খালি ড্রয়ার—ঠিক তোমার ফাঁপা মগজের মতোই খালি।

আমি ওর হাত খামচে ধরলাম : প্রাণ গেলেও ছাড়ছি না। এ আপনি কী ধরনের ঠাট্টা করছেন আমার মাথায় ঢুকছে না...।

ঠিক তাই। আমারও মাথায় ঢুকছে না। —আমার চেয়েও চেঁচিয়ে বলল ওলাফ, তবে তোমার ঠাট্টাটা নেহাতই বস্তাপচা।

তা হলে আপনি ড্রয়ারটার দিকে আর-একটিবার দেখুন, আর এই খামখেয়ালিপনা বন্ধ করুন।

আমার যা দেখার আমি দেখেছি। কোনও গর্দভ দামড়া ছাড়া এক বুড়োকে রাত-বিরেতে তার বাড়ি থেকে কেউ বেরোতে বলবে না।

এক ঝটকায় ওলাফ হাত ছাড়িয়ে নিল, ঝড়ের মতো দরজা পার হয়ে বেরিয়ে গেল। সদর দরজায় পৌঁছে ও থামল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে শাসাল আমাকে।

হাড়-হাভাতে বজ্জাত ছোকরা,—ও বলল, কাল থেকে অন্য চাকরি খুঁজতে শুরু করো।

এ-কথা বলে ও চলে গেল।

ওলাফকে অনুসরণ করে আমি পাশের ঘর পর্যন্ত এসেছিলাম, এবার ঘুরে

pathagar.net

মেজাজটা সামান্য ভালো হল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে জাড লরেন্সকে ফোন করলাম। জাড আমার বাবার গল্‌ফ খেলার সঙ্গী এবং হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের সাদা-পোশাক ডিটেকটিভ। আমার সম্পর্কে ওর ধারণা ভালোই, এবং সত্যি বলতে কী, এ-চাকরিটার জন্যে ও-ই আমার হয়ে সুপারিশ করেছিল।

জাড বাড়ি ছিল না। তিনটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত ডিউটি দিয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং ফোন করলাম পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। সেখানে শুনলাম জাড সই করে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ওরা চেষ্টা করে লকার রুমে জাডকে পেল।

টুলি ব্র্যানসন, মিস্টার লরেন্স।

কেমন চলছে, টুলি?

একটা মুশকিলে পড়ে গেছি।

বলে ফ্যালো।—ওর জোরালো মেজাজি স্বরে দ্বিধার লেশমাত্র নেই।

হ্যাঁ, মানে...মনে হচ্ছে, একটা লাশের ব্যাপারে আমাদের রেকর্ড খাতায় একটু গোলমাল হয়েছে। একটা মেয়ে। সোনালি চুল। নার্স। নামের আদ্যক্ষর জেড. এল.।

তা হলে ওলাফ ডেলিকে ফোন করে দ্যাখো, টুলি।

হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু জানেন তো, ডিউটি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওলাফের কী অবস্থাটা হয়। এতক্ষণে ও স্বপ্নের দেশে পৌঁছে গেছে, আর আমি ওকে ঠিক এ-সময়ে বিরক্ত করতে চাই না। ও ভীষণ খেপে যাবে।

জাড দরাজ গলায় হেসে উঠল : নাঃ, বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। মেয়েটার সম্বন্ধে তা হলে আর কিছু জানো না?

না, যা বললাম, শুধু তাই। মেয়েটা বেওয়ারিশ নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। এরকম একটা মেয়ে, বিশেষ করে স্বাভাবিক কারণে যে মারা গেছে, বেসরকারি কবরখানায় যার যাওয়ার কথা, তার এখানে আসার কথা নয়।

সুতরাং মর্গে যখন এসেছে তখন মেয়েটা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়নি, জাড বলল।

সে ছাড়া আর কী হতে পারে।

খুন?

আর কিছু তো মাথায় আসছে না,—আমি বললাম, মেয়েটা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কারণে মারা গেছে!

ঠিক আছে, টুলি। দেখছি, তোমার জন্যে কী করতে পারি।

আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে বলে ভীষণ খারাপ লাগছে।

কষ্ট? কষ্টের কী আছে! গোটা দুয়েক টেলিফোন করলেই কাম ফতে হয়ে যাবে।

ধন্যবাদ, মিস্টার লরেন্স।

pathagar.net

ফোন রেখে দিলাম। জাড লরেন্সের টেলিফোনের অপেক্ষা করতে-করতে উঠে গেলাম লাশ-ঘরের দরজার কাছে। ধীরে-ধীরে শার্সির ফাঁক নিয়ে নজর চালিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম যে, চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারে মেয়েটার ছায়া এখনও রয়েছে।

হ্যাঁ, রয়েছে। পা টেনে আবার ফিরে এলাম টেবিলের কাছে। মনে হল, আমি যেন এক ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষ।

শেষপর্যন্ত ফোন যখন বাজল, আমি ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলাম!

সিটি মর্গ! টুলি ব্র্যানসন বলছি।

আমি জাড, টুলি!

আপনি কী...?

হোমিসাউড থেকে কোনও খবর নেই, টুলি। জেড. এল. নামে কোনও সোনালি-চুল মেয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় খুন হয়নি।

ওঃ,—সত্যিকারের একটা যন্ত্রণার আর্তনাদকে মাঝপথে টুঁটি টিপে থামিয়ে দিলাম।

নার্সদের খাতাপত্তরেও খোঁজ নিয়েছি,—জাড তখন বলে চলেছে, তোমার বর্ণনা মতো একজন নার্সকে পাওয়া গেছে। যুবতী, সোনালি চুল, সবে ট্রেনিং শেষ করেছে। ওর নাম জেলা ল্যাঙট্রি। থাকে ৭১১ ইস্টল্যান্ড অ্যাভিনিউতে। সম্প্রতি সিটি হসপিটালে কাজে ঢুকেছে। যদি ওর কোনও বিপদ-আপদ হয়ে থাকে, তা হলে গত আধ ঘণ্টায় হয়েছে। কারণ, কিছুক্ষণ আগেই শিফ্‌ট বদলের সময় ও ডিউটি শেষ করে বাড়ি রওনা হয়ে গেছে।

pathagar.net

জাডের কথা ও চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারের ছায়া যোগ করলে একটাই অবিশ্বাস্য উদ্ভট সম্ভাবনা বাকি থাকে। সেটা এতই ভয়ঙ্কর ও অপার্থিব যে, আমার মাথার চুল ছুঁচের মতো খাড়া হয়ে উঠল।

মিস্টার লরেন্স, আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে জেলা ল্যাঙট্রি কোনওদিনই বেঁচে বাড়ি ফিরবে না।

তার মানে? কী বলছ তুমি টুলি?

এন্ডরের চতুর্থ মায়াবিনী যে-ড্রয়ারে...।—আমার কথা জড়িয়ে গেল ঃ...বুড়িটার মন ভীষণ নরম ছিল। কখনও লোকের ক্ষতি করত না। শুধু ভালো করত।

কীসব আবোল-তাবোল বকছ?—তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল জাড, টুলি, তুমি নেশা করেছ নাকি?

না, স্যার।

শরীর ঠিক আছে তো?

আমি—মানে...ইয়ে, হ্যাঁ, স্যার। অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার লরেন্স।

*

বিশ মিনিট পরে আমার ঝরঝরে চার-চাকা ইস্টল্যান্ড অ্যাভিনিউতে এসে থামল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে নম্বর খুঁজতে-খুঁজতে পা চালালাম। বুঝলাম, ঠিক জায়গাতেই এসেছি। ৭১১ নম্বর সহজেই পেয়ে গেলাম। একটা ছোট সাদা রঙের বাড়ি, সঙ্গে লাগোয়া ছোট উঠোন।

জায়গাটা অন্ধকার, নির্জন, শান্ত।

সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজেকে যখন গর্দভ মনে হচ্ছে তখন হঠাৎই সামনের চৌরাস্তা থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এল। তাকিয়ে দেখি, একটা সরকারি বাস ভারি শরীর নিয়ে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা দলছুট মেপ্‌ল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটা মেয়ের ছায়া-শরীর ইস্টল্যান্ড অ্যাভিনিউ ধরে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু বাস থেকে মেয়েটা একা নামেনি। ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে আরও লম্বা, ভারি একটা ছায়াঃ একটা লোক। দৃশ্যটা দেখে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেল।

মেয়েটা হঠাৎ টের পেল ওর পেছনে কেউ আসছে। তাই তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করল। লোকটাও চলার গতি বাড়িয়ে দিল। মেয়েটা পেছন ফিরে তাকাল। আরও জোরে পা চালাল; বলতে গেলে এখন ছুটছে।

ফুটপাতে লোকটার পায়ের শব্দ স্পষ্ট ও দ্রুতলয়ে বাজতে লাগল। সে মেয়েটার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তেই মেয়েটার শুরু করা চিৎকার মাঝপথেই থেমে গেল।

ফুটপাতে ওরা তখন যুঝে চলেছে। লোকটা বাহুর খাঁজে মেয়েটার গলা চেপে ধরেছে, মেয়েটা হাত-পা ছুড়ছে আর ছটফট করছে।

মেপ্‌ল গাছের আড়াল থেকে আমি এমনভাবে ছুটে গেলাম যেন যুদ্ধের দামামা আমাকে রক্তের হোলিখেলায় যোগ দেওয়ার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। লোকটা আমার পায়ের শব্দ পেয়েই মেয়েটাকে ছেড়ে দিল। আমি সরাসরি গিয়ে লোকটার ওপরে পড়লাম। আমার কাঁধ ওর পেটে আঘাত করল।

লোকটা সজোরে একটা হাঁটু তুলল; আঘাতটা আমার থুতনিতে এসে লাগল। আমি ফুটপাতে বসে পড়লাম, আর লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটে পালাল।

দুটো শক্ত অথচ কোমল হাত আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। এই প্রথম আমি জেলা ল্যাঙট্রির চোখের দিকে তাকালাম। ছায়াময় রাতে ওর কৃতজ্ঞতা মাখানো ধোঁয়াটে চোখ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

আপনার লাগেনি তো?—দম ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করলাম।

না, ঠিক আছি। আপনি?

না-না, আমার কিছু হয়নি।—আমি বললাম।

pathagar.net

মেয়েটি ক্রমশ আস্থা ফিরে পাচ্ছে।

ভাগ্যিস ঠিক সময়ে আপনি এসে পড়েছিলেন।

আমি—ইয়ে—মানে এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম,—ওকে বললাম, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই। ওই লোকটার নামে পুলিশে রিপোর্ট করে লাভ নেই। কারণ, মুখ দেখতে পাইনি। ওরা ধরতে পারবে না।

আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম।—ও বলল, একটু এগিয়েই আমার বাড়ি।

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। মেয়েটা বলল, ওর নাম জেলা। আর আমিও বললাম আমার নাম টুলি। ওর বাড়ির দরজায় পৌঁছে আমরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম। আমি জানতে চাইলাম কখনও ওকে ফোন করলে কোনও অসুবিধে আছে কি না। ও বলল, হাতের কাছে টেলিফোন খালি পেলেই করতে। দেখলাম, ও বাড়িতে ঢুকে গেল। গাড়িতে ফিরে আসার সময় আমি শিস দিতে শুরু করলাম।

মর্গে ফিরে এসে সোজা এগিয়ে গেলাম চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারের দিকে। আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে জেলা ল্যাঙট্রির ছায়া ড্রয়ারে আর দেখা যাবে না, কারণ এইমাত্র ওকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সুতরাং চোদ্দো নম্বর ড্রয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। না, আমার অনুমানে অন্তত কোনও ভুল হয়নি।

জেলা ল্যাঙট্রির ছায়া ড্রয়ারে আর নেই। নতুন যে-মেয়েটা রয়েছে তার মাথায় সুন্দর একরাশ লাল চুল।

➤ *ড্রয়ার নাম্বার ফোর্টিন*

pathagar.net

ছায়াছবি

এডগার অ্যালান পো

pathagar.net

আপনারা যাঁরা এ-কাহিনি পড়ছেন, এখনও জীবিতদের মধ্যে রয়েছেন; কিন্তু আমি, যে লিখছি, বহুদিন হল ছায়াঘেরা অন্ধকার আবর্তে পা দিয়েছি। কারণ, অদ্ভুত ঘটনা অনেক ঘটবে, অনেক গোপন জিনিস প্রকাশিত হবে, বহু শতাব্দী ক্রমে পার হয়ে যাবে, তারপর এইসব স্মৃতিলেখা আপনাদের চোখে পড়বে। আর যখন পড়বে তখন কেউ-কেউ হয়তো অবিশ্বাস করবেন, কেউ-বা সন্দেহ করবেন, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয়তো লোহার ছুঁচ দিয়ে খোদাই করা এই অক্ষরগুলোর মধ্যে গভীর চিন্তার খোরাক খুঁজে পাবেন।

সেই বছরটা ছিল এক নগ্ন আতঙ্কের বছর, আর সেইসঙ্গে ছিল আতঙ্কের চেয়েও অনেক তীব্র এক নগ্ন অনুভূতি, তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ করার মতো কোনও নাম যার নেই। কারণ অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ও ইঙ্গিত তখন ঘটে গেছে, মহামারীর কালো ডানা বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দূর থেকে দূরে, সাগরে ও সমতলে। নক্ষত্র সম্পর্কে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা অন্তত বুঝতে পেরেছিলেন স্বর্গের পরনে ছিল এক অশুভ পোশাক; আর আমি, গ্রিক অয়নোস, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, এই সেই সাতশো চুরানব্বইতম বছর; পালা বদলের পালা শুরু হয়েছে—মেষ রাশির অনুপ্রবেশের সঙ্গে-সঙ্গেই বৃহস্পতি গ্রহ যুক্ত হয়েছে ভয়ঙ্কর শনি গ্রহের রক্তবলয়ে। শুধু পৃথিবীর গোলকের মধ্যেই নয়, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে তা হলে অন্তরীক্ষের অদ্ভুত আত্মা নিজের প্রভাব ক্রমে জোরালো করে তুলেছে প্রতিটি মানুষের ধ্যানে, কল্পনায়, প্রাণে।

টলিমাই নামের এক মলিন শহরে, অভিজাত একটি ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে কয়েকটা লাল 'শিয়ান' সুরার বোতল সামনে রেখে এক রাতে আমরা বসেছিলাম—আমাদের সাতজনের একটি দল। সেই ঘরের এক এবং একমাত্র প্রবেশপথ একটি বিশালকায় পিতলের দরজা : এই দরজার পরিকল্পনা শিল্পী করিনোস-এর এবং দুর্লভ কারিগরির নিদর্শন হিসেবে ওটা বন্ধ করার ব্যবস্থা ঘরের ভেতর থেকে। সেই বিষণ্ণ ঘরের চারপাশে টাঙানো রয়েছে ভারি কালো পরদা। সেই পরদা আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করেছে আকাশের চাঁদ, ভয়ঙ্কর নক্ষত্রমণ্ডলী, এবং নির্জন জনপথ—কিন্তু অশুভের ইঙ্গিত কিংবা স্মৃতিকে ততটা আড়াল করতে পারেনি। আমাদের ঘিরে চারপাশে আরও অনেক কিছু ছিল, যার কোনও স্পষ্ট বর্ণনা আমি দিতে পারছি না—সেগুলোর কিছু বাস্তব, আর কিছু ভৌতিক—আবহাওয়া ছিল অদ্ভুত ভারি—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসা এক অনুভূতি—দুশ্চিন্তা—আর সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের অস্তিত্বের এক ভয়ঙ্কর অবস্থা : প্রতিটি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণভাবে সপ্রাণ ও জাগ্রত, অথচ চিন্তাশক্তি অচেতন সুপ্ত হলে কোনও দুর্বল-স্নায়ু মানুষের যে—অবস্থা হয়, ঠিক সেইরকম। এক প্রচণ্ড ভার আমাদের অবলম্বন করে ঝুলছে—আমাদের প্রতিটি অঙ্গে—ঘরের প্রতিটি আসবাবে—আমাদের প্রতিটি সুরার পাত্রে; প্রতিটি জিনিস সেইভাবে অবদমিত, পরাজিত—ব্যতিক্রম শুধু আমাদের পানোৎসবকে আলোকিত করে রাখা সাতটি লোহার বাতিদানের উজ্জ্বল শিখা। সুদীর্ঘ তন্বী আলোর রেখায় ওরা নিজেদের শূন্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে, অচঞ্চল ম্লানভাবে জ্বলছে; আর আবলুস কাঠের বৃত্তাকার টেবিলে বাতিদানের শিখার দ্যুতি যে-আয়না তৈরি করেছে, তার মসৃণ তলে প্রতিফলিত আমাদের প্রত্যেকের বিবর্ণ মুখ ও হতাশ চোখের অস্থির জ্বলন্ত দৃষ্টি। অথচ তবুও আমরা হাসছিলাম, রীতি অনুযায়ী আনন্দ প্রকাশ করছিলাম—যাকে একরকম হিস্টিরিয়াগ্রস্ততা বলা যায়; আমরা গাইছিলাম অ্যানক্রিয়োনের গান—পাগলের মতো; আর গভীর চুমুক দিচ্ছিলাম সুরার পাত্রে—যদিও লাল সুরা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল রক্তের কথা। কারণ আমাদের আর-এক সঙ্গী, তরুণ জোলিয়াস, সেই ঘরে উপস্থিত ছিল—মৃত, সটান ভঙ্গিতে শায়িত, আচ্ছাদিত—উপরোক্ত দৃশ্যপটের এক অশরীরী আত্মা ও অপদেবতা। হায়! আমাদের আনন্দে সে কোনও অংশ নেয়নি, কিন্তু তার প্লেগে বিকৃত চেহারা ও চোখ—যে-চোখ থেকে মহামারীর আগুন অর্ধেক নিভিয়ে দিয়েছে 'মৃত্যু'—যেন আমাদের খুশিতে অংশ নিল : মৃত্যু আসন্ন এমন মানুষদের আনন্দে ঘটনাচক্রে যেমন কোনও মৃতদেহ ক্বচিৎ কদাচিৎ অংশ নিয়ে ফেলে। যদিও আমি, অয়নোস্, বুঝতে পারছি মৃতের দু-চোখ আমারই দিকে, তবুও সেই চোখের তিক্ত অভিব্যক্তি অনুভব না করতে প্রবল সচেষ্ট হলাম, এবং আবলুস কাঠের আয়নার গভীরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তীব্র সননশীল স্বরে গেয়ে চললাম টাইয়োস-পুত্রের গান। কিন্তু ক্রমে আমার গান রুদ্ধ হয়ে এল, তার প্রতিধ্বনি ঘরের কালো পরদায় আবর্তিত হয়ে ক্ষীণ অস্পষ্ট হয়ে এল, তারপর একসময় মিলিয়ে গেল।

pathagar.net

আর কী আশ্চর্য! যে-কালো পরদার গভীরে আমার গানের শব্দ লীন হয়ে গেছে, সেই গভীর আড়াল থেকে এগিয়ে এল অনির্দিষ্ট আকৃতির কৃষ্ণকায় এক ছায়া—চাঁদ যদি আকাশে খুব নীচে থাকে তা হলে কোনও মানুষের যেরকম ছায়া ফেলে ঠিক সেইরকম এক ছায়া : কিন্তু এ-ছায়া কোনও মানুষের বা দেবতার নয়, কোনও পরিচিত জিনিসেরও নয়। ঘরের পরদার ভাঁজে কিছুক্ষণ কেঁপে উঠে অবশেষে ওটা এগিয়ে এল আমাদের পূর্ণ দৃষ্টির সামনে। তারপর পিতলের দরজার ওপরে আশ্রয় নিল। কিন্তু সে-ছায়া অস্পষ্ট, নিরাকার, অনিশ্চিত; কোনও মানুষের কিংবা দেবতার নয়—গ্রিসের দেবতার নয়, শ্যালডিয়ার দেবতার নয়, মিশরের কোনও দেবতাও সে নয়। সেই ছায়া অধিস্থাপিত হল পিতলের দরজায়, তোরণের ঠিক নীচে—নিশ্চল, শব্দহীন, কিন্তু সেখানে স্থির ও অস্তিমান। আর দরজার যে-জায়গায় ছায়াটি অবিচল, যদি আমার স্মরণ করতে ভুল না হয়ে থাকে, সেটা আচ্ছাদিত তরুণ জোলিয়াসের মৃতদেহের পদপ্রান্তের ঠিক কাছেই। কিন্তু আমরা, জমায়েত হওয়া সাতজন, পরদার গভীর থেকে ছায়াটিকে মূর্ত হতে দেখে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে সাহসহীন হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছি, এবং আবলুস কাঠের আয়নার অতলে স্থির দৃষ্টিতে অবিরাম চেয়ে থেকেছি। অবশেষে আমি, অয়নোস, মৃদু স্বরে সেই ছায়ার কাছে জানতে চেয়েছি তার নিবাস ও পরিচয়। তখন সেই ছায়া উত্তর দিল, 'আমি এক "ছায়া"। আমার নিবাস টলিমাই-এর ভূগর্ভস্থ সমাধির খুব কাছে, তবে ক্লেদময় মৃত্যু-নদীর পারে হিলিউশন-এর মলিন সমতলভূমি থেকে খুব দূরেও নয়।' তখনই আমরা সেই সাতজন নিজেদের আসন ছেড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালাম আতঙ্কে। দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম। শিউরে উঠলাম আমরা। ত্রাসে হতবুদ্ধি। কারণ ছায়ার কণ্ঠস্বর কারও একার কণ্ঠস্বর নয়, বরং এক সম্মিলিত কণ্ঠস্বর; শব্দ থেকে শব্দাংশে বিভিন্ন স্বরধ্বনির উত্থান-পতন নিয়ে সেই স্বর বিষণ্ণভাবে আমাদের কানে এসে পৌঁছল; আমরা স্পষ্ট চিনতে পারলাম তাদের পরিচিত বাচনভঙ্গি—আমাদের বহু সহস্র মৃত বন্ধুদের মিলিত কণ্ঠস্বর।

➤ *শ্যাডো—এ প্যারাব্‌ল*

pathagar.net

লুকোচুরি

এ. এম. বারেজ

pathagar.net

'না' বিষণ্ণ হেসে জ্যাকসন বলল, 'দুঃখিত। আমি তোমাদের খেলা নষ্ট করতে চাই না। শুধু-শুধু না খেলে আমার লাভ কী? কারণ, আমাকে বাদ দিয়েও তোমাদের অনেক লোক থাকবে খেলার জন্যে, কিন্তু লুকোচুরি আমি মরে গেলেও খেলব না।'

সময়টা বড়দিনের আগের রাত। তারুণ্যের যথাযথ উচ্ছ্বাস নিয়ে আমরা চোদ্দো জনের একটা দল হাজির। রাতের খাওয়াদাওয়া বেশ ভালোই হয়েছে, অতএব এখন ছেলেমানুষি খেলার মরসুম। আর আমাদের মেজাজও সেসব খেলা খেলতে কোমর বেঁধে তৈরি। রাজি আমাদের সবাই, শুধু জ্যাকসন বাদে। যখন কেউ লুকোচুরি খেলার প্রস্তাব দিল, তখন একবাক্যে সকলেই হইহই করে সমর্থন জানিয়েছে। একমাত্র তার কথাতেই ভিন্ন সুর বেজে উঠেছে।

খেলাধুলো বা হুল্লোড় ভণ্ডুল করে দেওয়াটা জ্যাকসনের স্বভাব নয়। কে একজন জিগ্যেস করল, তার শরীর খারাপ লাগছে কি না।

'না, শরীর ঠিকই আছে; তবে—' ছোট্ট হাসি হেসে তার সরাসরি প্রত্যাখ্যান সামান্য মোলায়েম করল জ্যাকসন, 'লুকোচুরি খেলার মধ্যে আমি নেই।'

একজন জিগ্যেস করল, 'কেন?'

উত্তর দেওয়ার আগে একটু ইতস্তত করল সে।

'মাঝে-মাঝে একজনের বাড়িতে আমি বেড়াতে যাই, গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসি। সেই বাড়িতে অন্ধকারে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে একবার একটি মেয়ে মারা

যায়। মেয়েটা বাড়ির আনাচকানাচ ভালো চিনত না। সেখানে চাকরবাকরদের যাতায়াতের জন্যে দরজা দেওয়া একটা সিঁড়ি ছিল। ফলে ওকে কেউ তাড়া করতেই ও দরজাটা খুলে এক লাফে ভেতরে ঢুকে পড়ে এই ভেবে যে, কোনও শোওয়ার ঘর-টর হবে। কিন্তু সিঁড়ির নীচে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে মেয়েটি মারা যায়।'

আমাদের চোখে-মুখে কৌতূহলের ছায়া নেমে এল। মিসেস ফার্নলি বলে উঠল, 'কী সাঙ্ঘাতিক! যখন এটা হয় তখন আপনি সেখানে ছিলেন?'

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল জ্যাকসন।

'না,' সে বলল, 'তবে অন্য একটা ঘটনার সময় আমি সেখানে ছিলাম। সেটা আরও সাঙ্ঘাতিক।' কথা শেষ করতে গিয়ে স্পষ্ট শিউরে উঠল সে। তারপরই জ্যাকসন প্রসঙ্গের পরিবর্তন করল, 'জানি না, তোমাদের কেউ কখনও "মি" নামে একটা খেলা খেলেছ কিনা। এটা সাদামাটা লুকোচুরি খেলার এক চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত রূপ। খেলাটার নাম তৈরি হয়েছে "আমি" শব্দের সংক্ষিপ্ত চেহারা থেকে—"মি"। লুকোচুরি জাতীয় খেলা খেলতে গেলে এই খেলাই ভালো। এসো, তোমাদের নিয়মকানুনগুলো বলে দিই—।

'প্রত্যেক খেলোয়াড়কে প্রথমে একটি করে ছোট্ট কাগজের চিরকুট দেওয়া হবে। তার মধ্যে একটা কাগজ ছাড়া বাকি সবগুলোই থাকবে সাদা। এবং সেই একটা কাগজে "মি" শব্দটা লেখা থাকবে। এই কাগজটা যে পাবে, সে-ই হল "মি"—এবং "মি" যে কে হল, সেটা "মি" নিজে ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। এবার ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। তারপর "মি" চুপিচুপি ঘর থেকে সরে পড়বে কোথাও লুকিয়ে পড়ার জন্যে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাকি খেলোয়াড়রা বেরিয়ে পড়বে তার খোঁজে। কিন্তু সত্যি-সত্যি যে তারা কাকে খুঁজছে, তা তারা নিজেরাই জানবে না। একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে আর-একজনের দেখা হলেই সে "মি" শব্দটা চেঁচিয়ে বলে তাকে চ্যালেঞ্জ করবে, তখন অন্য খেলোয়াড়টি যদি সত্যিই "মি" না হয় তা হলে "মি" বলে সে উত্তর দেবে।

'আসল "মি" কিন্তু চ্যালেঞ্জ করলে কোনও উত্তর দেবে না। চুপ করে থাকবে। তখন দ্বিতীয় খেলোয়াড়টি "মি"-এর পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। এবং ওদের দুজনকে আবিষ্কার করবে কোনও তৃতীয় খেলোয়াড়, চ্যালেঞ্জ করবে, এবং কোনও উত্তর না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়বে। এইভাবে খেলোয়াড়দের সারি ক্রমশ লম্বা হবে, এবং সবচেয়ে শেষে যে এসে হাজির হবে তাকে যা হোক কিছু একটা খেসারত দিতে হবে। এ-এক হইচই করা প্রচণ্ড হুল্লোড়ের খেলা। তোমরা খেলে দেখতে পারো—।'

আমি মন্তব্য করলাম যে, খেলাটা খুব চমৎকার, এবং জানতে চাইলাম, জ্যাকসন নিজে কখনও এ-খেলা খেলেছে কি না।

'হ্যাঁ, খেলেছি,' সে উত্তর দিল, 'যে-বাড়িটার কথা বলছিলাম সেই বাড়িতে।'

'আর এই মেয়েটা সেখানে ছিল? ওই যে, যে-মেয়েটা ঘাড় মটকে—।'

'জানি না, মেয়েটা সেখানে ছিল কি ছিল না। হয়তো ছিল। কারণ, আমি জানি সেদিন আমরা মোট তেরোজন ছিলাম, যেখানে বারোজন থাকার কথা। শপথ করে বলতে পারি, ওর নাম আমি জানতাম না; নইলে অন্ধকারে ওই ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শোনার পর আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেতাম! না, ও-খেলা আমি কিছুতেই আর খেলছি না...।'

আমাদের আমন্ত্রক টিম ভাউস চারপাশে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল। সে-হাসির অর্থ খুব ধীরে এক চোখ টিপে নোংরাভাবে প্রকাশ করা যায়।

'নাও, গল্প শোনার জন্যে তৈরি হও,' সে ঘোষণা করল!

'গল্প সত্যিই একটা আছে, তবে সেটা শোনাব কি শোনাব না নির্ভর করছে...।' কথা থামিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকসন।

'না খেলার জন্যে খেসারত তো তোমাকে এমনিতেই দিতে হত,' টিম বলল, 'সুতরাং আগেভাগেই সেটা দিয়ে দাও। তোমাকে এখানে এই মুহূর্তে সেই গল্পটা শোনানোর দণ্ড দেওয়া হল।'

সুতরাং শুরু হল জ্যাকসনের গল্প...।

pathagar.net

তোমাদের কারও-কারও হয়তো স্যাংস্টনদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মানে, ক্রিস্টোফার স্যাংস্টন আর তার বউ। ওরা আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হয়—অন্তত ভায়োলেট স্যাংস্টন তো বটেই। বছর আষ্টেক আগে উত্তর আর দক্ষিণ ডাউন্স-এর মাঝামাঝি, সারে আর সাসেক্স-এর সীমান্তে, ওরা একটা বাড়ি কেনে। ওদের সঙ্গে সেই বাড়িতে থেকে বড়দিনটা কাটিয়ে আসার জন্যে পাঁচ বছর আগে ওরা আমাকে একবার নেমন্তন্ন করেছিল।

বাড়িটা বেশ পুরোনো। কোন যুগের তা সঠিক বলতে পারব না, তবে 'এলোমেলো' বিশেষণটা সেটার চরিত্রে স্পষ্ট খাপ খেয়ে যায়। বাড়িটা যে খুব বড় ছিল তা নয়। কিন্তু ওটার যে মূল নির্মাতা সে জায়গা বাঁচানোর দিকে তেমন মনোযোগ দেয়নি। প্রথম-প্রথম যে-কেউই চট করে সেখানে পথ হারিয়ে ফেলবে।

যাই হোক, বড়দিন তো কাটাতে গেলাম। ভায়োলেট চিঠিতে আশ্বাস দিয়েছিল যে, আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথি প্রায় সকলেই আমার পরিচিত, আর যে দু-একজন নতুন, তারা এক কথায় 'দারুণ'। অন্যান্য সকলে দু-দিন আগে পৌঁছলেও দুর্ভাগ্যবশত কাজের চাপে আমি পৌঁছলাম একদিন দেরিতে—বড়দিনের আগের দিন রাতে প্রায় ডিনারের সময়ে। সকলে তখন পোশাক-আশাক পরতে ব্যস্ত। সুতরাং তৈরি হয়ে নিতে

আমি সোজা চলে গেলাম নিজের ঘরে। শত তাড়াতাড়ি সত্ত্বেও আমি নেমে এলাম সবার শেষে। সকলে তখন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। বসবার ঘরে পা রাখামাত্রই ডিনার ঘোষণা করা হল। কোনওরকমে তাড়াহুড়ো করে পরিচিত সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের কাজটুকু সেরে নিলাম, এবং অপরিচিত দু-তিনজনের সঙ্গে পরিচয়ের পালা শেষ করলাম। তারপর আমার হাত এগিয়ে দিতে হল মিসেস গরম্যানের দিকে।

এত কথা বলার কারণ একটাই : ওই ব্যস্ততার মধ্যে নতুন আলাপ হওয়া একটি দীর্ঘাঙ্গী তামাটে চেহারার সুন্দরী মেয়ের নাম আমি ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। সবকিছুই যেন তাড়াহুড়ো করে হতে লাগল। তা ছাড়া আমি বরাবরই লোকের নামধাম মনে রাখার ব্যাপারে দারুণ পণ্ডিত। মেয়েটির অভিব্যক্তি শীতল, চতুর—যেন সাবধান করে দিচ্ছে। যেসব মেয়েদের দেখে মনে হয় পুরুষ সম্পর্কে সব জানে, এ মেয়ে সেই জাতের, আর সেই কারণেই পুরুষরা ওদের চোখে অপ্রিয়। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে বেশ আগ্রহই জাগে—আমারও যে কৌতূহল হল না তা নয়। কে মেয়েটি? কাউকে সে-কথা জিগ্যেস করলাম না, কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম, খুব শিগগিরই কেউ-না-কেউ ওকে নাম ধরে ডাকবে।

দুর্ভাগ্যবশত ওর কাছ থেকে অনেকটা দূরেই আমাকে টেবিলে বসতে হল। আর যেহেতু মিসেস গরম্যান সে-রাতে চমৎকার খোশমেজাজে ছিলেন সেহেতু মেয়েটির পরিচয় নিয়ে দুশ্চিন্তা খুব শিগগিরই আমি ভুলে গেলাম।

স্যাংস্টনদের নিয়ে আমরা মোট বারোজন ছিলাম। আমাদের সকলেই তরুণ অথবা তরুণ হতে চেষ্টা করছি। দলের মধ্যে স্যাংস্টনরাই বয়েসে সবার বড়, আর ওদের কলেজে-পড়া ছেলে রেগিই হয়তো সবচেয়ে ছোট। খাওয়াদাওয়ার পর খেলার কথা উঠতে রেগিই 'মি' খেলার প্রস্তাব দিল। আমি যেমন তোমাদের বললাম, সেভাবে ও খেলার নিয়মকানুনগুলো আমাদের শিখিয়ে দিল।

ব্যাপারটা আমরা সবাই বুঝে নিতেই ওর বাবা ফোড়ন কাটল, 'এসব খেলা খেলতে গেলে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝামাঝি যে-দরজাটা আছে ওটা সম্পর্কে সাবধান থেকো। বহুদিনই ভেবেছি দরজাটা খুলে দেব, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। জানা না থাকলে অন্ধকারে মনে হতে পারে যে ওটা কোনও ঘরে ঢোকার দরজা। কিন্তু আসলে ওখানে রয়েছে চাকরবাকরদের নীচে যাতায়াতের একটা খাড়া সিঁড়ি। বছর-দশেক আগে একটা মেয়ে সত্যি-সত্যিই ওখান থেকে পড়ে ঘাড় মটকে মারা গিয়েছিল। তখন এই ক্রিস্টোফার স্যাংস্টন এ-বাড়িতে ছিল।'

আমি জানতে চাইলাম দুর্ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল। উত্তরে স্যাংস্টন বলল যে, এক বড়দিনের উৎসবে লুকোচুরি খেলার সময় দৌড়ে লুকোতে গিয়ে মেয়েটি সোজা নীচে পড়ে যায়। সবাই যখন ওকে তুলে নিয়ে আসে তখন ও মারা গেছে।

আমরা নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই কথা দিলাম যে, খুব সাবধানে থাকব।

সুতরাং নৈশভোজের পালা শেষ হতেই আমাদের খেলা শুরু হল। রেগি স্যাংস্টন চারদিকে ঘুরে-ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল যে, চাকরবাকরদের ঘর ও আমাদের জমায়েত হওয়া বসবার ঘরটা ছাড়া সারা বাড়ির প্রতিটি আলোই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাগজের টুকরো নিয়ে ছোট-ছোট বারোটা পুরিয়া তৈরি করে দু-হাতের মুঠোয় সেগুলো ঝাঁকিয়ে নিল রেগি। তারপর একটা-একটা করে পুরিয়া তুলে দিল এক-একজনের হাতে। এর মধ্যে এগারোটা কাগজই সাদা, এবং বারো নম্বর কাগজে 'মি' কথাটা লেখা রয়েছে। এই 'মি' লেখা কাগজটি যে পাবে তাকেই লুকোতে হবে। অতএব আমরা সেই কাগজের পুরিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার কাগজটা খুলে দেখি সেটা সাদা। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘরের সবক'টা আলো নিভে গেল এবং টের পেলাম অন্ধকারে কেউ একজন চুপিসাড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে।

মিনিটখানেক পরে একজন সংকেত করতেই আমরা ছুট লাগালাম দরজা লক্ষ করে। কে যে 'মি' হয়েছে তা আমি অন্তত ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। পাঁচ-দশ মিনিট ধরে আমরা ঘরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে দিশেহারাভাবে ছুটোছুটি করে বেড়ালাম, আর একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছি ও উত্তর দিচ্ছি, 'মি?—মি!'

একটু পরেই গোলমাল কমে এল। মনে হল, 'মি'কে হয়তো খুঁজে পাওয়া গেছে। অবশেষে একসারি খেলোয়াড়কে খুঁজে পেলাম। চিলেকোঠায় যাওয়ার একটা সরু সিঁড়ির ওপরে ওরা দম বন্ধ করে স্থির আছে। চ্যালেঞ্জ করে নীরব উত্তর পেয়ে আমিও ঝটপট ওদের দলে যোগ দিয়ে ফেললাম। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আরও দুজন দলছুট খেলোয়াড় এসে হাজির হল। শেষ খেলোয়াড় হওয়ার ভয়ে তারা একে অপরকে দৌড়ে হারানোর চেষ্টা করছে। দুজনের একজন স্যাংস্টন, ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে শেষ খেলোয়াড় হয়ে খেসারতের খাতায় নাম লেখাল। একটু পরেই সে চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'আমরা সবাই তো এসে গেছি, তাই না?'

স্যাংস্টন একটা দেশলাই জ্বালাল, তাকাল সিঁড়ি বরাবর ওপরের দিকে, এবং গুনতে শুরু করল। গুনতে খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কারণ সিঁড়ির এক-একটা ধাপ এক-একজন দখল করলেও আমরা একটা কিংবা দুটো ধাপ ছেড়ে-ছেড়ে বসেছিলাম। ফলে আমাদের প্রত্যেকেরই মাথা দেখা যাচ্ছিল।

'নয়, দশ, এগারো, বারো, তেরো।' সে গোনা শেষ করে জোরে হেসে উঠল, 'ধুত, এ যে দেখছি একজন বেশি হচ্ছে!'

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাওয়ায় সে আর-একটা কাঠি জ্বালাল। তারপর আবার গুনতে শুরু করল। বারো পর্যন্ত গুনে বিস্ময়ের অস্ফুট শব্দ করে উঠল স্যাংস্টন ঃ 'এখানে দেখছি তেরোজন রয়েছে!' সে অবাক হয়ে বলল, 'অথচ আমি নিজেকে এখনও গুনিনি।'

'যতসব বাজে ইয়ে!' আমি হেসে বললাম, তুমি নিশ্চয় নিজেকে নিয়ে গুনতে

pathagar.net

শুরু করেছ, আর এখন নিজেকে আবার গুনতে চাইছ।'

স্যাংস্টনের ছেলের ইলেকট্রিক টর্চ জ্বলে উঠল। আরও উজ্জ্বল আরও সুস্থির এই আলোতে আমরা সকলেই তখন গুনতে শুরু করলাম। সত্যিই আমরা আসলে বারোজন রয়েছি! স্যাংস্টন উঁচু গলায় হেসে উঠল। বলল, 'কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, আমি তেরোজনই গুনেছি।'

সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে ভায়োলেট স্যাংস্টনের সামান্য সচকিত কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'মনে হচ্ছিল, আমার দু-ধাপ ওপরে কে যেন একজন বসে আছে। ক্যাপ্টেন র‍্যানসাম, আপনি কি ওপরের দিকে সরে গেছেন?'

র‍্যানসাম জানালেন যে, না, তিনি সরেননি। তিনি আরও বললেন যে, তাঁরও মনে হয়েছে, তাঁর ও ভায়োলেটের মাঝে কেউ যেন বসে রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে অস্বস্তিকর কী যেন একটা শূন্যে ভেসে রইল। একটা শীতল তরঙ্গের রেশ যেন ছুঁয়ে গেল আমাদের। সেই ছোট্ট একটা মুহূর্তের জন্যে মনে হল, অপ্রাকৃত অদ্ভুত কিছু একটা যেন ঘটে গেছে—হয়তো সেটা আবারও ঘটবে। তারপর আমরা দল বেঁধে সজোরে হেসে উঠলাম, স্বস্তি ফিরে পেলাম আবার। সত্যিই আমরা মোট বারোজন রয়েছি, এবং বারোজনই যে ছিলাম সে নিয়ে তর্কের কোনও অবকাশ নেই। হাসতে-হাসতেই আমরা সদলবলে ফিরে গেলাম বসবার ঘরে। নতুন করে খেলা শুরু করতে।

এবার 'মি' হলাম আমি, এবং ভালো কোনও লুকোনোর জায়গা খুঁজে বের করার আগেই ভায়োলেট স্যাংস্টন আমাকে ধরে ফেলল। খুব শিগগিরই সার বাঁধার পালা শেষ হল। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা বারোজন লাইন করে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর কিছুক্ষণের বিরতি। ভায়োলেট একটা চাদর আনতে বলায় ওর স্বামী দোতলায় চাদরটা ওর ঘর থেকে নিয়ে আসতে রওনা হল। সে যেতে-না-যেতেই রেগি আমার জামার আস্তিন ধরে টান মারল। তাকিয়ে দেখি ওর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা, দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

'শিগগির!' রেগি ফিসফিস করে বলল, 'বাবা ফিরে আসার আগেই ধূমপানের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে এক্ষুনি ব্র্যান্ডি যা হোক কিছু একটা দাও!'

ঘরের বাইরে এসে আমি জানতে চাইলাম, ব্যাপারটা কী, কিন্তু সে তখুনি কোনও জবাব দিল না। ভাবলাম, আগে কিছু খাইয়ে ওকে চাঙ্গা করি তারপর সব জিগ্যেস করব। সুতরাং ব্র্যান্ডি ও সোডা মিশিয়ে দিতেই রেগি এক ঢোঁকে সেটা শেষ করে হাঁপাতে লাগল, যেন এইমাত্র অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে।

'আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' আমাকে লক্ষ করে লাজুক হেসে বলল সে।

'কেন, কী ব্যাপার?'

'জানি না। এইবার তো তুমি "মি" হয়েছিলে, তাই না? যাই হোক, কে "মি"

pathagar.net

সে আমি জানতাম না। মা অন্যান্যদের সঙ্গে বাড়ির পশ্চিম দিকে গিয়ে যখন তোমাকে খুঁজে বের করছে, আমি তখন পুবদিকে রওনা হয়েছি। আমার শোওয়ার ঘরে জামা-কাপড় রাখার এক বিশাল আলমারি আছে। ভেবেছিলাম আমার পালা এলে ওখানে লুকোব। ফলে মনে হল, "মি" হয়তো ওই আলমারিতেই লুকিয়েছে। সুতরাং অন্ধকারে পাল্লা খুলে হাতড়াতে শুরু করলাম। কারও হাতে আমার হাত ঠেকল। "মি?" আমি ফিসফিস করে জানতে চাইলাম। কোনও উত্তর না পেয়ে ভাবলাম আমি হয়তো "মি"-কে খুঁজে পেয়েছি।

'জানি না কেন, তবে এটা সত্যি যে, একটা শিউরে ওঠা অনুভূতি আমাকে আঁকড়ে ধরল। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে মনে হল, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সুতরাং টর্চলাইট বের করে জ্বেলে ধরলাম। দেখি, কেউ নেই! কিন্তু বিশ্বাস করো, হলফ করে বলছি, কারও হাত আমার হাতে ঠেকেছে। আর সারাক্ষণই তো আমি আলমারির দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তা হলে আমাকে পাশ কাটিয়ে কে পারবে বাইরে বেরোতে?' সে আবার হাঁপাতে লাগল, 'তোমার কী মনে হয় বলো তো?' সে জিগ্যেস করল।

স্বাভাবিকভাবেই আমি বললাম, 'সব তোমার মনের ভুল।'

সে শব্দ করে খাটো হাসি হাসল। বলল, 'তুমি তো ওই কথাই বলবে—মনের ভুল, তা ছাড়া আর কী!' একটু থেকে ঢোঁক গিলল রেগি, 'মনের ভুল ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে, কী বলো?'

আমি ওকে সমর্থন জানিয়ে আশ্বস্ত করলাম যে, ঘটনাটা নিঃসন্দেহে মনের ভুল। তারপর আমরা যখন সবার ঘরে ফিরে এলাম তখন আবার সবাই নতুন করে খেলা শুরু করবে বলে আমাদের দুজনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ব্যাপারটা আমার কল্পনা কিনা জানি না, তবে মনে হল, 'মি' খেলার সবরকম আগ্রহ ও উৎসাহ যেন সবার মন থেকে মিলিয়ে গেছে। যদি সেই মুহূর্তে কেউ অন্য কোনও খেলার প্রস্তাব দিত তা হলে বাজি রেখে বলতে পারি সকলে 'মি' খেলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। শুধু আমি কেন, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে আরও অনেকেই হয়তো বুঝতে পারছিল এ-বাড়িতে কোনও অশুভ প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কেন এরকম মনে হল? স্যাংস্টন বারোজনের জায়গায় তেরোজনকে গুনেছে বলে? নাকি তার ছেলে খালি আলমারিতে কারও হাতের ছোঁয়া পেয়েছে বলে? নাকি এসব ছাড়া আরও কিছু একটা আছে? যাই হোক, খেলা শুরু হল, এবং আমরা অজ্ঞাত 'মি'-কে ধাওয়া করে একইরকম হইহুল্লোড় তুলে ছুটোছুটি শুরু করলাম। কিন্তু মনে হল, আমাদের মধ্যে অনেকেই যেন অভিনয় করছে। খেলার আনন্দ কমে যাওয়ার কারণ নিশ্চয়ই সেই অস্বাভাবিক অনুভূতি। কেন জানি না, ভাবলাম, সবার সঙ্গে জোট বেঁধে 'মি'-কে খোঁজার পালা শেষ করি। কিন্তু মিনিটকয়েক পরেই খেলা

pathagar.net

জেতার প্রবল ইচ্ছেয় এবং 'মি'-কে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সর্বপ্রথম হওয়ার লোভে একাই দলছুট হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পশ্চিমপ্রান্তে দোতলার দেওয়াল ঘেঁষে যাওয়ার সময় একজোড়া হাঁটুর সঙ্গে আমার আচমকা সংঘর্ষ হল।

হাত বাড়াতেই একটা ভারি নরম পরদার স্পর্শ পেলাম। তখন বুঝলাম, আমি কোথায় এসেছি। এখানে দেওয়ালে গভীর খাঁজ কাটা লম্বা-লম্বা অনেকগুলো জানলা রয়েছে, আর জানলার সামনে মেঝে পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে নক্সা-কাটা পরদা। এইরকমই একটা জানলার তাকে পরদার পেছনে কোণ ঘেঁষে কেউ একজন বসে রয়েছে। হুঁ, তা হলে 'মি'-কে আমি ধরে ফেলেছি। সুতরাং পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম এবং আঙুলের স্পর্শে কোনও মহিলার নগ্ন বাহু অনুভব করলাম।

বাইরের রাত অন্ধকার, আর জানলাটা শুধু যে পরদা ঢাকা তা-ই নয়, ভেতরে শার্সির নীচে পর্যন্ত ঝুলছে ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড। ফলে পরদা আর জানলার মাঝের অন্ধকারে ছ'ইঞ্চি দূরে নিজের হাত রেখেও আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কোণে বসে থাকা মহিলাকে দেখা তো দূরের কথা।

'মি?' ফিসফিস করে জিগ্যেস করলাম।

কোনও উত্তর নেই। 'মি'-কে চ্যালেঞ্জ করলে সে উত্তর দেয় না। সুতরাং ওর পাশেই আমি বসে পড়লাম। দলের মধ্যে প্রথম হওয়ায় অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললাম, 'কে তুমি? তোমার নাম কি "মি"?'

আমার পাশের অন্ধকার থেকে ফিসফিসে উত্তর ভেসে এল, 'ব্রেন্ডা ফোর্ড।'

নামটা আমার অচেনা, কিন্তু সেই কারণেই আরও স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারলাম, মেয়েটি কে হতে পারে। সেই লম্বা শীতল অভিব্যক্তির তামাটে চেহারার মেয়েটিই এ-বাড়িতে একমাত্র অতিথি যার নাম আমি জানি না। সুতরাং আমার সঙ্গিনী ও ছাড়া আর কেউ নয়। ওর সম্পর্কে আমার কীরকম যেন ধারণা হয়েছিল, ও ঠিক হুল্লোড়বাজ প্রকৃতির নয়। এখন চাপা গলায় দু-একটা টুকিটাকি প্রশ্ন করলেও ওর কাছ থেকে কোনও উত্তর পেলাম না।

'মি' চুপচাপ থাকারই খেলা। 'মি' এবং অন্য যারা তাকে খুঁজে পাবে তাদের সকলেরই চুপ করে থাকার কথা, যাতে বাকি খেলোয়াড়রা সহজে তাদের খুঁজে না পায়। কিন্তু এখন তো ধারে-কাছে কেউ নেই, অথচ ব্রেন্ডা খেলার নিয়ম-কানুনগুলো বড় বেশি-বেশি মেনে চলছে। আবার কথা বলেও যখন কোনও উত্তর পেলাম না, তখন আমার কেমন বিরক্তি লাগল। মেয়েটি বোধহয় ঠান্ডা, নাক-উঁচু জাতের, পুরুষদের ঘৃণা করে। নিশ্চয়ই আমাকেও ওর ভালো লাগছে না। ফলে ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে মনে-মনে চাইলাম, সবাই আমাদের এক্ষুনি খুঁজে বের করে ফেলুক।

pathagar.net

ভাবতে অবাক লাগে, খাওয়ার টেবিলে যে-মেয়েটিকে প্রথম দেখে একইসঙ্গে কৌতূহল ও আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম, এখন তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। বরং এক অদ্ভুত ঘৃণা আমার মনের অতল থেকে পাক দিয়ে উথলে উঠছে গলা পর্যন্ত। জোর দিয়ে বলতে পারি, মেয়েটির নীরবতা এ-ঘৃণার কারণ নয়। অন্য কোনও কিছু। ওর অঙ্গাঙ্গী উপস্থিতি আমার কাছে যেন ক্রমে বেড়ে ওঠা এক আশঙ্কার চেহারা নিল। একান্ত প্রার্থনা শুরু করলাম, যাতে শিগগিরই কেউ এখানে চলে আসে।

প্রার্থনায় সাড়া মিলল। হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। দরজার ওপাশে কেউ আমার হাঁটু ছুঁয়ে গেল। তারপর ভারি পরদা সরে গেল একপাশে এবং একটি মেয়েলি হাত অন্ধকারে দিশেহারাভাবে ঘুরে-ফিরে এসে থামল আমার কাঁধে। ফিসফিসে গলায় কেউ জিগ্যেস করল, 'মি?'

সঙ্গে-সঙ্গে মিসেস গরম্যানকে চিনতে পারলাম।

স্বাভাবিকভাবেই কোনও উত্তর উনি পেলেন না। সুতরাং ভেতরে ঢুকে খসখস শব্দ তুলে আমার পাশে বসে পড়লেন। তারপর 'কে, টনি না?' চাপা গলায় উনি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ,' আমি ফিসফিস করে উত্তর দিলাম।

'তুমি "মি" হয়েছ?'

'না, যে হয়েছে সে আমার এপাশে বসে আছে।'

আমাকে ডিঙিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস গরম্যান। শুনতে পেলাম তাঁর হাতের নখ একটা রেশমী গাউনের ওপর আঁচড়ের শব্দ তুলল।

'কী খবর "মি"? কেমন আছ? কে তুমি? ওহ্ হো, কথা বলার তো নিয়ম নেই, তাই না? যাকগে, টনি, ওসব নিয়ম-টিয়ম ভালো লাগে না। জানো, এই খেলা খেলতে-খেলতে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। এর চেয়ে সব্বাই এক জায়গায় আগুনের ধারে বসে কিছু একটা খেললে কত ভালো হয়।'

'যা বলেছেন,' সাগ্রহে সায় দিলাম আমি।

'এবার নীচে গিয়ে অন্য কিছু একটা খেলার প্রস্তাব দাও না। এই খেলাটায় কেন জানি না গা-ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, এই খেলায় এমন একজন খেলোয়াড় আছে যার থাকার কথা নয়।'

আমারও একই কথা মনে হচ্ছিল, কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। আমরা এ-কথা সে-কথায় সময় কাটাতে লাগলাম।

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে জানি না, হঠাৎ কানে এল পায়ের শব্দ এবং পরক্ষণেই রেগির চিৎকার, 'এই যে, এখানে কেউ আছ নাকি?'

'হ্যাঁ আছি,' আমি উত্তর দিলাম।

'তোমার সঙ্গে মিসেস গরম্যান আছে?'

pathagar.net

'হ্যাঁ।'

'বাঃ, বেশ ভালো জুটি বেঁধেছ। তোমাদের দুজনকেই খেসারত দিতে হবে। তোমাদের জন্যে সেই থেকে আমরা অপেক্ষা করছি।'

'তা কেন, তোমরা তো "মি"-কে এখনও খুঁজে পাওনি!' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'তোমরা পাওনি বলো!' রেগি পালটা জবাব দিল, 'কারণ, এবারে আমিই "মি" হয়েছিলাম?'

'কিন্তু "মি"-তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে,' আমি চিৎকার করে উঠলাম!

'হ্যাঁ,' সমর্থন করলেন মিসেস গরম্যান।

পরদা সরে গেল একপাশে, এবং পরমুহূর্তেই আমরা রেগির টর্চের চোখে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে শুরু করলাম। আমি প্রথমে মিসেস গরম্যানের দিকে তাকালাম, তারপর চোখ ফেরালাম আমার অন্য পাশে। আমার আর দেওয়ালের মাঝে জানলার তাকে রয়েছে কিছুটা শূন্য জায়গা। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম, এবং মনে হল না দাঁড়ালেই ভালো হত—কারণ আমার মাথা ঘুরছে, ভীষণ দুর্বল লাগছে নিজেকে।

'এই তো, এখানে একটা মেয়ে ছিল,' আমি তবু বলে উঠলাম, 'আমি ওকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেছি।'

'আমিও—' মিসেস গরম্যানের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকতা হারিয়েছে।

রেগি অদ্ভুত কাঁপা গলায় হেসে উঠল। কারণ, সে-রাতে ওরও এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হয়েছে।

'কেউ নিশ্চয়ই মজা করে বেড়াচ্ছে,' সে মন্তব্য করল, 'নীচে আসছ তো?'

বসার ঘরে যখন পৌঁছলাম তখন আমরা আমাদের জনপ্রিয়তা মোটামুটি হারিয়েছি। রেগি একেবারে বোকার মতো বলে ফেলেছে যে, পরদার পিছনে জানলার তাকে বসা অবস্থায় সে আমাদের আবিষ্কার করেছে। আমি লম্বা তামাটে চেহারার মেয়েটিকে দেখিয়ে দোষারোপ করলাম। ও প্রথমে 'মি' হওয়ার ভান করে পরে চুপিচুপি সরে পড়েছে। মেয়েটি কিন্তু সে-কথা অস্বীকার করল। এরপর আমরা 'মি' খেলা ছেড়ে অন্য খেলায় মেতে উঠলাম।

কিছুক্ষণ পর ফাঁক পেয়ে স্যাংস্টন আমাকে সুরাপানে আহ্বান জানিয়ে ডেকে নিয়ে গেল ধূমপানের ঘরে। মনে হল, সে আমার ওপর কিছুটা বিরক্ত হয়েছে, এবং সে বিরক্তির কারণ স্পষ্ট হল তার পরবর্তী কথায়।

'টনি—' গম্ভীরভাবে শুরু করল ক্রিস্টোফার স্যাংস্টন, 'মিসেস গরম্যানের সঙ্গে পরদার আড়ালে বসে তুমি ফস্টিনস্টি করতে চাও করো—জোয়ান বয়সে আমারও এসব ভালো লাগত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সকলে মিলে খেলার মাঝে, সব্বাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওসব করতে হবে।'

pathagar.net

'কিন্তু সত্যিই ওখানে আর-একজন ছিল,' আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, ' ''মি'' হওয়ার ভান করছিল। আমার ধারণা, ওই লম্বা তামাটে চেহারার মেয়েটি, মিস ফোর্ড—ও-ই ছিল, কিন্তু এখন ফ্যাসাদে পড়ে সব অস্বীকার করছে। এমনকী ও ফিসফিস করে নিজের নামটা পর্যন্ত আমাকে বলেছে।'

স্যাংস্টন অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। মনে হল, মদের গ্লাসটা এখুনি তার হাত থেকে পড়ে যাবে।

'মিস—কী—কী নাম বললে?' সে চিৎকার করে জানতে চাইল।

'মিস ফোর্ড—ব্রেন্ডা ফোর্ড। এই নামই তো বলেছে মেয়েটা—।'

গ্লাসটা নামিয়ে আমার কাঁধে হাত রাখল স্যাংস্টন!

'শোনো ভাই,' সে বলল, 'ইয়ারকি-ঠাট্টা আমি পছন্দ করি, কিন্তু তার একটা সীমা আছে। বাড়ির সব মেয়েরা ভয়-টয় পেয়ে ফিট হয়ে পড়ুক তা আমি চাই না। কারণ দশ বছর আগে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে যে-মেয়েটা ঘাড় মটকে মারা যায়, তারই নাম ব্রেন্ডা ফোর্ড।'

pathagar.net

➤ *স্মি*

খোলা জানলা

অ্যামব্রোস বিয়ার্স

pathagar.net

১৮৩০ সালে এখানকার জমকালো শহর সিনসিনাটি থেকে কয়েকমাইল দূরে এক বিশাল গভীর জঙ্গল ছিল। সেখানে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করত সীমান্তের কিছু যাযাবর ধরনের মানুষ। একটা জায়গায় যখন তারা সংসার পেতে ফেলেছে, রুক্ষ জঙ্গলের মধ্যে তৈরি করে নিয়েছে সামান্য সুখ, তখনই কী এক অদ্ভুত নেশায় সেই সুখী আস্তানা ছেড়ে তারা রওনা হত অন্য জায়গায়, সেখানে আবার গড়ে তুলত অস্থায়ী আস্তানা। এরকম অনেকেই ওই জঙ্গলের বাস তুলে চলে গেছে অন্য কোথাও, কিন্তু বাকি কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিল নতুন আগন্তুক। চারিদিক ঘন জঙ্গলে ঘেরা একটা কাঠের বাড়িতে সে থাকত। জঙ্গলের নির্জনতা-নিস্তব্ধতা যেন তাকেও ঘিরে ফেলেছিল। কারণ, তাকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি, একটাও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে শোনেনি। সদরে গিয়ে বন্য জন্তুর ছাল বিক্রি করে বা বিনিময় করে সে তার দরকারি জিনিসপত্রের সংস্থান করত।

লোকটির নাম মার্লক বলেই জানতাম। দেখে তার বয়েস মোটামুটি সত্তর মনে হলেও, আসলে ছিল পঞ্চাশ। শুধু বয়সের ভার ছাড়াও অন্য কিছু তাকে বৃদ্ধ করে তুলেছিল। তার লম্বা চুল, ঘন দাড়ি, সবই ছিল ধবধবে সাদা। জ্যোতিহীন ধূসর চোখ দুটো কোটরে বসানো। সারামুখে অসংখ্য ভাঁজের জটিল আঁকিবুকি। এমনিতে তার চেহারা ছিল লম্বা, তবে কাঁধ দুটো একটু ঝুঁকে পড়েছে—হয়তো দীর্ঘকাল বোঝা বওয়ার পরিণাম। তাকে আমি কখনও দেখিনি। এসবই শুনেছি আমার ঠাকুরদার কাছে—তখন আমি খুব ছোট।

একদিন মার্লককে তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। আদালত বা খবরের কাগজে হইচই হওয়ার মতো ঘটনা কিছু নয়। সকলেই একমত হল যে, স্বাভাবিকভাবেই সে মারা গেছে। তা যদি না হত, আমি ঠিক জানতে পারতাম, আর মনেও রাখতাম। আমি শুধু এটুকু জানি যে, তাকে তার কুটিরের কাছাকাছি তার স্ত্রীর কবরের পাশে কবর দেওয়া হয়। মার্লকের স্ত্রীর মৃত্যু ততদিনে এত পুরোনো হয়ে গেছে যে, স্থানীয় লোকেরা তার কথা প্রায় ভুলতে বসেছে। এটাই হল এই সত্যকাহিনির শেষ অধ্যায়। অবশ্য এর বহু বছর পরে আমি জঙ্গল ভেদ করে ওই জায়গায় গিয়েছি এবং ঘরের ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি গিয়ে পাথর ছুড়ে ছুটে পালিয়েছি। কারণ, সব ছেলেরাই বলত ওখানে নাকি ভূত আছে।

কিন্তু এই শেষ অধ্যায়ের আগে আরও একটা অধ্যায় আছে—আমার ঠাকুরদার কাছে শোনা।

আস্তানা তৈরি করার পর মার্লক যখন কুড়ুল হাতে আশেপাশে চাষবাসের কাজ শুরু করেছিল, তখন তার বয়স ছিল অল্প, দেহে শক্তি ছিল, মনে ছিল আশা। ওই পূর্বাঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করার পর রেওয়াজ মতো সে-ও বিয়ে করেছিল। তার বউ ছিল যুবতী, একনিষ্ঠ, আর বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ সবকিছুই সে হাসিমুখে স্বামীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিত। বউটির নাম কী ছিল কেউ জানে না। তার শরীর ও মনের সৌন্দর্য সম্পর্কেও কিছু শোনা যায়নি। যদি সে-বিষয়ে কেউ সন্দেহ করতে চায় করুক, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু ঈশ্বর না করুন, আমার মনে সে-সন্দেহ কোনওদিনই ঠাঁই পায়নি। বিপত্নীক মার্লকের প্রতিটি নতুন দিন তাদের ভালোবাসা আর সুখী জীবন সম্পর্কে সকলের মনে নতুন করে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলত।

একদিন বন্দুক নিয়ে দূরে শিকার করতে গিয়েছিল মার্লক। ফিরে এসে দেখল, তার বউ জ্বরে শয্যাশায়ী, প্রলাপ বকছে। বাড়ির কয়েক মাইলের মধ্যে কোনও ডাক্তার তো দূরের কথা একটি প্রতিবেশীও ছিল না। বউয়ের এমনই অবস্থা যে, তাকে একা ফেলে রেখে মার্লক সাহায্যের আশায় বেরিয়ে পড়বে তার উপায় নেই। সুতরাং মার্লক ঠিক করল, সে নিজেই শুশ্রূষা করে বউকে সারিয়ে তুলবে। কিন্তু তিনদিনের দিন তার স্ত্রী জ্ঞান হারাল এবং বিদায় নিল চিরকালের মতো।

যখন মার্লক নিঃসন্দেহ হল যে, তার বউ মারা গেছে, তখন সে তাকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। কিন্তু অতি সাধারণ কাজগুলো করতে গিয়েও সে ব্যর্থ হল। তখন সে নিজেই অবাক হল—যেমন, রোজকার সাধারণ নিয়মকানুনগুলো কোনও নেশাগ্রস্ত মাতালকে অবাক করে দেয়। আরও একটা জিনিস তাকে অবাক করল : প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে তার কান্না পায়নি। মৃতের প্রতি একী অন্যায় অবিচার! সে আপনমনেই বলে উঠল, কাল কফিন তৈরি করে কবর খুঁড়ব। তারপর ওর জন্যে দুঃখ করব—যখন ও আমার চোখের সামনে থাকবে না। কিন্তু এখন—ও মারা গেছে ঠিকই, কিন্তু সবকিছু যেন আগের মতোই রয়েছে—কেন, তা জানি না। যতটা মনে

হয় জীবন আসলে বোধহয় ততটা দুঃখের নয়।

আবছা হয়ে আসা আলোয় সে মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কখনও চুলের গুচ্ছ পরিপাটি করে দিচ্ছে, কখনও ঠিক করে দিচ্ছে প্রসাধন। সবকিছুই কেমন নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকভাবে করে চলল সে। বারবারই তার মনে হতে লাগল, কোনও ক্ষতি হয়নি, সবকিছু বরাবরের মতোই আছে, তার বউ রয়েছে তার কাছে।

বিভিন্ন মানুষের শোকের প্রকাশ বিভিন্ন। শোকসঙ্গীতের সুর-লহরীর বিভিন্ন মূর্ছনার মতোই তার প্রভাব মানুষ থেকে মানুষে বিভিন্ন। মার্লকের শোক বোবা করে দিয়েছিল তাকে। একটা গুরুতর আঘাত তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ফলে একসময় ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল সে—শরীর ও মন দুই-ই হয়ে পড়ল অবসন্ন। সুতরাং ধর্মীয় আচার-রীতি শেষ করে সে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। সামনেই টেবিলের ওপরে শোয়ানো তার স্ত্রীর মৃতদেহ। ঘন হয়ে আসা অন্ধকারে ওর ফ্যাকাসে সাদা মুখমণ্ডল স্পষ্ট নজরে পড়ছে। টেবিলে হাত রেখে তাতে মাথা গুঁজে দিল মার্লক। চোখে তার অশ্রু নেই, কিন্তু শোকে অপরিসীম ক্লান্ত। সেই মুহূর্তে খোলা জানলা দিয়ে ভেসে এল এক সুদীর্ঘ আর্তচিৎকার—যেন অন্ধকার হয়ে আসা জঙ্গলের গভীর থেকে হারানো কোনও শিশু চিৎকার করে কাঁদছে। কিন্তু মার্লক নড়ল না। আবার, আরও কাছ থেকে, সেই অপার্থিব চিৎকার এসে আঘাত করল তার বিবশ অনুভূতিতে। হয়তো কোনও বন্য জন্তু, নয়তো কোনও স্বপ্ন। কারণ, মার্লক তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে কর্তব্য-ভ্রষ্ট প্রহরীর ঘুম ভাঙল। হাত থেকে মাথা তুলে সে কান খাড়া করে শুনতে লাগল—কেন, তা সে জানে না। মৃতদেহের পাশে গাঢ় কালো অন্ধকারে তাকিয়ে সে অতি কষ্টে কিছু যেন দেখতে চেষ্টা করল—কী তা জানে না। তার সমস্ত অনুভূতি সজাগ হয়ে উঠেছে, শ্বাস-প্রশ্বাস থমকে দাঁড়িয়েছে, এবং সেই নিস্তব্ধতাকে আরও সূক্ষ্ম করতে তার শিরা-উপশিরার রক্তস্রোত যেন মুহূর্তে গতিহীন হয়ে গেছে। কে—কী তাকে জাগিয়ে তুলল? কোথায় সেটা?

হঠাৎই তার হাতের নীচে টেবিলটা কেঁপে উঠল এবং সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পেল, অথবা মনে হল যেন শুনতে পেল, একটা হালকা নরম পায়ের শব্দ—।

যেন খালি পায়ে কেউ ঘরের মেঝেতে চলে বেড়াচ্ছে।

আতঙ্কে সে স্থবির হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে শুধু অপেক্ষা করতে লাগল—যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলল সেই অন্ধকারে প্রতীক্ষা। সে মৃত বউয়ের নাম ধরে ডাকতে ব্যর্থ চেষ্টা করল, হাত বাড়িয়ে দেখতে চাইল ও টেবিলে আছে কি না। কিন্তু তার প্রতিটি অঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে। গলা স্বরহীন, হাত দুটো যেন সীসের তৈরি।

পরক্ষণেই ঘটে গেল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। একটা ভারি দেহ যেন ছিটকে পড়ল টেবিলের গায়ে। সেই ধাক্কার জোরে টেবিলটা এসে আঘাত করল মার্লকের বুকে, আর-একটু হলেই সে উলটে পড়ত চেয়ার থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে কিছু একটা ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। সেই শব্দে আর আঘাতে গোটা বাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে

উঠল। একটা ধস্তাধস্তি শুরু হল।

মার্লক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্কে সে তার শরীরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলেছে। আচমকা সে হাত বাড়াল টেবিলের দিকে। কিন্তু দেখল, টেবিলে কেউ নেই।

এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন আতঙ্ক বাঁক নেয় পাগলামির দিকে। এবং সেই পাগলামি রূপ নেয় সক্রিয় আচরণে। কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কিংবা কারণ ছাড়াই মার্লক পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের দেওয়ালে, হাতড়ে খুঁজে নিল টোটা ভরা বন্দুকটা, এবং নিশানা না করেই গুলি করল। বন্দুকের আগুনের ঝলকে অন্ধকার ঘরটি আলোকিত হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্য। সেই আলোয় মার্লক দেখল একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ তার মৃত বউকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জানলার দিকে। জন্তুটার ধারালো দাঁত গেঁথে আছে মৃতদেহের গলায়। আবার পরমুহূর্তেই সব অন্ধকার। এ-অন্ধকার যেন আগের চেয়েও গভীর। সেইসঙ্গে নিটোল নিস্তব্ধতা।

যখন আবার তার জ্ঞান ফিরল তখন সূর্য আকাশের অনেকটা ওপরে উঠে গেছে, বনাঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে পাখির কাকলিতে।

সে দেখল মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে জানলার কাছে। বন্দুকের শব্দে ও আলোয় ভয় পেয়ে প্রাণীটা মৃতদেহ ফেলে রেখেই পালিয়ে গেছে। মৃতদেহের পোশাক-পরিচ্ছদ অগোছালো, লম্বা চুল উসকোখুসকো, হাত-পা যেমন-তেমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। মৃতের গলায় একটা কুৎসিত ক্ষত, সেখান থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। এখনও জমাট বাঁধেনি। সে ফিতে দিয়ে সে বউয়ের হাত দুটো বেঁধে দিয়েছিল সেটা ছিঁড়ে গেছে। হাত দুটো শক্ত করে মুঠো করা। আর বউয়ের দাঁতের ফাঁকে আটকে রয়েছে জন্তুটার কানের একটা টুকরো।

➤ *দ্য বোর্ডেড উইন্ডো*

কোনও গ্রীষ্মের রাতে

অ্যামব্রোস বিয়ার্স

pathagar.net

হেনরি আর্মস্ট্রং বেশ ভালোই বুঝতে পারল তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে মারা গেছে। কারণ, হেনরিকে কিছু একটা বিশ্বাস করানো নেহাত সহজ ব্যাপার নয়। নিতান্ত যুক্তিভিত্তিক না হলে সে কোনও কিছু মানতে রাজি নয়। তাকে যে সত্যি-সত্যিই কবর দেওয়া হয়েছে, সেটা কিঞ্চিৎ পরীক্ষার পর মানতে বাধ্য হয়েছে হেনরি। এখন সে শুয়ে আছে চিত হয়ে। হাত দুটো আড়াআড়িভাবে পেটের ওপরে রাখা। চারদিকে ঘন জমাট অন্ধকার। তার সারা শরীরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে কোনও পলকা বাঁধন। সামান্য চাপ দিতেই সে বাঁধন ছিঁড়ে গেল। হাত দুটোকে অনুসন্ধানে পাঠিয়ে হেনরি অনুভব করল সে একটা চৌকো বাক্সের মধ্যে বন্দি। মাথা থেকে ইঞ্চি কয়েক ওপরেই হাত ঠেকল শক্ত কাঠের দেওয়ালে। অতএব এতসব পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তেই সে এসেছে—হেনরি আর্মস্ট্রং নামক জনৈক ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় একটি কফিনের মধ্যে শুয়ে আছে।

না, হেনরি যে এখনও মরেনি সে-বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু—।

নিজের অবস্থাটা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখল সে। না, চেঁচামেচি করে কোনও লাভ নেই। এই বদ্ধ কফিনের কোনও শব্দ পৌঁছবে না বাইরের পৃথিবীতে। সুতরাং এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সে উদাসীনভাবে শুয়ে রইল। সারা শরীরে এক অদ্ভুত অবসাদ। ক্লান্তি আর হতাশায় হেনরির চোখ বুজে এল। শান্তি, শুধু একটু মানসিক শান্তি তার প্রয়োজন।

কিন্তু হেনরির কাছ থেকে ঠিক সাত ফুট ওপরে শুরু হয়েছে আর-এক নাটক। কোনও গ্রীষ্মের এক অন্ধকার গভীর রাত। আকাশের মেঘ চিরে মাঝে-মাঝে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের উজ্জ্বল রেখা। ঝোড়ো হাওয়া আর ঝরাপাতার শব্দে সারা কবরখানায় জেগে উঠছে কোনও অশরীরীর অপার্থিব দীর্ঘশ্বাস। আচমকা বিদ্যুৎ-আলোকে মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে সার বাঁধা সাদা পাথরগুলো। যেন পাথর চাপা দিয়ে অতৃপ্ত আত্মাদের বাইরে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টি আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই। ঝোড়ো হাওয়ার ঠান্ডা পরশে বুঝি তারই ইঙ্গিত। সাধারণ কোনও মানুষ স্বেচ্ছায় এ-দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে চাইবে না। এই কবরের রাজ্যে পা রাখতে তাদের বুকে জাগবে আতঙ্কের ঢেউ। হয়তো সেই কারণেই বেশ নিশ্চিন্ত মনে তিনটি ছায়ামূর্তি ঝুঁকে পড়েছে হেনরি আর্মস্ট্রং-এর কবরের ওপরে। একমনে খুঁড়ে চলেছে কবরের নরম মাটি।

তিনজনের দুজন কাছাকাছি কোনও মেডিকেল কলেজের অল্পবয়েসি ছাত্র। তৃতীয়জন এক বিশাল চেহারার নিগ্রো, নাম তার জেস। বহু বছর ধরে জেস এই কবরখানায় কাজ করছে। আজ পর্যন্ত কোনও কাজেই সে অরাজি হয়নি। তা ছাড়া এই কবরখানার প্রতিটি আত্মার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে বলে সে গর্ব করত। কিন্তু তার বর্তমান কার্যকলাপে আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের এক স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এই কবরখানায় মৃত বাসিন্দার সংখ্যা খুব বেশি নয়। সুতরাং জেসের আয় স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

কবরখানার দেওয়ালের বাইরে, বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, দাঁড়িয়ে ছিল একটা ছোট ঘোড়ায় টানা গাড়ি। বোধহয় ওদেরই অপেক্ষায়।

মাটি খুঁড়তে ওদের তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। কারণ, হেনরিকে কবর দেওয়া হয়েছে আজই, মাত্র ঘণ্টা-পাঁচেক আগে। আলগা মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে ওরা পৌঁছে গেল কফিনের কাছে। সাত ফুট নীচ থেকে কফিনটা ওপরে তুলে নিয়ে এল। অন্ধকারে কিছুটা অনুমানেই ওদের কাজ সারতে হচ্ছে। কফিনটা তোলা হয়ে গেলে জেস হাতুড়ি আর ছেনি নিয়ে সশব্দে আঘাত করল কফিনের ঢাকনার ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুলে গেল কফিনের ঢাকনা। ওটা পাশে সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল কালো প্যান্ট সাদা জামা পরা হেনরি আর্মস্ট্রং-এর শুয়ে থাকা দেহ।

সেই মুহূর্তেই আকাশের বুক চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ; ঝোড়ো হাওয়ায় পলকে যেন আগুন লেগে গেল। নিস্তব্ধ পৃথিবীটা হঠাৎই যেন কেঁপে উঠল ঝরাপাতার ফিসফিস শব্দে, এবং আচ্ছন্ন অবস্থাতেই কফিনের ভেতরে উঠে বসল হেনরি আর্মস্ট্রং-এর দেহটা। এক বিকট আর্তচিৎকার করে ওদের দুজন অন্ধ উন্মাদের মতো ছুটে পালাতে শুরু করল। তাদের কর্কশ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল কবর থেকে কবরে। কিন্তু তৃতীয়জন রইল স্থির, অবিচল। কারণ, জেস অন্য ধাতুতে গড়া।

ভোরের আবছা আলো ফুটে উঠেছে পুব আকাশে। ছাত্র দুজন বিবর্ণ আতঙ্ক-বিকৃত মুখে ফিরে চলেছে মেডিকেল কলেজের দিকে। গত রাতের মৃত্যু-শীতল

pathagar.net

অভিজ্ঞতা ওদের রক্তে এখনও শিহরণের ঢেউ তুলছে। শ্লথ পায়ে ওরা এসে থামল মেডিকেল কলেজের সামনে।

'তুই ঠিক দেখেছিলি?' জানতে চাইল একজন।

'কী বলছিস তুই! স্পষ্ট দেখেছি। কিন্তু এখন কী করবি?'

ওরা পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল বাড়িটার পিছন দিকে। অবাক হয়ে দেখল, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি—ঠিক ওদের ব্যবচ্ছেদ-ঘরের সামনে। যান্ত্রিকভাবে ওরা ঢুকল ব্যবচ্ছেদ-ঘরে। একটা টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল নিগ্রো জেস। ওদের পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকাল। একগাল হেসে ঝকঝকে দাঁতের সারি বের করে উঠে দাঁড়াল সে: 'সেই কখন থেকে টাকার জন্যে অপেক্ষা করছি, স্যার।'

ব্যবচ্ছেদের টেবিলের ওপরে শোয়ানো রয়েছে হেনরি আর্মস্ট্রং-এর দেহ। তার মাথা রক্তে-কাদায় মাখামাখি। বেলচার আঘাতে কেউ ওটাকে আলাদা করে ফেলেছে ধড় থেকে।

pathagar.net

➤ *ওয়ান সামার নাইট*

অপমৃত্যু

অ্যামব্রোস বিয়ার্স

pathagar.net

'তোমাদের কিছু-কিছু ডাক্তারদের মতো আমার মনে এত কুসংস্কার নেই। ডাক্তার—অর্থাৎ, বিজ্ঞানের লোক বললে তোমরা তো আরও খুশি হও,' এক কাল্পনিক অভিযোগের উত্তরে হর্ডার বলল, 'তোমাদের কেউ-কেউ—তাদের সংখ্যা খুব সামান্যই, স্বীকার করছি—বিশ্বাস করে আত্মা অবিনশ্বর, তার অলৌকিক অস্তিত্ব আছে, অথচ সেটাকে সোজা কথায় ভূত বলে স্বীকার করার সৎসাহস নেই। আমি নিজে এটুকু বিশ্বাস করি, কোনও মানুষকে অনেক এমন-এমন জায়গায় দেখা যায় যেখানে আসলে সে অনুপস্থিত—কিন্তু কোনও সময় সে সেখানে থাকত। চতুর্দিকের প্রতিটি জিনিসপত্রে রেখে গেছে নিজের উপস্থিতি ও বসবাসের গভীর ছাপ।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দীর্ঘকাল কোনও জায়গায় বসবাস করলে সেই পরিবেশে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়ে, আর বহুদিন পর অন্য কারও চোখে সেই ব্যক্তিত্বের ছায়া ধরা পড়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য এ-কথা ভুললে চলবে না, সেই ব্যক্তিত্ব হতে হবে সেরকম সঠিক জাতের এবং যে-চোখ দেখবে, তাকেও হতে হবে ঠিক জাতের চোখ—যেমন ধরো, আমার।'

'হুঁ, ঠিক জাতের চোখ, যা ভুল জাতের মস্তিষ্কে খবর পাঠাবে,' মৃদু হেসে বললেন ডাক্তার ফ্রেলি।

'ধন্যবাদ, প্রত্যাশা পূর্ণ হলে লোকে খুশি হয়। আমি ঠিকই আশা করেছিলাম, তোমার ভদ্রতাবোধ অনুযায়ী এইরকমই একটা উত্তর তুমি দেবে।'

'মাপ করো। কিন্তু তুমি তো বলেছ, এ তোমার বিশ্বাস। এটা একটু বাড়াবাড়ি

হয়ে গেল না? যদি কিছু মনে না করো, তা হলে এই বিশ্বাসের ভিত্তিটা জানতে পারি?'

'তুমি হয়তো সেটাকে অলীক কল্পনা বলবে,' হভার বলল, 'কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই...' তারপর সে কাহিনি শুরু করল।

'তুমি হয়তো জানো, গত গ্রীষ্মে আমি মিরিডিয়াম নামে এক গাঁয়ে গরমের দিন ক'টা কাটাতে গিয়েছিলাম। যে-আত্মীয়ের বাড়িতে উঠব ঠিক করেছিলাম, তিনি ঘটনাচক্রে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে আমাকে নতুন আস্তানার খোঁজে বেরোতে হল। অবশেষে, অনেক কষ্টে, একটা খালি বাড়ি ভাড়া পেলাম। বাড়িটায় এর আগে ম্যানারিং নামে এক আধপাগলা ডাক্তার থাকতেন। কিন্তু বহু বছর ধরে তিনি নিরুদ্দেশ। কোথায় গেছেন কেউ জানে না—এমনকী বাড়ির দালালও না। বাড়িটা তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন এবং এক বুড়ো চাকরকে নিয়ে প্রায় দশ বছর সেখানে ছিলেন। বাড়িতে আসার বছর কয়েক পরে নিজের যেটুকু পসার ছিল সেটুকুও বিসর্জন দিয়ে ডাক্তার ম্যানারিং রোগী দেখা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, সামাজিক মেলামেশা থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে বাড়িতে বসে নির্বাসনে দিন কাটাতে লাগলেন। শুধুমাত্র গাঁয়ের ডাক্তারের সঙ্গেই তাঁর সামান্য যোগাযোগ ছিল। তাঁর মুখেই শুনেছি, নির্বাসনে থাকাকালীন কেবল একটি মাত্র বিষয়ে গবেষণার জন্যে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, এবং সেই গবেষণার ফল ব্যাখ্যা করেছিলেন একটা বইয়ে। সেই বইটি ডাক্তার ম্যানারিং-এর পেশাগত সতীর্থদের সপ্রশংস সমর্থন পায়নি। কারণ, তারা তাঁকে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে করত না। বইটি আমি দেখিনি, তার নামটাও ঠিক মনে করতে পারছি না। কিন্তু শুনলাম, সে-বইয়ে নাকি এক আশ্চর্য তত্ত্বের কথা লেখা ছিল। লেখকের মতে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বহু মানুষের ক্ষেত্রেই অন্তত কয়েক মাস আগে তাদের মৃত্যু সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। তার সময়সীমা ছিল, যতদূর মনে পড়ছে, আঠেরো মাস। প্রচলিত কাহিনি থেকে জানতে পারি, ডাক্তার ম্যানারিং অনেকবারই তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন—অবশ্য, তুমি হয়তো—একে রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা বলবে। শোনা যায়, প্রতিবারই যে-লোকের বন্ধু-বান্ধবকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, সে হঠাৎই কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ঠিক নির্ধারিত সময়ে মারা গেছে। কিন্তু যে-কথা আমি বলতে চলেছি তার সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই; ভাবলাম, কোনও ডাক্তার হয়তো এতে মজা পেতে পারে—তাই বললাম।

'বাড়িটা সাজানো-গোছানো, ঠিক যেমনটি তাঁর সময়ে ছিল। কিন্তু এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ঘন হয়ে চারপাশ ছেয়ে আছে। আমার মনে হয় বাড়িটার চরিত্রের প্রভাব আমার ওপরেও কিছুটা পড়ে থাকবে—হয়তো ভূতপূর্ব বাসিন্দার প্রভাবও বাদ যায়নি; কারণ, সবসময়েই এক বিষণ্ণতা আর অবসাদ আমাকে ঘিরে থাকত। এ আমার স্বভাবের বিপরীত, এবং জানি, শুধু নিঃসঙ্গতা এর একমাত্র কারণ নয়। কোনও চাকরবাকর

রাতে আমার সঙ্গে বাড়িতে শুত না। কিন্তু তুমি তো জানো, গল্প-উপন্যাস পড়তে আমি কীরকম ভালোবাসি, আর তাই নিয়েই থাকতাম। সে কারণ যা-ই হোক, সব মিলিয়ে এক আসন্ন অশুভ ইঙ্গিত যেন গোটা বাড়িময় চলে-ফিরে বেড়াত। এটা আরও বেশি করে অনুভব করতাম ডাক্তার ম্যানারিং-এর পড়ার ঘরে; অথচ আশ্চর্য, বাড়ির মধ্যে ওই ঘরটিতেই আলো-হাওয়া ছিল সবচেয়ে বেশি। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে ডাক্তারের পূর্ণ আকৃতির তেলরং ছবি, এবং গোটা ঘরটার আনাচেকানাচে পর্যন্ত যেন ছড়িয়ে আছে তাঁর তীব্র ব্যক্তিত্বের প্রভাব। ছবিটায় অস্বাভাবিক কিছু নেই; ভদ্রলোকের চেহারা সুন্দর, বয়েস বছর পঞ্চাশ, মাথায় ধূসর চুল, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ ও কালো অন্তর্ভেদী চোখ। ছবির কী একটা জিনিস যেন সবসময় আমাকে কাছে টানত, আমাকে মুগ্ধ করে রাখত। মানুষটার চেহারা ক্রমশ আমার খুব চেনা হয়ে গেল—বলতে গেলে, দিন-রাত আমার চোখের সামনে ভাসত।

'একদিন সন্ধেবেলা লণ্ঠন হাতে ওই ঘরের মধ্যে দিয়ে শোওয়ার ঘরে যাচ্ছিলাম —এখানে বলে রাখা ভালো, মিরিডিয়ামে গ্যাসের আলো নেই—যেতে-যেতে বরাবরের মতোই ছবিটার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। লণ্ঠনের আলোয় ছবিটায় যেন এক নতুন অভিব্যক্তি খুঁজে পেলাম। সে-অভিব্যক্তির নাম দেওয়া সহজ নয়, তবে তা অবশ্যই অপার্থিব। কৌতূহলী হয়ে উঠলেও ভয় আমি পাইনি। ভিন্ন দিক থেকে আলো ফেললে কী হয় তা দেখার জন্যে লণ্ঠনটাকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিয়ে গেলাম। এই কাজে যখন ব্যস্ত ছিলাম, তখন হঠাৎ পেছনে ঘুরে দেখার এক তীব্র ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসল। ঘুরে তাকাতেই দেখি একজন লোক ঘরের বিপরীত প্রান্ত থেকে সরাসরি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতেই লণ্ঠনের আলোয় তার মুখ আলোকিত হল; দেখলাম সে আর কেউ নয়, স্বয়ং ডাক্তার ম্যানারিং; তাঁর তেলরঙ ছবিটা হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে চলে বেড়াচ্ছে।

' "মাপ করবেন," 'অপেক্ষাকৃত শীতল স্বরেই বললাম, "আপনার কড়া নাড়ার শব্দ আমি হয়তো ঠিক শুনতে পাইনি।"

'আমাকে অতিক্রম করে তিনি হাতখানেক দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডান হাতের তর্জনি তুলে ধরলেন আমার দিকে—সাবধান করে দেওয়ার ভঙ্গিতে। তারপর একটিও কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়া তাঁর আবির্ভাবের মতোই রহস্যময় হয়ে রইল আমার কাছে।

'অবশ্য এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তোমার ভাষায় এ হল অলীক কল্পনা, আর আমি বলব অপচ্ছায়া। সেই ঘরটায় মাত্র দুটো দরজা ছিল, তার মধ্যে একটা ছিল বন্ধ; আর অন্যটি শোওয়ার ঘরে যাওয়ার। শোওয়ার ঘরে আর কোনও দ্বিতীয় দরজা ছিল না। এটা উপলব্ধি করার পর আমার মনের অবস্থা কী হল সেটা এ-ঘরের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

'নিঃসন্দেহে তোমার হয়তো মনে হচ্ছে এ নিতান্তই কোনও সাদামাঠা ভুতুড়ে

গপ্পো—ভৌতিক গল্পে পণ্ডিত সাহিত্যিকদের চেনা ছকে সাজানো। তাই যদি হত তা হলে সত্য ঘটনা হলেও এ-গল্প তোমাকে আমি শোনাতাম না। আসলে ওই ভদ্রলোক মোটেই মারা যাননি; আজ আমি তাঁকে ইউনিয়ন স্ট্রিটে দেখেছি। ভিড়ের মধ্যে উনি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।'

হভারের গল্প শেষ হলে ওরা দুজনেই চুপচাপ বসে রইল। ডাক্তার ফ্রেলি অন্যমনস্কভাবে টোকা মেরে চললেন।

'উনি কি কিছু বললেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এমন কিছু, যা শুনে তুমি বলছ উনি বেঁচে আছেন?'

হভার একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

ফ্রেলি বলে চললেন, 'হয়তো উনি কোনও ইঙ্গিত বা ইশারা করেছেন—সাবধান করে আঙুল তুলে দেখিয়েছেন। হতে পারে এটা তাঁর নিজস্ব কায়দা ছিল—গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার সময় হয়তো এই ভঙ্গি করতেন—এই ধরো, রোগ নির্ণয় করে রোগের নাম বলার সময়।'

'হ্যাঁ, হয়তো তাই—যেমন তাঁর অপচ্ছায়া ইঙ্গিত করেছিল সেই বাড়িতে। কিন্তু আশ্চর্য! তুমি কি তাকে চিনতে? কখনও দেখেছ?'

হভার ক্রমে যেন বিচলিত হয়ে উঠতে লাগল।

ডাক্তার ফ্রেলি বললেন, 'হ্যাঁ, চিনতাম। তাঁর বইটাও আমি পড়েছি—সে-বই একদিন পৃথিবীর প্রতিটি ডাক্তার পড়বে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর গবেষণা এ-শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংযোজন। আমি তাকে ভালো করেই চিনতাম। তিন বছর আগে অসুখে পড়ে তিনি আমাকে ডেকেছিলেন তাঁর চিকিৎসা করতে। তখনই তিনি মারা যান।'

হভার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ওর বিচলিত ভাব প্রকট হয়ে পড়ল। চিন্তিতভাবে ঘরে এপাশ-ওপাশ পায়চারি করতে লাগল। তারপর ফিরে এল বন্ধুর কাছে, অস্থির কাঁপা গলায় বলল, 'ডাক্তার, আমাকে আর কিছু বলার থাকলে বলো—অন্তত ডাক্তার হিসেবে।'

'না, হভার, ভয় পেয়ো না। তোমার স্বাস্থ্যের তুলনা নেই। বন্ধু হিসেবে তোমাকে পরামর্শ দিই, ঘরে যাও। বেহালা বাজাতে তোমার জুড়ি নেই। ঘরে গিয়ে বেহালা বাজাও; বাজাও কোনও প্রাণবন্ত সুর। এই অভিশপ্ত ঘটনা মন থেকে একেবারে মুছে ফ্যালো।'

পরদিন হভারকে ওর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। কাঁধে বেহালা, ছড় তারের ওপরে বসানো, সামনে খোলা স্বরলিপি বইয়ের পাতায় শপাঁর শবানুগমনের সঙ্গীত।

লাল ছড়ি

ই. এফ. বোজম্যান

pathagar.net

ওর কালজয়ী মুখে পরিশ্রমী স্বাধীন জীবনের সৌন্দর্য নিঃস্বার্থভাবে ছড়িয়ে আছে। অন্তত প্রথম দেখায় আমার তাই মনে হয়েছিল। কারখানাগুলোর কাছ থেকে নির্জন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাওয়া রাস্তার উজ্জ্বল নিওন আলোর নীচে ওকে প্রথম দেখি। কর্মব্যস্ত শিল্প-অঞ্চল ও ধূ-ধূ প্রান্তরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এই নির্জন গভীর জঙ্গল।

সময়টা ডিসেম্বরের কুয়াশাঘেরা এক সন্ধ্যা। শত-শত গাড়ি, স্কুটার, বাস ঝাঁকে-ঝাঁকে নানান কারখানা থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলেছে শহরের বসতি অঞ্চলের দিকে। বহুদিন পর ব্যাবসার কাজে এই জেলায় আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে, এবং মনে-মনে ঠিক করেছি, কারখানাগুলো বন্ধ হলেই আমার এক পুরোনো প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাব। তিরিশ বছর ওর সঙ্গে আমার দেখা নেই। ওর বাড়িতে পৌঁছনোর সবচেয়ে সহজ পথ জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অসংখ্য হিজিবিজি মেঠো পথের একটি।

কারখানা থেকে পাকা রাস্তা ধরে শ'খানেক গজ গেলাম, তারপর ভাসা-ভাসা মনে পড়া একটা মেঠো পথে মোড় নিলাম। গাছ আর ঝোপের ফাঁক দিয়ে বহুদূরের বাড়িগুলোর আলোকিত জানলার বিন্দুগুলো জোনাকির মতো ক্ষণেকের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যেতে লাগল। বেশ ভালো করেই জানি, এ ছাড়া বাকি পথটুকু আর কোনও আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে না। পথটা চিনে যেতে খুব একটা কষ্ট হল না, কারণ যেখানেই বুনো ঝোপঝাড় রাস্তায় উপচে পড়বে বলে হুমকি দিয়েছে সেখানেই

মেঠো পথটুকু অ্যাসফাল্ট দিয়ে বাঁধিয়ে কৃত্রিমভাবে রক্ষা করা হয়েছে।

পাকা রাস্তা পেছনে ফেলে যখন এ-পথটা ধরেছি তখন ভীষণ অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এ-পথ শুধু আমি একাই বেছে নিইনি। ফিরে তাকিয়ে ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকারেও একটু আগের পলকে দেখা কালজয়ী মুখটিকে চিনতে পারলাম।

'খুব ঠান্ডা পড়েছে,' বলে একটু থমকে দাঁড়ালাম, ছায়া-শরীরকে আমার পাশাপাশি আসতে সময় দিলাম।

'যা বলেছেন,' উত্তর এল, এবং ছোটখাটো বলিষ্ঠ গড়নের জনৈকা মহিলা আমার পাশে এসে হাজির হল ঃ 'দেখবেন, আজকের রাতটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে।'

'এই জঙ্গলটুকু আপনার সঙ্গে গেলে কোনও আপত্তি আছে? পথটা যা নির্জন তাতে কোনও মহিলার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

'আপনার ইচ্ছে থাকলে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। আমার এসব অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'যা দিনকাল পড়েছে তাতে শত সাবধান হয়েও নিস্তার নেই। কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন, কিছু উটকো লোক এ-অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'এ-পথে আমি একাই যাতায়াত করি—দিনে, রাতে, সবসময়ে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ আমাকে অসম্মান করার চেষ্টা করেনি—যদি করত, তা হলে উপযুক্ত শিক্ষাই পেত। অবশ্য আমার হাতে সবসময় একটা লাঠি থাকে।'

অন্ধকার সত্ত্বেও ওর হাতের কালো রঙের ছড়িটা আমার নজরে পড়ল। বুঝলাম, দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করলে এই বস্তুটি আত্মরক্ষার এক কার্যকরী অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।

'নাঃ, সন্দেহ নেই, নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার আছে!'

'জানেন, আততায়ীরা কিছু করে ওঠার আগেই আমি ওদের চমকে দিই, আর সবচেয়ে অন্ধকার গলিঘুঁজিগুলো আমি এত ভালো করে চিনি যে, ভূত ছাড়া যে-কেউই আসুক, আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারব।'

'ভূত!' আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম ঃ 'ভূতে আমি বিশ্বাস করি না, তবে সাধারণ মনুষ্যত্বের খাতিরে আসুন, এই পথটুকু আমরা একসঙ্গে যাই।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোপের আড়াল থেকে একটা মানুষের ছায়া আবির্ভূত হল। এক পলক তাকাল আমার সঙ্গিনীর দিকে। কিন্তু ওর সঙ্গে আমাকে দেখে দ্রুত পায়ে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে গেল।

'দেখলেন তো,' আমি বললাম, 'সৌভাগ্য বলতে হবে, আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম।'

'সত্যিই আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত,' ও বলল, 'কিন্তু আসলে ওই ভদ্রলোক আমার পাশেই থাকেন। আমার বছরখানেক আগে থেকে উনি ওখানে

pathagar.net

আছেন। এই তো সেদিন ওঁর ঘাস ছাওয়া হল।'

'তার মানে?' আমি বললাম।

'দুনিয়া দেখছি কম দিন তো হল না! সারা জীবন ধরে ভগবান আর নিজের ক্ষমতায় আস্থা রেখেছি। এ-কথা আপনাকে বলতে পারি, প্রতি দশজনের মধ্যে ন'জনই ভালো লোক—সে আপনি বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন।'

'আর দশ নম্বর লোকটি?'

'সে হয় সাধু—না হয় ঘোর পাপী।'

'যদি সেই পাপীর সঙ্গে আপনার মোলাকাত হয়? তখন কী করবেন?'

'সেই পাপীকে রক্ষা করতেই যিশু পৃথিবীতে এসেছিলেন! তাঁকে আমি সবসময় সেই কথাই বলি।'

কয়েক মিনিট আমরা নীরবে পথ চললাম। এমন সময় দেখি, সরু পিচের রাস্তাটা একটা ঝরনাকে ঘিরে এগিয়ে গেছে। এ যেন গ্রাম্য প্রশান্তির চূড়ান্ত রূপ, আর স্যাঁতসেঁতে কুয়াশা-ঘেরা সন্ধ্যা তাকে আরও তুঙ্গে তুলে ধরেছে। ঝরনার প্রায়-অদৃশ্য কালো জলের ঘুমপাড়ানি রিমঝিম শব্দ ভুলিয়ে দেয় যে, কাছেই হাজার জীবনের স্পন্দন ও প্রাণশক্তি নিয়ে রয়েছে এক চঞ্চল শহর।

ঝুলে পড়া গাছের শাখা আর চারাগাছের নীচ দিয়ে পথটা এখন এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। তাদের গা থেকে ক্ষণে-ক্ষণে ঝরে পড়ছে সঞ্চিত বৃষ্টি ও কুয়াশার ফোঁটা। আমার সঙ্গিনী হঠাৎই মৌন হয়ে পড়েছে, ফলে আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে ওর দিকে ঘুরে তাকালাম : দেখলাম, মুখটা অন্যদিকে ফেরানো, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া খুবই সামান্য, শান্ত।

'আপনার একা লাগে না,' ওকে জিগ্যেস করলাম, 'এই যে সকাল-সন্ধে, শীত-গ্রীষ্ম, একা-একা এতটা পথ আসেন?'

'একা? একা লাগবে কেন? এ-জায়গাটায় আমার কখনও নিঃসঙ্গ মনে হয় না। সারা জীবনে কখনও মনে হয়নি। শুধু একবার ভাবুন তো, শহরের ঠিক ওপাশেই হাজার-হাজার যুবক এক বিশাল পাকা রাস্তা তৈরি করছে; আর দু-হাজার বছর আগে রোমের সৈন্যরা পাহাড়ের ওপরে শিবির ফেলবে বলে "আকনিল্ড ওয়ে" ধরে কুচকাওয়াজ করতে-করতে এগিয়ে চলেছে। আপনি হয়তো জায়গাটা চেনেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো করেই চিনি। ওই তো কবরখানার ঠিক পাশেই—।'

'হ্যাঁ—।'

মেঠো পথের এক চৌমাথায় এসে পৌঁছলাম আমরা। ও সেখানে হঠাৎ থেমে পড়ল।

'আমি এবার বাঁদিকে যাব। আপনি নিশ্চয়ই সোজা গিয়ে বড় রাস্তায় পড়বেন?'

'হ্যাঁ—আপনি কী করে জানলেন।'

আমার প্রশ্নকে আমল না দিয়ে ও বলল, 'এখন নিশ্চয়ই আপনার আর একা

pathagar.net

লাগবে না, অন্ধকারেও ভয় পাবেন না, কী বলেন? আপনার রাস্তা তো আর বেশি নেই।'

আমি অবাক হয়ে হেসে ফেললাম, বললাম, 'কীসের ভয় পাব?'

'কে বলতে পারে। তার চেয়ে বলি কী—আমার লাঠিটা আপনি ধার নিন, কেউ এলে আটকাতে পারবেন—অবশ্য ভূত ছাড়া।' ও চাপা স্বরে হাসল।

'না। আপনার লাঠি আমি নিতে পারব না।'

কিন্তু ও নাছোড়বান্দা। বলল, 'পরের বার দেখা হলে ফেরত দেবেন'খন। আর মনে রাখবেন, কখনও নিজেকে একা ভাববেন না, এক মুহূর্তের জন্যেও না। আপনাকে শুধু একটু অন্য কথা ভাবতে হবে, এই যা।' ও একটু ইতস্তত করল, যেন মনের ভেতরে বলতে চাওয়া কথাগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে : 'যেমন ধরুন, আজকের এই ঘটনা আপনি কখনও ভুলতে পারবেন না। এই যে সময়টুকু আমরা একসঙ্গে হেঁটে এলাম, এ-কথা চিরকাল আপনার মনে থাকবে! চিরকাল মনে থাকবে! কখনও ভুলবেন না! কখনও না! বলুন?' শেষে ও ছোট্ট করে হাসল।

আমি নতুন করে প্রতিবাদ জানানোর আগেই ও বাঁদিকের পথ ধরে এগিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল ঘন অন্ধকারে।

'শুভরাত্রি,' আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম। কিন্তু কোনও উত্তর পেলাম না। সুতরাং যে-সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি সেদিকেই মনোযোগ দিলাম।

ইতিমধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। চড়াইয়ের শেষ একশো গজ পথ হাতের লাঠি দিয়ে কাঁটাঝোপ সরিয়ে পার হতে পেরে খুশি হলাম। বড় রাস্তায় পড়লেই কয়েকটা লাইট-পোস্টের দেখা পাওয়া যাবে, আর যদি মনে করতে আমার ভুল না হয়, তা হলে যে-বাড়িতে আমি যেতে চাই সেটা রাস্তার ওপরে কিছুটা এগিয়েই পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ওই তো! সামনের জানলার পরদার ফাঁক দিয়ে আলোগুলো ছিটকে পড়েছে রাস্তায়—আমার মনে পড়ে গেল তিরিশ বছর আগের লণ্ঠনের আলোর কথা। পাথরে বাঁধানো একটা পথ খেয়ালিভাবে এগিয়ে গেছে অগোছালো ফুলের বাগানের মধ্যে দিয়ে। বসন্তে ও গ্রীষ্মে সেই ফুলের বাগানে রঙের আগুন খেলে যায়। বাড়ির সদর দরজার কাছে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে।

আর সদর দরজার পেছনে, বসবার ঘরে, নিপাট সুস্বাগতম ভাব নিয়ে জ্বলে থাকা তাপচুল্লির খুব কাছে বসে থাকবে শক্ত সমর্থ ছোটখাটো মহিলাটি, যার সঙ্গে আমি দেখা করতে চলেছি। হয়তো সে ঝুঁকে থাকবে নিজের প্রিয় সেলাইয়ের কাজের ওপর, এবং আমাকে দেখে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে, সে আমরা যতই পালটে গিয়ে থাকি না কেন। কারণ, একসময় আমি তার বাড়িতে ভাড়া ছিলাম। তার চেহারা আর কণ্ঠস্বর মনে করতে চেষ্টা করলাম—ঠিক তিরিশ বছর আগে সে যেমন বলত, 'অল্পেতে এত চিন্তা কোরো না, খোকা।' আমার মনে পড়ে গেল, এ-পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলাম, তার জন্য কী উপহার আনব।

সে বলেছিল, তার পছন্দ অন্য ধরনের, কারণ, তার অসংখ্য পরিচিতজনদের অনেকেই তাকে ডাইনিবুড়ি বলত।

'সুন্দর দেখে একটা ঝাঁটা আনলে কেমন হয়?' আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কারণ, ঝাঁটা ডাইনিবুড়িদের এক নম্বর হাতিয়ার। আমার কথায় সে হেসে উঠেছিল। তারপর বলেছে, তার সবচেয়ে পছন্দ একটা হাতল ছাড়া লাল রঙের ছড়ি। আর আমিও তাই এনে দিয়েছিলাম। সেটা নেওয়ার সময় তার কালজয়ী মুখে যে-সুন্দর হাসি ফুটে উঠেছিল তা আমি কোনওদিনও ভুলব না...।

কী বললাম যেন? কালজয়ী মুখ? আমার শরীরে শিহরণ খেলে গেল। সে কী ভয়ে, না, নির্জনতার জন্যে?

শক্ত হাতে ছড়িটা চেপে ধরে সদর দরজায় ওটা দিয়ে আঘাত করলাম।

এক অচেনা মুখ দরজা খুলে দিল।

'কেউ আছে?' আমি প্রশ্ন করলাম। তারপর মানুষটির মুখে ফুটে ওঠা অভিব্যক্তি দেখে ইতস্তত করলাম, 'আমি...বিশেষ করে কেট-কে দেখতেই এসেছি,' তাড়াতাড়ি বলে চললাম, 'লন্ডনের ও-প্রান্ত থেকে...' আমার স্বর শূন্যতায় মিলিয়ে গেল।

'কেন, আপনি শোনেননি?' স্বাভাবিক গতানুগতিক স্বরে সে বলল, 'বছর-খানেকেরও বেশি হল উনি মারা গেছেন। তারপরই তো এ-বাড়িটা আমরা কিনেছি।'

খোলা দরজা দিয়ে আলোর বন্যা ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাথরে বাঁধানো পথের ওপর। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে রওনা হতেই হাতে ধরা ছড়িটা আমার নজরে পড়ল। ওটার রং লাল।

'ঈশ্বর ওর আত্মাকে শান্তি দিন,' মনে-মনে বললাম।

➤ *দ্য রেড কেন*

pathagar.net

জাদুকর

জোসেফ পি. ব্রেনান

pathagar.net

নরগ্যানের বিচিত্র মেলা এক রাতের জন্য এল রিভারভিলে। গ্রামের সীমান্তে যে-বিশাল পার্কটা আছে, সেখানে তাদের পসরা সাজিয়ে তাঁবু খাটিয়ে বসল। সময়টা অক্টোবরের শুরুর এক উষ্ণ আরামের সন্ধে। ফলে সাতটা বাজতে-না-বাজতেই সেই হইহুল্লোড় আমোদ-প্রমোদের মেলায় ভিড় জমে গেল।

এই ভ্রাম্যমাণ মেলা খুব যে বড় বা জমকালো তা নয়, তবে রিভারভিলে এর কদর আছে। কারণ সিনেমা, থিয়েটার, খেলার মাঠ, শহুরে সবকিছুর থেকে দূরে এক পাহাড়ি এলাকায় নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিভারভিল।

রিভারভিলের স্থানীয় অধিবাসীরা খুব উঁচুদরের খেলা দেখতে হয়তো চায় না; সুতরাং সেই পুরোনো 'মোটা মেয়ে,' 'উল্কিকাটা মানুষ' এবং 'বাঁদর-খোকা' দেখেই ওরা খুশি হয়, মুগ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে। চিনেবাদাম আর মাখন দেওয়া পপ্‌কর্ন খেতে ওরা ব্যস্ত, একইসঙ্গে কাপের-পর-কাপ গোলাপি লেমোনেডে চুমুক দিয়ে চলেছে, আর রং-চঙে চকোলেটের গা থেকে কাগজের মোড়ক খুলতে-খুলতে ওদের আঙুল চটচটে হয়ে উঠেছে।

সবাই বেশ আরামে দিলখুশ হয়ে খেলা দেখছিল, তখনই এক ম্যাজিশিয়ানের দালাল ফলাও করে চিৎকার শুরু করল। বেঁটে, মোটা, পরনে চেক কাপড়ের স্যুট, মুখে লম্বা এক চোঙ। দালালটা প্রাণপণে চেঁচালেও ম্যাজিশিয়ান তাঁবুর সামনে তৈরি কাঠের মঞ্চের পিছনে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেমন যেন নির্বিকার অবজ্ঞার ভাব, এবং ভিড় করে জমায়েত হওয়া জনতার দিকে সে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পরে, যখন প্রায় জনাপঞ্চাশ লোক মঞ্চের সামনে জড়ো হয়েছে, তখন আলোয় এসে দাঁড়াল ম্যাজিশিয়ান। জনতার মধ্যে থেকে শোনা গেল চাপা গুঞ্জন।

ওপর থেকে ঠিকরে পড়া কর্কশ আলোয় ম্যাজিশিয়ানকে ভীষণ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ক্ষয়ে আসা লম্বা রোগা চেহারা। গায়ের রং ফ্যাকাসে, আর গর্তে বসা কুচকুচে কালো দুটো চোখ আকারে বিশাল। ধকধক করে জ্বলছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। ম্যাজিশিয়ানের গায়ে গাঢ় কালো স্যুট ও সেকেলে সরু টাই—সব মিলিয়ে সাক্ষাৎ শয়তানের ছাপ।

শীতল দৃষ্টিতে জনতাকে জরিপ করল সে। অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠল তাচ্ছিল্য আর চাপা বিদ্বেষ।

তার গমগমে স্বর পৌঁছে গেল ভিড়ের শেষ সারি পর্যন্ত। সে বলল, 'আপনাদের মধ্যে থেকে যে-কোনও একজনের সাহায্য আমার দরকার। যদি দয়া করে কেউ স্টেজে আসেন—।'

সবাই আশেপাশে তাকাতে লাগল, ঠেলতে লাগল একে অপরকে, কিন্তু মঞ্চের দিকে কেউই এগিয়ে এল না।

ম্যাজিশিয়ান কাঁধ ঝাঁকাল। ক্লান্ত গলায় সে বলল, 'আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ না এলে এ-খেলা দেখানো সম্ভব নয়। আমি আপনাদের হলফ করে বলছি, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, এই খেলায় ভয়ের কিছু নেই। এ নেহাতই নিরীহ খেলা।'

প্রত্যাশা নিয়ে চারপাশে তাকাল সে, আর ঠিক তখনই জনৈক যুবক কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল মঞ্চের দিকে।

হাত বাড়িয়ে তাকে মঞ্চে উঠতে সাহায্য করল ম্যাজিশিয়ান। ছেলেটিকে একটা চেয়ারে বসাল।

'আরাম করে বসুন,' ম্যাজিশিয়ান বলল, 'এক্ষুনি আপনাকে আমি হিপনোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তখন আপনাকে যা বলব আপনি তাই শুনবেন।'

ছেলেটি চেয়ারে বসে ছটফট করতে লাগল। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভভাবে হাসল।

ম্যাজিশিয়ান তার বিশাল চোখ যুবকের চোখে স্থির রেখে তাকিয়ে রইল। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটির ছটফটানি একদম বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎই ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন রঙিন পপকর্নের একটা বিরাট প্যাকেট ছুড়ে মারল মঞ্চের দিকে। মঞ্চের আলোর ওপর দিয়ে উড়ে এসে সেই প্যাকেটটা ধপ করে পড়ল চেয়ারে বসে থাকা যুবকের ঠিক মাথায়।

ছেলেটি চকিতে ঝাঁকুনি দিল একপাশে। আর-একটু হলেই সে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। একটু আগের নিশ্চুপ হয়ে থাকা জনতা গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

pathagar.net

ম্যাজিশিয়ান রাগে কাঁপতে লাগল। মুখচোখ লাল করে ভয়ঙ্কর ক্রোধে সে তাকিয়ে রইল দর্শকদের দিকে।

'কে ছুড়ল এটা?' হোঁচট খাওয়া গলায় জানতে চাইল সে।

সবাই চুপ করে গেল।

ম্যাজিশিয়ান তখনও তাদের দিকে লাল চোখে তাকিয়ে। অনেকক্ষণ পরে তার মুখ আবার ফ্যাকাসে হল, বন্ধ হল শরীরের কাঁপুনি। কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখ দুটো একইভাবে জ্বলতে লাগল।

অবশেষে মঞ্চে বসা যুবকটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ম্যাজিশিয়ান। ছোট করে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বিদায় দিল। তারপর আবার ফিরে তাকাল দর্শকদের দিকে।

'মাঝপথে বাধা পড়ার জন্যে খেলা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।' নিচু গলায় ঘোষণা করল ম্যাজিশিয়ান, 'আর তার জন্যে নতুন কাউকে দরকার। পপ্‌কর্ন-এর প্যাকেটটা যিনি ছুড়ে মেরেছেন আশা করি মঞ্চে আসতে তাঁর আপত্তি নেই?'

প্রায় ডজনখানেক লোক একসঙ্গে ঘুরে তাকাল ভিড়ের পিছন দিকে। আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক দর্শকের দিকে।

সঙ্গে-সঙ্গে তাকে দেখতে পেল ম্যাজিশিয়ান। তার কালো চোখ যেন ধিকিধিকি জ্বলে উঠল। গম্ভীর ঠাট্টার সুরে সে বলল, 'এ-খেলায় যিনি বাধা দিয়েছেন তিনি হয়তো আসতে ভয় পাচ্ছেন। ছায়ায় লুকিয়ে পপ্‌কর্ন-এর ঠোঙা ছুড়তেই তার বোধহয় ভালো লাগে।'

অপরাধীর ঠোঁট চিরে আকস্মিকভাবেই বেরিয়ে এল এক অস্ফুট চিৎকার। সঙ্গে-সঙ্গে সে দু-হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল মঞ্চের দিকে। তার চেহারায় তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। বরং প্রথম যুবকের সঙ্গে যেন অনেকটা মিল আছে। দু-জনকেই দেখে সাদামাঠা খেতি মজুর বলে মনে হয়।

তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে দ্বিতীয় যুবক মঞ্চের ওপর চেয়ারে গিয়ে বসল। স্পষ্টই দেখা গেল, প্রায় কয়েক মিনিট ধরে সে ম্যাজিশিয়ানের 'আরাম করে বসার' নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করল। তবে একটু পরেই তার একরোখা ভাব মিলিয়ে গেল এবং অত্যন্ত বাধ্য ছেলের মতো সে তাকিয়ে রইল তার চোখের সামনে স্থির হয়ে থাকা জ্বলজ্বলে দুটো চোখের দিকে।

মিনিট খানেক পরেই ম্যাজিশিয়ানের আদেশে সে উঠে দাঁড়াল এবং মঞ্চের শক্ত পাটাতনের ওপরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। শোনা গেল দর্শকদের দ্রুত শ্বাস নেওয়ার শব্দ।

'এবার আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ুন,' ম্যাজিশিয়ান সুর করে বলতে লাগল, 'ঘুমিয়ে পড়ুন ধীরে-ধীরে। এই তো, আপনার চোখে ঘুম নেমে আসছে। গভীর ঘুমে

pathagar.net

আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবার আপনাকে যা-যা আদেশ করব, সব আপনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবেন। আমার প্রতিটি আদেশ আপনাকে শুনতে হবে। যা বলব তাই...।'

একঘেয়ে সুরে বেজে চলল তার কথাগুলো। একই শব্দ সে বারবার বলতে লাগল। জনতার মুখে টুঁ শব্দটি নেই। সবাই চুপচাপ, ছবির মতো দাঁড়িয়ে।

হঠাৎই ম্যাজিশিয়ানের সুর পালটে গেল, এবং দর্শকরা টানটান হয়ে উঠল উত্তেজনায়।

'উঠে দাঁড়াবেন না—আস্তে-আস্তে ওপরে ভেসে উঠুন!' ম্যাজিশিয়ান আদেশ দিল, 'ভেসে উঠুন ওপরে!' তার কালো চোখ দাবানলের মতো স্বপ্রভ হয়ে জ্বলতে লাগল। দর্শকরা শিউরে উঠল।

'উঠুন ওপরে।'

চমকে উঠে একসঙ্গে শব্দ করে শ্বাস টানল জনতা।

মঞ্চে টান-টান হয়ে শুয়ে থাকা যুবকের একটি পেশিও নড়ল না। কিন্তু সে ওই অবস্থায় ভেসে উঠতে লাগল ওপরে। প্রথমে এত ধীরে যে ঠিক বোঝাই গেল না। কিন্তু পরক্ষণেই তার গতি ক্রমে বাড়তে লাগল।

'উঠুন!' গমগম করে উঠল ম্যাজিশিয়ানের কণ্ঠস্বর।

ছেলেটা ভাসতে-ভাসতে ক্রমশ মঞ্চ থেকে বেশ কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল, কিন্তু তখনও তার গতি থামেনি।

দর্শকদের মধ্যে তখন দৃঢ় বিশ্বাস যে, এটা এক ধরনের ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে দেখতে লাগল। ছেলেটি যেন বাতাসে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, নিরালম্ব হয়ে দোল খাচ্ছে সামান্য।

হঠাৎই দর্শকদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হল, নিবদ্ধ হল অন্যজনের ওপরে। ম্যাজিশিয়ান এক হাতে নিজের বুক চেপে ধরেছে। কয়েক পা টালমাটাল পায়ে এগিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মঞ্চের ওপরে।

'ডাক্তার-ডাক্তার' করে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। চেকস্যুট পরা দালাল তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ঝুঁকে পড়ল মঞ্চে পড়ে থাকা নিথর দেহটার ওপরে।

সে নাড়ি দেখল, তারপর ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। কেউ এক বোতল হুইস্কি এগিয়ে দিল তার দিকে, কিন্তু সে শুধুই কাঁধ ঝাঁকাল।

হঠাৎই জনতার ভিড় থেকে একটি মহিলা চিৎকার করে উঠল।

সবাই ফিরে তাকাল তার দিকে। পরক্ষণেই মহিলাটির দৃষ্টি অনুসরণ করে তারা ওপরে তাকাল।

সঙ্গে-সঙ্গে আরও চিৎকার শোনা গেল—কারণ, ম্যাজিশিয়ানের ঘুম পাড়ানো ছেলেটি এখনও ওপরে উঠে চলেছে। সবাই যখন মরণাপন্ন ম্যাজিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে ছিল, তখনও তার গতি থামেনি। এখন মঞ্চ থেকে সে প্রায় সাত ফুট ওপরে

pathagar.net

এবং এখনও অবাধে ভেসে চলেছে। ম্যাজিশিয়ান মরে যাওয়ার পরেও সে তার শেষ আদেশ, 'উঠুন।' অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছে।

ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ নিয়ে দালালটা পাগলের মতো লাফ দিল ওপর দিকে, কিন্তু বেঁটে হওয়ায় তার হাত পৌঁছল না। শূন্যে ভেসে থাকা শরীরটাকে তার আঙুল কোনওরকম স্পর্শ করল মাত্র, তারপরেই সে বিকট শব্দে পড়ে গেল মঞ্চের ওপরে।

যেন কোনও অদৃশ্য দড়ির টানে ছেলেটি কাঠ হয়ে শুয়ে থাকা ভঙ্গিতে ভেসে চলল ওপরে।

মেয়েরা পাগলের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল; পুরুষরা চিৎকারে দিশেহারা। কেউ বুঝতে পারছে না কী করবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা দালালের চোখে ক্রমে জন্ম নিল আতঙ্ক। মঞ্চে লুটিয়ে পড়ে থাকা ম্যাজিশিয়ানের দিকে মরিয়া হয়ে একবার তাকাল সে।

'নেমে এসো, ফ্র্যাঙ্ক। নেমে এসো।' জনতা চিৎকার করে উঠল, 'ফ্র্যাঙ্ক। জাগো, নেমে এসো। থামো, ফ্র্যাঙ্ক।'

কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের পাথরের মতো দেহ আরও ওপরে উঠে যেতে লাগল। ওপরে... ওপরে...একসময় মেলার তাঁবুর মাথায় পৌঁছে গেল। তারপর বিশাল-বিশাল গাছ ছাড়িয়ে উঠে গেল ওপরে...অবশেষে পৌঁছে গেল নরম চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া আকাশে।

দর্শকদের অনেকে ভয়ে মুখ ঢাকল দু-হাতে, মুখ ফিরিয়ে নিল। যারা তখনও তাকিয়েছিল, তারা দেখল, ফ্র্যাঙ্কের শরীরটা আকাশে ভাসতে-ভাসতে ক্রমে একটা বিন্দুর আকার নিল। যেন একটা ছোট্ট কয়লার টুকরো ভেসে চলেছে চাঁদের দিকে।

তারপর সেটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

➤ *লেভিটেশান*

pathagar.net

নিজের সঙ্গে দেখা

রে ব্র্যাডবেরি

pathagar.net

মে মাসের এক সাদামাঠা সন্ধ্যায়, উনত্রিশতম জন্মদিনের সপ্তাহখানেক আগে, জোনাথেন হিউজ তার নিয়তির মুখোমুখি হল। অন্য এক সময়, অন্য এক বছর, অন্য এক জীবন থেকে সে এসেছে।

তার নিয়তিকে প্রথমে দেখে চেনা যায়নি, তবে পেন্সিলভ্যানিয়া স্টেশন থেকে একইসময়ে সে ট্রেনে উঠেছে এবং নৈশভোজের সময় লং আইল্যান্ডের বুক চিরে ট্রেন যখন ছুটে চলেছে তখন বসেছে হিউজের সঙ্গে। এক বয়স্ক মানুষের ছদ্মবেশে হাজির নিয়তির হাতের খবরের কাগজটাই জোনাথেন হিউজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে একসময় সে বলে ওঠে, 'স্যার, মাপ করবেন, আপনার 'নিউইয়র্ক টাইমস'টা আমারটার চেয়ে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। প্রথম পাতার ছাপার হরফগুলো অনেক বেশি আধুনিক ঠেকছে। এটা কি পরের এডিশান?'

না।—বয়স্ক মানুষটি থমকাল, কষ্ট করে ঢোঁক গিলে, তারপর কোনওরকমে বলল, হ্যাঁ, অনেক পরের এডিশান।

হিউজ চারপাশে তাকাল, বলল, মাপ করবেন, অন্য—অন্য এডিশানগুলো সব একইরকম দেখতে। আপনারটা কি ভবিষ্যতে যে চেহারা পালটানো হবে তার কোনও স্যাম্পল কপি? মানে আগামী এডিশানের কোনও স্যাম্পল?

আগামী?—বয়স্ক মানুষটির ঠোঁট প্রায় নড়লই না। তার গোটা শরীরটা পোশাকের খোলসের ভেতর যেন কুঁকড়ে গেল, যেন একটি নিশ্বাস ছাড়ার ফলে তার ওজন কমে গেছে। ফিসফিস করে সে বলল, সত্যিই, আগামী সংস্করণই বটে।

হে ভগবান, কী নিষ্ঠুর রসিকতা!

জোনাথেন হিউজ চোখ পিটপিট করে খবরের কাগজটার তারিখ দেখল ঃ ২ মে, ১৯৮৯।

এই দেখুন—, সে প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গেল, আর তখনই তার চোখ পড়ল একটা ছোট্ট খবরে। প্রথম পাতার বাঁদিকে ওপরের কোণে ছবি ছাড়া ছাপা হয়েছে ঘটনাটা ঃ

মহিলা খুন

স্বামীর খোঁজে পুলিশ

'গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শ্রীমতী অ্যালিস হিউজের মৃতদেহ পাওয়া গেছে গত—'

ছুটন্ত ট্রেন ঝমঝমিয়ে একটা সেতু পার হয়ে গেল। জানলার বাইরে ছুটন্ত গাছের সারি, সবুজ পাতার ঢেউ। তারপর ট্রেন এসে থামল স্টেশনে, যেন কোথাও কিছুই ঘটেনি।

নিস্তব্ধতার মধ্যে যুবকের চোখ আবার ফিরে এল সেই খবরে ঃ

'প্ল্যানডোমের ১১২নং প্ল্যানডোম নিবাসী জোনাথেন হিউজ একজন পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট—'

সে চিৎকার করে উঠল, সর্বনাশ! এখুনি পালাতে হবে।

বয়স্ক মানুষটি নড়েচড়ে ওঠার আগেই সে চকিতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়ল একটা খালি সিটে। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল জানলার বাইরে ছুটে চলা সবুজ আলোর নদীর দিকে।

ওঃ ভগবান,—সে ভাবল, কে এ-কাজ করল? কে আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে? একী ঠাট্টা। সদ্য বিয়ে করা একটি চমৎকার বউকে নিয়ে এরকম ঠাট্টা? ওঃ!

ট্রেন একটা বাঁক নিল। সে ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্রোধে মাতাল হয়ে টলতে-টলতে ঘুরে দাঁড়াল বৃদ্ধের মুখোমুখি। বৃদ্ধ তখন খবরের কাগজের ওপর মুখ গুঁজে রয়েছে, যেন লুকোনোর চেষ্টা করছে। কাগজটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল হিউজ, তারপর বুড়ো মানুষটির কাঁধ খামচে ধরল। বৃদ্ধ চমকে উঠল, চোখ তুলে তাকাল, তার চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ট্রেন ছুটে চলার ঝমঝম শব্দের মধ্যে ওরা এক সুদীর্ঘ মুহূর্ত ধরে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। হিউজের মনে হল তার আত্মা যেন ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

কে আপনি?

নিশ্চয়ই ওদের কেউ একজন চেঁচিয়ে কথাটা বলেছে।

ট্রেনের ঝাঁকুনি এত বেড়ে গেল যেন এখুনি লাইন থেকে ছিটকে পড়বে।

বুকে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল বুড়ো মানুষটি, তাড়াতাড়ি

জোনাথেন হিউজের হাতে কিছু একটা গুঁজে দিল, তারপর গলিপথ ধরে টলতে-টলতে চলে গেল পরের কামরার দিকে।

তরুণ মানুষটি মুঠো খুলতেই একটা কার্ড পেল। কার্ডের কথাগুলো পড়েই সে ধপ করে বসে পড়ল সিটে, লেখাগুলো আবার পড়ল ঃ

জোনাথেন হিউজ, পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট

৬৭৯-৪৯৯০। প্ল্যানডোম।

না।—কেউ একজন চিৎকার করে উঠল।

আমি, ওই বুড়ো লোকটাই আমি।—যুবকটি ভাবল।

নিশ্চয়ই কোনও ষড়যন্ত্র চলছে। খুন নিয়ে কেউ একটা বিশ্রী ঠাট্টা করেছে তার সঙ্গে। ট্রেন গর্জন করে ছুটে চলেছে। যাত্রীরা বুদ্ধিজীবী মাতালের মতো টলছে, মুখে খোলা বই কিংবা খবরের কাগজের মুখোশ। আর সেই বৃদ্ধ লোকটি কামরা থেকে কামরায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে, যেন তাকে ভূতে তাড়া করেছে।

কিন্তু তবুও সেই দুটি মানুষের দেখা হল শেষ কামরায়। কামরাটা প্রায় খালি। বসে থাকা বৃদ্ধ মানুষটির সামনে জোনাথেন হিউজ এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধটি যেন জেদ করেই মুখ তুলে তাকাল না। সে এখন এমন প্রচণ্ড আবেগে কাঁদছে যে, কথাবার্তা বলা একেবারেই অসম্ভব।

লোকটা কার জন্যে কাঁদছে?—যুবক ভাবল। বলল, থামুন, প্লিজ থামুন।

বুড়ো মানুষটি যেন আদেশ পেয়ে সোজা হয়ে বসল। চোখ মুছল, নাক ঝাড়ল, তারপর এমন এক অস্পষ্ট-অস্ফুট স্বরে কথা বলতে শুরু করল যে, জোনাথেন হিউজ তার খুব কাছে সরে আসতে বাধ্য হল। শেষে তার পাশে বসেও পড়ল। শুনতে লাগল বৃদ্ধের ফিসফিসে কথা ঃ

আমাদের জন্ম হয়েছিল—।

আমাদের?—যুবকটি চিৎকার করে উঠল।

হ্যাঁ, আমাদের।—ফিসফিস করে বুড়ো লোকটি বলল। জানলা দিয়ে ছুটে চলা গাঢ় গোধূলির ধোঁয়াটে অবয়বের দিকে তাকিয়ে সে বলল,...আমাদের দুজনের জন্ম হয়েছিল ১৯৫০ সালে, কুইন্সিতে। তারিখটা ছিল ২২ আগস্ট—।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছে।—ভাবল হিউজ।

আমরা থাকতাম ঊনপঞ্চাশ নম্বর ওয়াশিংটন স্ট্রিটে। পড়তাম সেন্ট্রাল স্কুলে। আমাদের সঙ্গে পড়ত ইসাবেল পেরি—।

হ্যাঁ, ইসাবেল। যুবকের মনে পড়ে গেল।

pathagar.net

তারপর বৃদ্ধ ফিসফিস করে বলে চলল, আমরা...।—অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, আমাদের...। আমরা দুজন...। এইভাবে সে বলেই চলল, বলেই চলল। বলল তাদের অঙ্ক স্যারের কথা, ইতিহাসের দিদিমণির কথা, কীভাবে দশ বছর বয়সে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিল, এগারো বছরে পুকুরে ডুবতে বসেছিল। তারপর প্রথম ভালোবাসা হল ইম্পি জনসনের সঙ্গে—।

এইভাবে স্মৃতির পাতা খুলতে-খুলতে বুড়ো মানুষটির বয়েস কমতে লাগল, আর স্মৃতির ভারে বৃদ্ধ হতে শুরু করল জোনাথেন। সময়ের পথে বিপরীত মুখে চলতে-চলতে একসময় দুজনের দেখা হল। সেই মুহূর্তটা জোনাথেন কী করে যেন বুঝতে পারল। যদি এখন সে মুখ তুলে তাকায় তা হলে দেখবে তার অবিকল যমজকে।

সে মুখ তুলে তাকাল না।

বৃদ্ধ মানুষটির কথা শেষ হল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, এই হল অতীতের কথা।

লোকটিকে আমার মারা উচিত,—হিউজ ভাবল ঃ চিৎকার করে গালিগালাজ দেওয়া উচিত, অথচ কোনওটাই আমি করতে পারছি না। কেন?

বৃদ্ধ মানুষটি যেন জোনাথেনের মনের কথা টের পেল। সে বলল, কারণ, তুমি বেশ ভালো করেই জানো আমি যা বলছি তা সত্যি। আমাদের সম্পর্কে যা-যা জানা উচিত সবই আমি জানি। এখন বাকি শুধু ভবিষ্যতের কথা!

আমার ভবিষ্যৎ?

না আমাদের,—বৃদ্ধ বলল।

বুড়ো মানুষটির হাতে মুঠো করে ধরা খবরের কাগজটার দিকে চেয়ে জোনাথেন হিউজ ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল। কাগজটা ভাঁজ করে নিল সেই বৃদ্ধ। তারপর বলল, তোমাদের ব্যাবসার অবস্থা ক্রমে খারাপ হবে। কী কারণে তা কে জানে! একটা বাচ্চা হবে, কিন্তু সে মারা যাবে। একটা রক্ষিতা জুটবে, সেও একসময় সরে যাবে। বউ ভালো থেকে দিন-দিন খারাপ হবে। আর সব শেষে...ওঃ, বিশ্বাস করো, খুউব ধীরে-ধীরে তুমি—তুমি—কেমন করে বলি?—তুমি তোমার বউ-এর ছায়াকে পর্যন্ত ঘেন্না করবে। তুমি দেখছি ঘাবড়ে যাচ্ছ! না, তা হলে আর কিছু বলব না।

ওরা অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল। বৃদ্ধ মানুষটি ক্রমে-ক্রমে আবার বৃদ্ধ বয়েসে ফিরে এল; বয়সের পথে তার সঙ্গী হল যুবক। যখন তার বয়েস আবার ঠিক-ঠিক জায়গায় পৌঁছল তখন ঘাড় নেড়ে বৃদ্ধকে অনুরোধ জানাল কথা বলার জন্য, কিন্তু বৃদ্ধের চোখে সে তাকাল না। বৃদ্ধ বলতে শুরু করল ঃ

অসম্ভব মনে হচ্ছে, তাই না? কারণ, তোমার বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর, তোমার জীবনের সেরা বছর। এক ফোঁটা কালি যে এক কলসি জলকে কালো করে দিতে পারে সেটা ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না? কিন্তু সেটাই হয়ে থাকে। তারপর

pathagar.net

গোটা পৃথিবীটাই পালটে যায়। শুধু আমাদের বউ নয়, শুধু সুন্দরী মেয়েটি নয়, সমস্ত সুখের স্বপ্নই বদলে যায়।

আপনি—আপনি ওকে খুন করেছেন?—জোনাথেন হিউজ চমকে উঠে বলল। তারপর হঠাৎই থেমে গেল।

আমি নয়, আমরা। আমরা দুজনে। কিন্তু যদি আমি তোমাকে বোঝাতে পারি, বিশ্বাস করাতে পারি, তা হলে আমরা কেউই খুন করব না। ও বেঁচে থাকবে আর তুমি দিনের-পর-দিন আরও সুখী হয়ে বৃদ্ধ হবে। এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। এর জন্যেই আমি কাঁদি। এখনও সময় আছে। বছরের-পর-বছর আমি তোমাকে সচেতন করতে চাই, তোমার রক্তে পরিবর্তন আনতে চাই, তোমার মনকে তৈরি করতে চাই। হা ভগবান, যদি মানুষ জানত খুন কাকে বলে! কী বোকার মতো কাজ, কী কুৎসিত! কিন্তু তবু আশা আছে, কারণ, আমি কোনওরকমে এখানে পৌঁছে গেছি। তোমাকে ছুঁয়েছি, সেই পালা-বদলের পালা শুরু করেছি, যার জন্যে আমাদের দুজনের আত্মা রক্ষা পাবে। এখন শোনো। আমরা দুজন যে এক তাতে নিশ্চয়ই তোমার কোনও সন্দেহ নেই? তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো, সময়ের দুই যমজ এই রাতের এই প্রহরে এই ট্রেনে চড়ে এগিয়ে চলেছে?

ট্রেন তীক্ষ্ণ স্বরে সিটি বাজাল। যুবক সামান্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। এর চেয়ে বেশি উৎসাহ বৃদ্ধের প্রয়োজন ছিল না।

সে আবার বলতে শুরু করল, আমি ছুটে পালিয়েছি। পালিয়ে এলাম তোমার কাছে। এর বেশি কিছু আমি জানি না। ও মারা গেছে মাত্র একদিন আগে, আর আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। কোথায় যাব? লুকোনোর কোনও জায়গা নেই, একমাত্র সময়ের ভাঁজে ছাড়া। কার কাছে আমি প্রাণভিক্ষা চাইব? কোনও জজসাহেব নেই, কোনও জুরি নেই, কোনও উপযুক্ত সাক্ষী নেই, শুধু আছ তুমি। তুমিই একমাত্র এ-রক্ত ধুয়ে ফেলতে পারো, তাই না? তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি সময়ের পথ ধরে পেছনে ছুটে এসেছি। একমাত্র তুমিই পারো আমাকে বাঁচাতে, আমাদের বাঁচাতে! যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, ওঃ ভগবান, তা হলে আমি—আমরা শেষ হয়ে যাব! একই কবরে ভাগাভাগি করে আমাদের শুতে হবে।...তা হলে বলি, তোমাকে এখন কী করতে হবে?'

যুবক উঠে দাঁড়াল।

প্ল্যানডোম! প্ল্যানডোম!—কেউ চেঁচিয়ে জানাল।

ট্রেনের গতি ক্রমশ কমে আসছে। ওরা প্ল্যাটফর্মে নেমে এল। ভিড় ঠেলে ধাক্কাধাক্কি করে যুবক এগিয়ে চলেছে, আর তার পিছনে ছুটছে বৃদ্ধ লোকটি।

দাঁড়াও প্লিজ, একটু দাঁড়াও!—বৃদ্ধ চিৎকার করে বলল।

যুবক না থেমে এগিয়ে চলল।

শোনো, আমরা দুজনেই এর মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছি। তাই নিজেদের

pathagar.net

বাঁচাতে বহু কষ্ট করে খুঁজে বের করেছি তোমাকে। বিশ্বাস করো, খুনটা একমাত্র তুমিই রুখতে পারো।

ওরা প্ল্যাটফর্মের কিনারায় এসে দাঁড়াল। জোনাথেন রাস্তার যানবাহনের দিকে তাকিয়েছিল। সারির শেষ গাড়িটির প্রতি নজর রেখে এ-পাশের বুড়ো লোকটিকে বলল, বলুন তো, ১৯৫৮ সালের গরমকালে আমার ঠাকুমার বাড়িতে কী কাণ্ড হয়েছিল? এটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। বলুন দেখি?

বুড়ো লোকটির কাঁধ ঝুঁকে এল। নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজতর হল, এবং আবৃত্তি করার ভঙ্গিতে সে বলে চলল, আমরা দু-দিনের জন্যে লুকিয়ে ছিলাম। কোথায় লুকিয়ে ছিলাম কেউ জানত না। সবাই ভেবেছিল আমরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছি, কিংবা নদীতে ডুবে মরেছি। কিন্তু আমরা লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদছিলাম, ভাবছিলাম আমাদের কেউ চায় না...শুনেছি বাতাসের শনশন, আর সেইসঙ্গে মরে যেতে ইচ্ছে করছিল।

যুবক এবার ঘুরে তাকাল। গভীর স্বরে প্রশ্ন করল, তুমি আমাকে ভালোবাসো?

না বেসে যে উপায় নেই। তুমিই আমার সব। শেষ গাড়িটা স্টেশনের কাছে এসে থামছে। জানলার কাচের ও-পিঠে এক তরুণী। হাসল, হাত নাড়ল।

জলদি,—শান্ত স্বরে বুড়ো মানুষটি বলল, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে দাও, তা হলে তোমাকে শিখিয়ে দেব, দেখিয়ে দেব, কোথায় তোমাদের সম্পর্কের গোলমাল হচ্ছে, চিড় ধরছে, যাতে সেগুলো তুমি ঠিক-ঠিক শুধরে নিতে পারো। তখন তুমি উপহার পাবে এক সুখী দাম্পত্যজীবন। চিরকালের জন্যে। আমাকে নিয়ে চলো—।

গাড়িটা হর্ন বাজাল, তারপর নিশ্চল হল। তরুণী বাইরে ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে ডাকল, এই যে রূপবান যুবক।

জোনাথেন হিউজ হাসিতে ফেটে পড়ল, ছুটে গেল গাড়ির কাছে : এই যে আমার রূপবতী, দাঁড়াও।

সে থমকাল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, খবরের কাগজ হাতে বৃদ্ধ মানুষটি প্ল্যাটফর্মের কিনারায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে। সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে একটা হাত উঁচিয়ে ধরল বৃদ্ধ: তুমি কী একটা ভুলে গেছ মনে হচ্ছে?

সব চুপচাপ। অবশেষে জোনাথেন হিউজ বলল, হ্যাঁ, তোমাকে।

রাতের অন্ধকারে গাড়িটা বাঁক নিল। তরুণী, বৃদ্ধ, যুবক, সেই অসরল গতির সঙ্গে তাল রেখে টলে উঠল।

আপনার নাম কী যেন বললেন?—রাস্তা ও শহরতলির ছুটোছুটি ও শোরগোল ছাপিয়ে তরুণী জিগ্যেস করল।

pathagar.net

নাম উনি বলেননি।—চটপট বলে উঠল জোনাথেন হিউজ।

ওয়েলডন।—চোখ পিটপিট করে বুড়ো লোকটি বলল।

আরে, এ তো তোমার বিয়ের আগের পদবি!—অ্যালিস হিউজ অবাক হয়ে বলল।

বুড়ো মানুষটি অস্ফুটভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে হোঁচট খেল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল : ও, তাই নাকি? কী অদ্ভুত!

কে জানে আমাদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে কি না! আপনি—।

সেন্ট্রাল হাইস্কুলে উনি আমার মাস্টারমশাই ছিলেন। চটপট জবাব দিল জোনাথেন হিউজ।

এখনও তাই, এখনও তাই।—বুড়ো মানুষটি বলল। একইসঙ্গে ওরা বাড়িতে এসে পৌঁছল।

তার দেখা আর শেষ হতে চায় না। ডিনার খেতে বসে প্রায় অর্ধেক সময় বৃদ্ধ লোকটি খালি হাতে তার উলটো-দিকে বসা সুন্দরী মেয়েটির দিকে অপলকে চেয়ে রইল। জোনাথেন হিউজ উসখুস করতে লাগল। খণ্ড-খণ্ড নিস্তব্ধতাগুলো চাপা দেওয়ার জন্য উঁচু গলায় কথা বলতে থাকল। আর কদাচিৎ খাবার তুলল মুখে। বুড়ো মানুষটি যেন ম্যাজিক দেখছে এইভাবে চেয়ে রইল অ্যালিসের মুখের দিকে। ওর মুখ দিয়ে যেন বেরিয়ে আসছে হিরের ঝরনা।

আমার থুতনিতে কি খাবার লেগে আছে?—হঠাৎই অ্যালিস হিউজ চেঁচিয়ে উঠল, নইলে সবাই আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে কেন?

এ-কথায় বৃদ্ধ হঠাৎই কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওরা অবাক হয়ে গেল। বৃদ্ধ কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছে না। অবশেষে অ্যালিস উঠে এসে তার পাশে দাঁড়াল। তার কাঁধ স্পর্শ করল।

ক্ষমা করো।—বৃদ্ধ বলল, তোমাকে দেখতে এত সুন্দর,—তাই ক্ষমা করো আমাকে। যাও, বোসো নিজের জায়গায়।

খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে হাত মুছল জোনাথেন হিউজ। চেঁচিয়ে বলল, চমৎকার রান্না হয়েছে, বউসোনা আমার। আই লাভ ইউ!—বলে বউয়ের গালে চুমু খেল জোনাথেন। পরক্ষণেই কী ভেবে ওর ঠোঁটে আরও একবার চুমু খেল।

বৃদ্ধের দিকে ফিরে সে বলল, দেখছ? আমার বউকে আমি দারুণ ভালোবাসি।

বুড়ো শান্তভাবে মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ আমার মনে পড়েছে।

মনে পড়েছে?—অবাক চোখে তাকিয়ে অ্যালিস প্রশ্ন করল।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল জোনাথেন হিউজ, শুভ কামনা! সুন্দর বউয়ের জন্য এবং দারুণ ভবিষ্যতের জন্য।

ওর বউ হাসল, গেলাস তুলে ধরল।

মিস্টার ওয়েলডন, আপনি খাচ্ছেন না?—অ্যালিস বৃদ্ধকে লক্ষ করে অনুযোগ করল।

লিভিং রুমের দরজায় বৃদ্ধকে দেখা একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এই দ্যাখো! বৃদ্ধ বলল, তারপর চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করেই সহজ নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঃ এই তো এখানে পাইপ স্ট্যান্ডটা রয়েছে, আর এখানে সব বই। চার নম্বর তাকে আইজলি'র 'দ্য স্টার থ্রোয়ার'। একটা তাক ওপরে এইচ. জি. ওয়েলস-এর 'টাইম মেশিন'। আর এইখানে সেই বিশেষ চেয়ারটা, তাতে আমি বসে আছি।

বলে সে বসল। তারপর চোখ খুলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে জোনাথেন সব লক্ষ করছিল, বলল, এখনই আবার নিশ্চয়ই কান্নাকাটি শুরু করবে না?

না, না। আর কান্না নয়।

রান্নাঘর থেকে বাসনপত্র ধোয়ার শব্দ ভেসে আসছে। সুন্দর মেয়েটি সেখানে আপনমনে গুনগুন করছে। দুজন পুরুষই নজর ফেরাল সেদিকে।

জোনাথেন হিউজ বলল, একদিন আমি ওকে ঘেন্না করব? ওকে খুন করব? ভাবতেই পারছি না।

এখন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তাই না? আমি একটি ঘণ্টা ধরে ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছি, কিন্তু কিছুই নজরে পড়েনি। কোনও ইশারা পাইনি, কোনও সূত্র পাইনি। আমি তোমাকেও খুঁটিয়ে জরিপ করেছি। দেখতে চেয়েছি তোমার কোনও ত্রুটি—মানে, আমাদের কোনও ত্রুটি আছে কি না—।

কী দেখলেন?—দুটো গেলাসে শেরি ঢালল যুবক, একটা গেলাস এগিয়ে দিল।

তুমি বড় বেশি মদ খাও। ব্যস, এইটুকু। সাবধান থেকো।

গেলাসে চুমুক না দিয়ে হিউজ সেটা নামিয়ে রাখল। বলল, আর কী?

ভাবছি তোমাকে একটা লিস্ট তৈরি করে দেব। রোজ সেটা একবার করে দেখবে। হুঁ, বোকা জোয়ানের জন্যে পাগলা বুড়োর উপদেশ।

তুমি যা-যা বলবে সব আমার অক্ষরে-অক্ষরে মনে থাকবে।

সত্যি? কতদিন মনে রাখবে? এক মাস, এক বছর, তারপর আর সবকিছুর মতো সেটাও ভুলে যাবে। তুমি ধীরে-ধীরে আমাতে পরিণত হবে। তোমার বউও বদলে এমন কেউ হয়ে যাবে যাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই ভালো হয়। ওকে বোলো যে, তুমি ওকে ভালোবাসো।

রোজ বলব।

pathagar.net

কথা দিচ্ছ! এটা ভীষণ জরুরি! রোজ বলবে, যেন ভুল না হয়!—বুড়ো মানুষটা সামনে ঝুঁকে এল, তার মুখ ক্রমে লালচে হয়ে উঠেছে : রোজ! রোজ!

অ্যালিস দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু যেন ভয় পেয়েছে।

কী হয়েছে?

না, কিছু না!—জোনাথেন হিউজ হাসল : আমাদের মধ্যে কে তোমাকে বেশি পছন্দ করে সেটা ঠিক করার চেষ্টা করছিলাম।

ও হাসল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

আমার মনে হয়—। জোনাথেন হিউজ কথাটা বলে একটু থামল, চোখ বুজে যেন জোর করে বাকি কথাগুলো উচ্চারণ করল, এখন তোমার যাওয়ার সময় হয়েছে।

হ্যাঁ, সময়।—বৃদ্ধ কিন্তু নড়ল না। তার কণ্ঠস্বর খুব ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিষণ্ণ ঃ এখানে এসে বরাবরই আমার মনে হয়েছে আমি হেরে গেছি। আমি কোনও দোষ খুঁজে পাচ্ছি না। কোনও খুঁত নেই। অথচ—। একটু আগেই ভাবছিলাম, এখুনি ওকে খুন করব, তারপর বৃদ্ধ আমি সমস্ত সাজা মাথা পেতে নেব। যাতে তুমি, যুবক তুমি, নিরাপদে বাঁচতে পারো। কিন্তু সত্যিই কি তাতে কাজ হবে? কারণ, তুমি আর আমি তো একই। না, না, এখন কিছু ভেবো না। এখন খুনের কোনও ব্যাপার নেই। সেটা তোমার জীবনে আসবে আরও কুড়ি বছর পরে! আমি—আমি চলি—।

সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার চোখ বন্ধ করল। বলল, দেখি, অন্ধকারে নিজের বাড়ি থেকে বেরোনোর পথ আমি খুঁজে পাই কি না!

বৃদ্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওভারকোর্টটা পরে নিল। জোনাথেন তাকে সাহায্য করল। হঠাৎই বুড়ো মানুষটা ভয়ঙ্কর সুরে প্রশ্ন করল, আমাদের কি সত্যি কোনও আশা আছে?

হ্যাঁ, আছে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।—জোনাথেন হিউজ বলল।

ওঃ ভগবান! এ-কথা যেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারি।

একটা হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে দরজা খুলল বৃদ্ধ। বলল, ওর কাছে আর বিদায় নেব না। ওই সুন্দর মুখের দিকে আমি আর তাকাতে পারব না। ওকে বোলো বোকা বুড়োটা চলে গেছে। কোথায়? সময়ের রাস্তা ধরে এগিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে। কারণ, একদিন তুমি সেখানে আসবে।

কেন যাব?—যুবক পালটা উদ্ধত প্রশ্ন করল।—তুমি হওয়ার জন্যে? তার কোনও আশা নেই।

তাই যেন হয়। আর—ও, হ্যাঁ—এই তো—।—পকেট হাতড়ে দোমড়ানো খবরের কাগজে মোড়া একটা ছোট্ট জিনিস বের করল বৃদ্ধ লোকটি।—তুমিই বরং এটা রাখো। আমি এখনও নিজের ওপর তেমন ভরসা পাচ্ছি না। উলটোপালটা যা-হোক কিছু হয়তো করে ফেলতে পারি। নাও, এই নাও।

জিনিসটা যুবকের হাতে গুঁজে দিল সে। বলল, গুড বাই।

এর মানে তো গড-বি-উইথ-য়ু? ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। হ্যাঁ, গুড বাই।

পথ বেয়ে রাতের অন্ধকারে দ্রুত মিলিয়ে গেল বৃদ্ধ। এক এলোমেলো বাতাস গাছগাছালি কাঁপিয়ে দিল। বহু দূরে রাতের অন্ধকারে ছুটে চলেছে ট্রেন। আসছে, না যাচ্ছে, তা কে জানে।

জোনাথেন দরজায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে চেষ্টা করল সত্যিই অন্ধকারে কেউ মিলিয়ে যাচ্ছে কি না।

ডার্লিং।—তার বউ ডাকল।

সে ছোট প্যাকেটটা খুলতে শুরু করল।

অ্যালিস এখন তার ঠিক পিছনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর যেন দূরে মিলিয়ে যাওয়া ওই পায়ের শব্দের মতোই ক্ষীণ, দূরাগত।

অ্যালিস বলল, শুধু-শুধু ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না। হাওয়া ঢুকছে।

প্যাকেটটা খোলা শেষ হতেই জোনাথেনের শরীর কঠিন হয়ে উঠল। জিনিসটা এখন রয়েছে তার হাতের চেটোর ওপরে।

একটা ছোট্ট রিভলভার।

বহু দূর থেকে ভেসে এল ছুটন্ত ট্রেনের শব্দ, তার শেষ সিটি। কিন্তু বাতাস সেই শব্দ মাঝপথে মুছে দিল।

বলছি না, দরজাটা বন্ধ করে দাও।—তার বউ বলল।

জোনাথেনের মুখ ঠান্ডা, শীতল। সে চোখ বন্ধ করল।

ওর কথার সুর। সেখানে কি সামান্য একটু বিরক্তির ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে না? একটু খিটখিটে ভাব? জোনাথেন ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। ভারসাম্য হারাল পলকের জন্য। তার কাঁধ দরজায় ঘষে গেল। দরজার পাল্লাটা দুলতে থাকল। এই কি শুরু? সে ভাবল। তারপর...।

দামাল বাতাস নিজে থেকেই বিকট শব্দে বন্ধ করে দিল সদর দরজাটা।

➤ *এ টাচ অফ পেটুল্যান্স*

pathagar.net

কালো পোশাক

রবার্ট ব্লক

pathagar.net

পশ্চিমের আকাশে সূর্য মরণাপন্ন। সারা আকাশে নিজের রক্ত ছিটিয়ে সে গুড়ি মেরে এগিয়ে যায় পাহাড়ের পিছনে তার কবরের দিকে। তীব্র বাতাস শুকনো ঝরাপাতার দল তাড়িয়ে নিয়ে চলে পশ্চিমে, যেন সূর্যের শবানুগমনে তাদের দেরি হয়ে গেছে।

'পাগল!' আপনমনেই বলল হেন্ডারসন, এবং চিন্তা থেকে বিরত হল।

মনের এই ভাবের জন্য হয়তো আজকের দিনটাই দায়ী, ভাবল সে। যতই হোক, আজ হল 'হ্যালোউইন'-এর সূর্যাস্ত। আজকের রাত হল 'অল হ্যালোজ ইভ'। এই রাতে আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। মাটির নীচের কবর থেকে নরকরোটিরা চিৎকার করে ওঠে।

হয় তাই, নয় তো এই রাত নিছকই সাদাসিধে এক ঠান্ডা শরতের রাত। হেন্ডারসন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা সময় ছিল যখন এ-রাতের একটা মানে ছিল। অন্ধকার ইউরোপ কুসংস্কারের আতঙ্কে আর্তনাদ করত। এই রাতকে উৎসর্গ করত অজানার উদ্দেশে। লক্ষ-লক্ষ দরজা বন্ধ হয়ে যেত অশুভ অতিথিদের মুখের সামনে। লক্ষ-লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হত পবিত্র প্রার্থনা। জ্বলে উঠত লক্ষ-লক্ষ মোমবাতি। এসবের মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব ছিল, ভাবল হেন্ডারসন। জীবন তখন ছিল অনেক রোমাঞ্চকর। মাঝরাতে কোনও রাস্তায় মোড় ঘুরলেই কীসের মুখোমুখি হতে হবে সে-কথা ভেবে আতঙ্কে পথ চলত পথচারীরা। তারা বাস করত অশরীরী, প্রেত, পিশাচের যুগে। নিজেদের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য সদাই সতর্ক থাকত—সত্যি বলতে

কী, তখন মানুষ নিজের আত্মার একটা দাম দিত। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে নিজের আত্মাকে মানুষ এতটুকু শ্রদ্ধা পর্যন্ত করে না।

'পাগল!' আবার বলল হেন্ডারসন, এবং সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইল। ফিরে এল বর্তমানে। এই পড়ন্ত বেলায় এই রাস্তা ধরে সে হেঁটে চলেছে আজ রাতের মুখোশ নাচের অনুষ্ঠানের জন্য একটা পোশাক কিনবে বলে। সুতরাং 'হ্যালোউইন' নিয়ে দিবাস্বপ্ন না দেখে পোশাকের দোকানটা আগে খুঁজে বের করা দরকার, নয়তো দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

সরু রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জীর্ণ বাড়িগুলোর অন্ধকার ছায়ায় তার চোখ খুঁজে বেড়াতে লাগল। টেলিফোনের বই থেকে টুকে নেওয়া ঠিকানাটা সে আরও একবার একাগ্র চোখে দেখল।

অন্ধকার হয়ে এলে এরা দোকানের আলো জ্বালায় না কেন? একটা বাড়িরও নম্বর সে পড়ে উঠতে পারছে না। এটা একটা দুঃস্থ বস্তি এলাকা, কিন্তু তবুও—।

হঠাৎই রাস্তার ওপারে একটা দোকানের দিকে হেন্ডারসনের নজর গেল। রাস্তা পার হয়ে দোকানের জানলায় উঁকি দিল সে। সূর্যের শেষ আলোর রেখা ওপারের বাড়ির মাথা ছাপিয়ে তেরছা হয়ে এসে পড়েছে জানলায়, জানলায় সাজানো জিনিসের ওপরে। হেন্ডারসন আচমকা দ্রুত শ্বাস নিল।

সে তাকিয়ে আছে এক পোশাকের দোকানের জানলায়—কোনও ফাটল দিয়ে নরকের দৃশ্য সে দেখছে না। তা হলে এত লাল আগুনের লকলকে শিখা এল কোত্থেকে? দানবদের ভয়ঙ্কর হাসি-বিকৃত মুখে সে-আলো পড়ল কেমন করে?

'সূর্যাস্ত,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল হেন্ডারসন। নিশ্চয়ই তাই হবে, কারণ, দানবের মুখগুলো আসলে মুখোশ। এ-জাতীয় দোকানের জানলায় যেমন থাকে। তবুও, কল্পনাবিলাসী কোনও মানুষকে এ-দৃশ্য চমকে দেয়। দোকানের দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরটা অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। বাতাসে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতার গন্ধ—বহুদিন ছোঁয়া পড়েনি এমন সব জায়গায় যে-গন্ধ পাওয়া যায় : সমাধিতে, গভীর জঙ্গলের কবরে, অতল খাদে, এবং—।

তার আজ হল কী? শূন্য অন্ধকারে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল হেন্ডারসন। এ তো পোশাকের দোকানের গন্ধ! তার মনে পড়ে গেল, কলেজের অভিনয়ের কথা। এই ন্যাপথালিনের গন্ধ তার খুব চেনা, চেনা ঝরে যাওয়া লোমের পোশাক, মুখে মাখার রং, তেল। সে একবার হ্যামলেটের অভিনয় করেছিল, আর তার হাতে ছিল একটা হাসিমুখ নরকরোটি—সাজ-পোশাকের দোকান থেকে ভাড়া করা।

নরকরোটির চিন্তাতেই মতলবটা তার মাথায় খেলল। শত হোক, আজ হল

pathagar.net

'হ্যালোউইন'-এর রাত। আজ তার যা মেজাজ তাতে সে মহারাজা, কিংবা তুর্কী, কিংবা জলদস্যু সেজে যেতে পারে না। সবাই ওইসবই সাজে। তার চেয়ে, কোনও পিশাচ, মায়াবী কিংবা নেকড়ে-মানুষ সেজে গেলে ক্ষতি কী? এ-জাতীয় সাজে লিন্ডস্ট্রমের রাজকীয় প্রাসাদে হাজির হলে তার মুখের চেহারাটা কেমন হবে সেটা হেন্ডারসন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। লোকটা অজ্ঞান না হয়ে যায়। কারণ, তার বন্ধুদের অভিজাত ছদ্মবেশের মাঝে হেন্ডারসনের পোশাক চমকে দেওয়ার মতোই হবে। তা হলে 'হ্যালোউইন'-এর সারমর্ম অনুসরণ করে কোনও পিশাচের বেশে গেলে কেমন হয়?

গোধূলিতে দাঁড়িয়ে রইল হেন্ডারসন। কারও আলো জ্বেলে দেওয়ার অপেক্ষায় রইল। যেন পিছনের ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে, তাকে আপ্যায়ন করবে। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে সে অধৈর্য হয়ে পড়ল, কাউন্টারে সজোরে হাত চাপড়াল।

'কে আছেন দোকানে! শুনছেন!'

সব চুপ। শুধু পিছন থেকে ভেসে এল একটা খসখস শব্দ, তারপর—অন্ধকারে শোনার পক্ষে অস্বস্তিকর কিছু শব্দ কানে এল। নীচ থেকে দুমদাম, খটখট শব্দের পর শোনা গেল পায়ের থপথপ আওয়াজ। হঠাৎই আঁতকে উঠল হেন্ডারসন। একটা কালোছায়া মেঝে থেকে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

জিনিসটা আসলে পাতালঘর থেকে ওপরে আসার পাটাতন দরজা। একটা লোক আর্বিভূত হল কাউন্টারের ওপারে। তার হাতে একটা লণ্ঠন। সেই আলোয় তার ঘুমে-ভরা চোখ পিটপিট করে উঠল।

লোকটার হলদেটে মুখে হাসির ভাঁজ পড়ল।

'কিছু মনে করবেন না, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' অস্পষ্ট স্বরে লোকটা বলল, 'বলুন স্যার, আপনার কী উপকার করতে পারি।'

'আমি "হ্যালোউইন"-এর জন্যে একটা পোশাক খুঁজছিলাম।'

'ও, আচ্ছা। তা কীরকম পোশাক?'

কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, ভয়ঙ্কররকম ক্লান্ত। ফোলা হলদে মুখে চোখ দুটো পিটপিট করেই চলল।

'গতানুগতিক কিছু নয়। মানে, বুঝতেই পারছেন, আমার ইচ্ছে ছিল দানব, পিশাচ গোছের কোনও পোশাক পরে একটা নাচের আসরে...আপনার কাছে মনে হয় সে ধরনের কিছু নেই।'

'আপনাকে আমি মুখোশ দেখাতে পারি।'

'না, তা নয়। আমি চাই, ইয়ে, মানুষ-নেকড়ের পোশাক, কিংবা ওই ধরনের কিছু। সত্যিকারের খাঁটি কোনও পোশাক।'

'ও—খাঁটি জিনিস চাই?'

'হ্যাঁ।' এই মাথামোটা বুড়োটা 'খাঁটি' শব্দটার ওপর এতটা জোর দিল কেন?

'তা দেখাতে পারি—ঠিক সেইরকম জিনিসই আমার কাছে আছে, স্যার,' চোখ

pathagar.net

এখনও পিটপিট করছে, কিন্তু পাতলা ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল এক চিলতে হাসিতে, 'একেবারে ''হ্যালোউইন''-এর জন্যে মানানসই।'

'কী জিনিস?'

'কখনও আপনি ভ্যাম্পায়ার হওয়ার কথা ভেবে দেখেছেন? রক্তচোষা মানুষ?'

'ড্রাকুলার মতো?'

'ইয়ে—হ্যাঁ, ড্রাকুলা।'

'মতলবটা মন্দ নয়। আপনার কি মনে হয় আমাকে মানাবে?'

আঁটোসাঁটো হাসিতে লোকটি তাকে প্রশংসা করল : 'যদ্দুর জানি, ভ্যাম্পায়ার বহুরকমের হয়। আপনাকে ভালোই মানাবে।'

'প্রশংসাই বটে,' হাসল হেন্ডারসন : 'তা হলে আপত্তি কিসের? কিন্তু পোশাকটা কী?'

'পোশাক? নেহাতই সান্ধ্য পোশাক, যা আপনি সবসময় পরেন। আমি আপনাকে খাঁটি একটা আলখাল্লা দিচ্ছি।'

'শুধু একটা আলখাল্লা? ব্যস?'

'ব্যস। কিন্তু জিনিসটা পরতে হয় মৃতদেহ যেমন করে ঢাকে তেমন করে। ওটা মৃতদেহ ঢাকার কাপড় দিয়েই তৈরি, জানেন। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।'

পা টেনে চলার খসখস শব্দ লোকটাকে আবার নিয়ে গেল দোকানের পিছন দিকে। পাটাতন-দরজা তুলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল নীচে। হেন্ডারসন অপেক্ষা করতে লাগল। দুমদাম শব্দ আবার শোনা গেল, এবং একটু পরেই একটা আলখাল্লা নিয়ে হাজির হল লোকটা। অন্ধকারে পোশাকটা থেকে সে ধুলো ঝাড়ছে।

'এই নিন—আপনার খাঁটি আলখাল্লা।'

'খাঁটি?'

'দাঁড়ান, ঠিক করে পরিয়ে দিই—এ একেবারে ভোজবাজি দেখাবে, হলফ করে বলতে পারি।'

ঠান্ডা ভারি পোশাকটা হেন্ডারসনকে ঘিরে ঝুলতে লাগল। ছাতা ধরা একটা হালকা গন্ধ তার নাকে এসে ঝাপটা মারল। কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে আয়নায় খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। আলো খুবই সামান্য, কিন্তু তবুও হেন্ডারসন লক্ষ করল আলখাল্লাটা তার চেহারায় এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তার লম্বা মুখটা আরও শুকনো দেখাচ্ছে, কালো আলখাল্লার জন্য আরও বিবর্ণ লাগছে। ফলে তার চোখ দুটো এখন অনেক তীব্র। জিনিসটা মৃতদেহ ঢাকা দেওয়ার একটা বিশাল কালো কাপড়।

'একদম খাঁটি জিনিস,' বিড়বিড় করে বলল বুড়ো লোকটা। নিশ্চয়ই সে আচমকা এসে হাজির হয়ে থাকবে, কারণ আয়নায় হেন্ডারসন তাকে দেখেনি।

'এটা আমি নেব,' হেন্ডারসন বলল, 'কত দিতে হবে?'

pathagar.net

'দেখবেন, এটা আপনার খুব ভালো লাগবে।'

'কত?'

'ও—ধরুন পাঁচ ডলার।'

'এই যে—।'

বুড়ো লোকটা টাকাটা নিল, চোখ পিটপিট করল, এবং হেন্ডারসনের গা থেকে আলখাল্লাটা খুলে নিল। ওটা খুলে নেওয়ার পরই হেন্ডারসনের শীত-শীত ভাবটা কেটে গেল। পাতালঘরটা নিশ্চয়ই খুব ঠান্ডা—কারণ পোশাকটা একেবারে বরফের মতো।

পোশাকটা প্যাকেট করে হাসি মুখে হেন্ডারসনের হাতে তুলে দিল বুড়ো লোকটা।

'কালই আমি এটা ফেরত দিয়ে যাব।' হেন্ডারসন প্রতিশ্রুতি দিল।

'তার দরকার নেই। আপনি তো কিনেই নিয়েছেন। এটা এখন আপনার।'

'কিন্তু—।'

'আপনার সান্ধ্য-নাচের আসর শুভ হোক।'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে দোকানের দরজার দিকে এগিয়ে গেল হেন্ডারসন। তারপর চোখ-পিটপিট করা বুড়ো লোকটাকে বিদায় জানাতে আবছা অন্ধকারে ফিরে দাঁড়াল।

দুটো জ্বলন্ত চোখ কাউন্টারের ওপার থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে—সে-চোখের দৃষ্টি নিথর, স্থির।

'শুভরাত্রি,' বলল হেন্ডারসন এবং ঝটিতি বন্ধ করে দিল দরজাটা। সে অবাক হয়ে ভাবল, তার একটু-আধটু মাথা খারাপ হয়নি তো।

pathagar.net

আটটা নাগাদ লিন্ডস্ট্রমকে ফোন করে হেন্ডারসন আর-একটু হলে প্রায় বলেই ফেলেছিল যে, সে আসতে পারছে না। আলখাল্লাটা পরামাত্রই সে অসম্ভব হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় শিউরে উঠেছে, আর আয়নার দিকে তাকিয়ে তার ঝাপসা চোখ নিজের শরীরের প্রতিবিম্বকে তেমন ঠাওর করে উঠতে পারেনি।

কিন্তু কয়েক গেলাস পেটে পড়ামাত্রই তার মেজাজ আবার শরিফ হয়ে উঠল। সে কিছুই খায়নি, ফলে এই পানীয় তার রক্তে এনে দিল উষ্ণতা। সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল, আলখাল্লাটা গায়ে অভ্যেস করে নিতে চাইল—ওটাকে চারপাশে দুলিয়ে বীভৎসভাবে মুখের বিকৃত ভঙ্গি করে তার অনুশীলন চলতে লাগল। না, ভ্যাম্পায়ার সে হবেই। একটা ট্যাক্সি ডেকে সে নীচের উঠোনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি বাইরে রেখে ড্রাইভার ভেতরে এল। আলখাল্লাটা ডানার মতো দুপাশে গুটিয়ে রেখে হেন্ডারসন অপেক্ষা করছিল।

'আমার ইচ্ছে, তুমি আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে।' চাপা গলায় বলল সে।

'কী বললেন?'

'আমি তোমাকে যেতে আদেশ করেছি,' অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল হেন্ডারসন, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে হাসিতে ফেটে পড়ল সে। ভয়ঙ্কর এক দৃষ্টি মেলে আলখাল্লার প্রান্তটা এক ঝাপটায় সরিয়ে নিল।

'ও, আচ্ছা, আচ্ছা।'

ড্রাইভারটা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। লম্বা দ্রুত পা ফেলে হেন্ডারসন তাকে অনুসরণ করল।

'কোথায় যাবেন, মালিক—মানে, ইয়ে, স্যার?'

হেন্ডারসন যখন স্তব পাঠের সুরে ঠিকানা বলে হেলান দিয়ে বসল, তখন ভয়ার্ত মুখটা আর পিছন ফিরে তাকাল না।

গাড়িটা এমন এক ঝটকা দিয়ে চলতে শুরু করল যে, হেন্ডারসন এক বিশেষ ধরনের চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির শব্দে ড্রাইভারটা ভীষণ ভয় পেল। গাড়ির ইঞ্জিন পুরোদমে চালিয়ে নগরপালের নির্দেশিত সর্বোচ্চ সীমায় তুলে দিল গাড়ির গতিবেগ। হেন্ডারসন খোলা দরাজ গলায় হেসে উঠল, আর সহজে ভয় পাওয়া ড্রাইভারটা সিটে বসে রীতিমতো কাঁপতে লাগল।

অনেকটা পথ পার হয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছল হেন্ডারসন। কিন্তু সে দরজা খুলে নামামাত্রই যে সেই দরজা দমাস করে বন্ধ হয়ে যাবে এবং ড্রাইভার ভাড়া না নিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে পালিয়ে যাবে, এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

'আমাকে নিশ্চয়ই দারুণ মানিয়েছে,' বিশাল বাড়ির লিফটে পা দিয়ে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ভাবল সে।

লিফটে আরও তিন-চারজন লোক ছিল; লিন্ডস্ট্রমের বাড়িতে অন্যান্য নেমন্তন্নে হেন্ডারসন তাদের দেখেছে, কিন্তু কেউই যেন তাকে ঠিক চিনতে পারল না। ভাবতে তার ভালো লাগল যে, অদ্ভুত একটা আলখাল্লা পরে এবং মুখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তার চেহারা ও ব্যক্তিত্ব একেবারে পালটে গেছে। এই তো, অন্যান্য সব অতিথি কী বিদঘুটে ছদ্মবেশই না পরেছে, কিন্তু কই, হেন্ডারসন তো ওদের চিনে ফেলতে ভুল করছে না? মেয়েরা ওদের শরীর বেশি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, আর পুরুষরা নিজেদের পৌরুষ ভীষণভাবে জাহির করার চেষ্টা করছে।

সত্যি, লিফটের এই আধুনিক নারী-পুরুষের দলকে ওদের বিচিত্র পোশাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে—কী স্বাস্থ্য, মুখে কী অদ্ভুত রক্তের আভা, আর প্রাণশক্তিতে প্রত্যেকে টগবগ করছে। কী হৃষ্টপুষ্ট ওদের গলা ও ঘাড়। তার পাশে দাঁড়ানো এক মহিলার গোলগাল বাহুর দিকে দেখল হেন্ডারসন। নিজের অজান্তেই বহুক্ষণ সেদিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। আর তার ঠিক পরেই হেন্ডারসনের খেয়াল হল লিফটের অন্য লোকেরা তার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে গেছে। ওরা সব এক-কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার আলখাল্লা ও অভিব্যক্তিকে ভয় পাচ্ছে। তার চোখ এবার স্থির হল মহিলাটির দিকে। ওদের কথাবার্তা হঠাৎই যেন বন্ধ হয়ে

pathagar.net

গেছে। মহিলাটি তার দিকে তাকাল। মনে হল, এখুনি কিছু বলবে, কিন্তু তখনই খুলে গেল লিফটের দরজা। হেন্ডারসন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এ সব হচ্ছেটা কী? প্রথমে ট্যাক্সির ড্রাইভার, তারপর এই মহিলা। সে কি খুব বেশি মদ খেয়ে ফেলেছে?

উঁহু, সে সম্ভাবনা কম। এই তো, মার্কাস লিন্ডস্ট্রম তার হাতে মদের গেলাস গুঁজে দিচ্ছে।

'হেন্ডারসন, খোকা আমার, এক চুমুক খেয়ে নাও। আমি বোতল থেকেই টানব'খন। তোমার পোশাকটা আমাকে হঠাৎই ঘাবড়ে দিয়েছে। ছদ্মবেশটা হাতালে কোত্থেকে?'

'ছদ্মবেশ? আমি তো কোনও ছদ্মবেশ পরিনি।'

'ও—তাইতো দেখছি—কী যে সব বোকার মতো বলছি।'

হেন্ডারসন ভাবল, লিন্ডস্ট্রমের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? ও কি সত্যিই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে? ওর চোখে কি সত্যিই কোনও আতঙ্কের ছাপ?

'প—পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব,' তোতলা স্বরে বলল লিন্ডস্ট্রম, তারপর অন্য অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্য ভিড় ঠেলে এগোল।

হেন্ডারসন ওর মোটাসোটা সাদা ঘাড়টা লক্ষ করে চলল। লিন্ডস্ট্রমের পোশাকের কলার ছাপিয়ে ঘাড়টা ফুলে উঠেছে, এবং একটা নীল শিরা সেখানে স্পষ্ট চোখে পড়ছে। লিন্ডস্ট্রমের মোটা গলায় একটা শিরা। আতঙ্কিত লিন্ডস্ট্রম।

হলঘরে হেন্ডারসন একা দাঁড়িয়ে রইল। পাশের বৈঠকখানা থেকে বাজনা ও হাসির শব্দ ভেসে আসছে, সান্ধ্য আসরের বৈশিষ্ট্যসূচক শব্দগুচ্ছ। ভেতরের ঢোকার আগে ইতস্তত করল হেন্ডারসন। হাতের গেলাসে একটা চুমুক দিল সে—বাকার্ডি রাম, অত্যন্ত কড়া। অন্যান্য পানীয়ের ওপর এ-জিনিস যুক্ত হলে যে-কোনও মানুষের মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু তবু সে খেল, আর অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। তার চেহারা ও পোশাকে গোলমালটা কোথায়? তাকে দেখে লোক ভয় পাচ্ছে কেন? নিজের অজান্তেই কি সে ভ্যাম্পায়ারের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে? তারপর, সে ছদ্মবেশ পরেছে বলে লিন্ডস্ট্রমের ঠাট্টা, আর এখন—।

হঠাৎই ঝোঁকের মাথায় হলঘরের লম্বা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। প্রথমে সামান্য টলে উঠল হেন্ডারসন, তারপর তীব্র আলোয় স্থির হয়ে দাঁড়াল আয়নার মুখোমুখি। আয়নার কাচে সে সরাসরি তাকিয়ে আছে, অথচ সেখানে কারও ছায়া নেই।

হেন্ডারসন হাসতে শুরু করল—গলার গভীর থেকে উঠে আসা চাপা শয়তানি হাসি। শূন্য, প্রতিফলনে অক্ষম, কাচের দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে থেকে তার হাসি ক্রমে পরদায় উঠে এল আনন্দে।

'আমি মাতাল হয়ে গেছি,' সে ফিসফিস করে বলল, 'নির্ঘাত মাতাল হয়ে

গেছি। বাড়িতে আমি আয়নায় নিজেকে ঝাপসা দেখছিলাম। আর ব্যাপার এখন এতদূর গড়িয়েছে যে, সোজাসুজি নজরও আমার চলছে না। নাঃ, মাতাল যে হয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। তখন থেকে খামখেয়ালিপনা করছি, লোককে ভয় দেখাচ্ছি, জেগে-জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছি—অথবা বলা যেতে পারে, দেখতে পাচ্ছি না। কাল্পনিক দৃশ্য! দেবদূত!' তার গলার স্বর আরও নিচু হল, 'এসব পরি বা দেবদূতের কাজই হবে। ঠিক আমার পেছনে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুভ সন্ধ্যা, দেবদূত মশাই।'

'শুভ সন্ধ্যা।'

হেন্ডারসন বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল। ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। পরনে কালো আলখাল্লা, শুভ্র গর্বিত মুখমণ্ডল ঘিরে মাথার চুলের উজ্জ্বল দীপ্তি, চোখের রং আকাশ-নীল, এবং ওর ঠোঁটে জ্বলছে নরকের আগুন।

'তুমি কি বাস্তব?' আস্তে করে জিগ্যেস করল হেন্ডারসন, 'নাকি আমি বোকার মতো এক অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করে বসে আছি?'

'এই অলৌকিক ঘটনার নায়িকার নাম শীলা, ডার্লিং—এবং যদি আপনার আপত্তি না থাকে তা হলে এ নাকে একটু পাউডার লাগাতে চায়।'

'স্টিফেন হেন্ডারসনের সৌজন্যে এই আয়নাটা দয়া করে ব্যবহার করুন,' প্রশস্ত হেসে আলখাল্লা পরা লোকটি বলল। একাগ্র দৃষ্টি রেখে সে পিছিয়ে দাঁড়াল।

একবার হেন্ডারসন সগর্বে ঘোষণা করেছিল যে, প্রথম দেখায় প্রেম বলে কিছু নেই। শুধু গল্প-উপন্যাসে কিংবা নাটকেই এর সন্ধান পাওয়া যায়। সব প্রেমেরই মূল উৎস কামনা। কিন্তু এখন এই শীলা—এই সোনালি-চুল পরি—এসে তার সব ধ্যান-ধারণা একেবারে পালটে দিয়েছে। বিষণ্ণ চিন্তা, মদের নেশা, আয়নায় বোকা চোখে তাকানো, সব এখন তার মন থেকে উবে গেছে; সে পাগল হয়ে ডুবে গেছে লাল ঠোঁট, আকাশ-নীল চোখ আর শুভ্র দু-বাহুর স্বপ্নে।

হেন্ডারসনের ভাবনার কিছুটা অংশ ছলকে এসেছে তার চোখে, এবং আয়না থেকে চোখ সরিয়ে তাকাতেই মেয়েটি সেটা অনুভব করল।

'আশা করি পরীক্ষায় পাশ করতে পেরেছি?' ও বলল।

'তা বললে ভীষণ কম বলা হয়। কিন্তু স্বর্গীয় জীবদের সম্পর্কে একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে। পরিরা কি নাচতে পারে?'

'চালাক ভ্যাম্পায়ার।'

'ভীষণ চালাক—ট্র্যান্‌সিলভ্যানিয়ার জঙ্গলের ভ্যাম্পায়ারদের মতো নয়। আমার সঙ্গে মিশলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে, বিশ্বাস করো।'

'হ্যাঁ, দেখে-শুনে তাই মনে হচ্ছে,' ঠাট্টা করে বলল ও, 'কিন্তু এক পরি আর এক ভ্যাম্পায়ার—এ-বড় অদ্ভুত যোগাযোগ।'

'আমরা একে অপরকে শোধরাতে পারব,' হেন্ডারসন ধরিয়ে দিল ঃ 'তা ছাড়া, আমার মনে হচ্ছে, তোমার মধ্যে একটু-আধটু শয়তান রয়েছে। তোমার পরির

পোশাকের ওপরে এই কালো আলখাল্লা : কৃষ্ণ পরি। স্বর্গ থেকে না এসে তুমি হয়তো আমার দেশ থেকেই এসেছ।...আমরা কি এবার নাচের আসরে যাব?'

হাতে হাত ধরে ওরা বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকল। সবাই তখন পুরোদমে হুল্লোড় করছে। নেশার মাত্রা চরমে পৌঁছলেও নাচ তখন থেমে গেছে। নারী-পুরুষরা হাসিমুখে জোড়ায়-জোড়ায় ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ধরনের ভাসা-ভাসা পরিবেশ হেন্ডারসন অত্যন্ত অপছন্দ করে। সুতরাং, নিছকই প্রতিক্রিয়াবশে সে টানটান হয়ে দাঁড়াল, আলখাল্লার প্রান্ত কাঁধের চারদিকে ঝাপটা মারল। তার বিবর্ণ মুখে ফিরে এল বিকৃত অভিব্যক্তি। চিন্তাগ্রস্তভাবে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শীলা ব্যাপারটাকে এক বিরাট ঠাট্টা বলে ভাবল।

'ওদের ভ্যাম্পায়ারের অভিনয় করে দেখাও,' হেন্ডারসনের হাত ধরে ও খিলখিল করে হেসে উঠল। আর হেন্ডারসনও ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করে মেয়েদের ভয় দেখাতে লাগল। তার সাফল্য চিহ্নিত হল ঘুরে তাকানো মাথার সংখ্যায়, কলগুঞ্জনের আকস্মিক সমাপ্তিতে। জীবন্ত মৃত্যুর দূত হয়ে লম্বা বৈঠকখানা ঘরে সে পায়চারি করতে লাগল। ফিসফিস কথাবার্তা তাকে অনুসরণ করে চলল।

'কে এই লোকটা?'

'লিফটে আমরা এর সঙ্গেই উঠেছি, আর তখন—।'

'চোখগুলো দ্যাখো—।'

'ভ্যাম্পায়ার!'

'এই যে, ড্রাকুলা!' বক্তা মার্কাস লিন্ডস্ট্রম, সঙ্গে তার গোমড়ামুখো এক কৃষ্ণকেশী, পরনে ক্লিওপেট্রার পোশাক, চলন টলমল। নিয়ন্ত্রণকর্তা লিন্ডস্ট্রম তখন কোনওরকমে দু-পায়ে খাড়া হয়ে আছে। তার সঙ্গিনীর অবস্থাও তথৈবচ। ক্লাবে ভদ্রস্থ অবস্থায় যখন থাকে তখন লিন্ডস্ট্রমকে হেন্ডারসনের ভালো লাগে, কিন্তু সান্ধ্য সমাবেশে তার আচার-ব্যবহার রীতিমতো বিরক্তিকর। যেমন এই মুহূর্তে।

'সোনা, এসো, আমার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। হ্যাঁ, মশাই, আজকের এই ''হ্যালোউইন'' উৎসব উপলক্ষে কাউন্ট ড্রাকুলাকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি, এবং তাঁর মেয়েকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছি। কাউন্ট, আমার খেলার সাথীর সঙ্গে আলাপ করুন।'

কৃষ্ণকেশী কিওপেট্রা বঙ্কিম কটাক্ষে তাকাল হেন্ডারসনের দিকে।

'ওঃ ড্রাকুলা, আপনার চোখ দুটো কী বিরাট! কী লম্বা আপনার দাঁত। ওঃ—।'

'কী হচ্ছে, মার্কাস,' হেন্ডারসন প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণকর্তা ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরে উপস্থিত অন্য অতিথিদের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠেছে।

'বন্ধুগণ, আসুন, খাঁটি জিনিসের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই—সত্যিকারের একমাত্র জীবন্ত ভ্যাম্পায়ার। ড্রাকুলা হেন্ডারসন, নকল দাঁত লাগানো

pathagar.net

একমেবাদ্বিতীয়ম ভ্যাম্পায়ার।'

অন্য পরিস্থিতিতে হলে হেন্ডারসন লিন্ডস্ট্রমের চোয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে দিত। কিন্তু এখন শীলা রয়েছে, লোকজন রয়েছে। তার চেয়ে বরং ওর বিশ্রী ঠাট্টা নিয়ে একটু মজা করা যাক। কিছুক্ষণ ভ্যাম্পায়ার সাজলে ক্ষতি কী?

মেয়েটার দিকে চকিতে হেসে হেন্ডারসন টান-টান হয়ে দাঁড়াল, তাকাল অতিথিদের মুখোমুখি, তারপর ভয় দেখানো অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল। তার হাত আলখাল্লাটাকে ছুঁয়ে গেল। আশ্চর্য, পোশাকটা এখনও বরফের মতো ঠান্ডা। নীচের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম সে লক্ষ করল, পোশাকটা প্রান্তের দিকে একটু ময়লা; ধুলো কিংবা কাদা লেগেছে। কিন্তু লম্বা হাতে বুকের ওপর পোশাকটা টেনে দেওয়ার সময় ঠান্ডা সিল্কের কাপড়টা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেন পিছলে গেল। এই অনুভূতি হেন্ডারসনকে প্রেরণা জোগাল। চোখ খুলে বড়-বড় করে তাকাল সে : দৃষ্টিতে আগুন। তার ঠোঁট ফাঁক হল। নাটকীয় এক ক্ষমতা টের পেল সে। তাকাল মার্কস লিন্ডস্ট্রমের নরম স্ফীত ঘাড়ের দিকে। সাদা পটভূমিতে একটি নীল শিরা সেখানে তিরতির করে কাঁপছে। ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল হেন্ডারসন; দেখল, জনতা তাকে লক্ষ করছে, আর তারপরই এক ভয়ঙ্কর আবেগ তাকে গ্রাস করল। সে ঘুরে দাঁড়াল : চোখ সেই ভাঁজ পড়া ঘাড়ের ওপর—মোটা মানুষটার ভাঁজ পড়া দুধ-সাদা কম্পমান ঘাড়ের ওপর।

দুটো হাত ছিটকে গেল। লিন্ডস্ট্রম ভয় পাওয়া ইঁদুরের মতো চিঁ-চি করছে। মোটাসোটা চকচকে একটা সাদা ইঁদুর, রক্তে ফেটে পড়ছে। ভ্যাম্পায়াররা রক্ত ভালোবাসে। ইঁদুরটার ঘাড়ের শিরা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত।

'গরম রক্ত।'

এই গভীর কণ্ঠস্বর হেন্ডারসনের নিজের।

হাত দুটো হেন্ডারসনের নিজের।

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে যে-হাত দুটো লিন্ডস্ট্রমের গলা আঁকড়ে ধরেছে, অনুভব করেছে গলার উষ্ণতা, খুঁজে বের করেছে নীল শিরাটাকে। হেন্ডারসনের মুখ ঝুঁকে পড়েছে ঘাড়ের ওপর, এবং লিন্ডস্ট্রম ধস্তাধস্তি করতেই তার হাতের বাঁধন আরও শক্ত হল। লিন্ডস্ট্রমের মুখ ক্রমে গোলাপি হয়ে উঠেছে। রক্ত ছুটে যাচ্ছে মাথায়। এই তো চাই! রক্ত!

হেন্ডারসন হাঁ করল। হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করল দাঁতে। স্ফীত ঘাড়ের ওপরে সে ঝুঁকে পড়েছে। আর, তারপর...।

'থামো! ঢের হয়েছে!'

এ শীতল কণ্ঠস্বর শীলার। তার হাতে ওর আঙুলের ছোঁয়া। হেন্ডারসন চমকে চোখ তুলে তাকাল। ছেড়ে দিল লিন্ডস্ট্রমকে। সে মুখ হাঁ করে ঢলে পড়ল মেঝেতে।

জনতা অবাক চোখে তাকিয়ে। তাদের মুখ বিস্ময়সূচক 'ও' অক্ষরের আকৃতিতে

pathagar.net

প্রকট।

শীলা ফিসফিস করে বলল, 'শাবাশ! ঠিক শিক্ষা দিয়েছ—কিন্তু উনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন।'

নিজেকে গুছিয়ে নিতে সামান্য যুঝতে হল হেন্ডারসনকে। তারপর সে হেসে ঘুড়ে দাঁড়াল।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ', সে বলল, 'আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তা যে পুরোপুরি সত্যি সে-কথা প্রমাণের জন্যে এইমাত্র সামান্য নমুনা আপনাদের সামনে রেখেছি। আমি সত্যিই একজন ভ্যাম্পায়ার। যেহেতু এখন আপনাদের মোটামুটি সাবধান করে দিলাম, সেহেতু আমার বিশ্বাস, আপনাদের আর বিপদের ভয় নেই। যদি এখানে কোনও চিকিৎসক হাজির থেকে থাকেন, তা হলে আমি রক্তদানের ব্যবস্থা করতে পারি।'

'ও' অক্ষরের সীমারেখা নরম হল। সচকিত গলা দিয়ে সমস্বরে হাসি ফুটল। হেন্ডারসন পরিস্থিতিকে সামাল দিয়েছে। শুধু মার্কাস লিন্ডস্ট্রমের নজরে এখনও নগ্ন-আতঙ্ক। সে বুঝেছে।

মুহূর্তটি হঠাৎ হালকা হল। কারণ, ইতিমধ্যে জনৈক অতিথি নীচ থেকে কতকগুলো খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে, এবং কাগজওয়ালার অ্যাপ্রন ও টুপি পরে অভ্যাগতদের দিকে ছুটোছুটি করে সেগুলো বিক্রি করছে।

'টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম! পড়ুন। ভয়ঙ্কর হ্যালোউইন আতঙ্ক! টেলিগ্রাম!'

হাস্যমুখর অতিথিরা কাগজ কিনতে লাগল। একটি মহিলা শীলার কাছে এগিয়ে গেল। হেন্ডারসন আচ্ছন্নের মতো ওর চলে যাওয়া দেখল।

'পরে দেখা হবে,' ও ডেকে বলল। ওর চাউনি হেন্ডারসনের শিরায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু তবু সে লিন্ডস্ট্রমকে জাপটে ধরার মুহূর্তের অমানুষিক অনুভূতি ভুলতে পারছে না। কিন্তু কেন?

ছদ্মবেশী কাগজওয়ালার কাছ থেকে একটা কাগজ কিনল সে।

'ভয়ঙ্কর হ্যালোউইন আতঙ্ক,' লোকটা চেঁচিয়ে বলছিল। ব্যাপারটা কী?

ঝাপসা চোখ খবরের কাগজে খুঁজে বেড়ায়।

তারপরই হেন্ডারসন চমকে যায়। ওই তো শিরোনাম! ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠা আশঙ্কা নিয়ে খবরটার ওপরে নজর বুলিয়ে নেয় সে।

পোশাকের দোকানে অগ্নিকাণ্ড...রাত আটটার কিছু পরেই দমকলবাহিনীর লোকেরা খবর পেয়ে ছুটে যায়...আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে...ধ্বংস এবং চূর্ণ হয়ে যায়...ক্ষতির পরিমাণ...আশ্চর্যজনকভাবে, দোকানের মালিকের নাম জানা যায়নি... কঙ্কাল পাওয়া গেছে—।

'না।' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল হেন্ডারসন।

জায়গাটা বারবার পড়ল সে। দোকানের পাতালঘরে মাটি ভরতি একটা বাক্স পাওয়া গেছে। বাক্সটা একটা কফিন। আরও দুটো বাক্স ছিল, তবে খালি। কঙ্কালটা

একটা আলখাল্লায় জড়ানো ছিল, এবং আগুন তার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

এ ছাড়া কলমের নীচে বড়-বড় অক্ষরে শিরোনাম দিয়ে ছাপা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের মন্তব্য। জায়গাটা প্রতিবেশীরা ভয় পেত। হাঙ্গেরীয় প্রতিবেশীরা ভ্যাম্পায়ারবাদের ইঙ্গিত দিয়েছে; বলেছে, অদ্ভুত সব লোক দোকানটায় আসত। একজন বলেছে, সেখানে কোনও এক অশুভ চক্রের সভা বসত। দোকানে যেসব জিনিস বিক্রি হত, তার সম্পর্কে লোকের মনে ছিল অন্ধ কুসংস্কার—যেমন, প্রেম-জাগানো পানীয়, অদ্ভুত জড়িবুটি এবং রহস্যময় অলৌকিক ছদ্মবেশ।

রহস্যময় অলৌকিক ছদ্মবেশ...ভ্যাম্পায়ার আলখাল্লা...লোকটার চোখ দুটো!

'এই নিন...আপনার খাঁটি আলখাল্লা।'

'আমার চেয়ে এটা আপনার বেশি কাজে আসবে।'

হেন্ডারসনের মস্তিষ্কে এই সব কথার স্মৃতি চিৎকার করে উঠল। ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। ছুটে গেল দেওয়ালের আয়নার কাছে।

একটি মুহূর্ত। তারপরই সে চকিতে মুখের কাছে হাত তুলে যে-ছায়া আয়নায় পড়েনি তার কাছ থেকে...নিজের চোখ আড়াল করল। অদৃশ্য প্রতিবিম্ব। আয়নায় ভ্যাম্পায়ারদের ছায়া পড়ে না।

তাকে যে অদ্ভুত দেখাবে সে আর আশ্চর্য কী। ফরসা স্ফীত ঘাড় যে তাকে আকর্ষণ করবে সে আর আশ্চর্য কী। লিন্ডস্ট্রমকে সে মনে-প্রাণে চেয়েছে। ওঃ ভগবান!

এসবই ওই দাগ ধরা কালো আলখাল্লার কীর্তি। মাটির দাগ—কবরের মাটির দাগ। ঠান্ডা আলখাল্লাটা পরার পর থেকেই তার শরীরে জেগে উঠেছে সত্যিকারের ভ্যাম্পায়ারের অনুভূতি। এ এক অভিশপ্ত পোশাক; এই পোশাক একসময় শুয়ে ছিল কোন অ-মৃত শরীরের ওপরে। একটা হাতা বরাবর যে মরচে ধরার দাগ, সেটা নির্ঘাত রক্তের।

রক্ত। রক্ত দেখতে পেলে কী ভালোই না লাগবে। তার উষ্ণতা, বয়ে যাওয়া লাল জীবন। না। এ নেহাতই পাগলামি। হেন্ডারসন মাতাল হয়ে গেছে, হয়ে গেছে উন্মাদ।

'আঃ! আমার বিবর্ণ বন্ধু—ভ্যাম্পায়ার।'

শীলা আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু আতঙ্কে হেন্ডারসনের হৃৎপিণ্ড দ্রুত লয়ে বাজতে থাকে। ওর চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে, রক্তিম আমন্ত্রণের ইশারা জাগানো উষ্ণ ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে, হেন্ডারসন অনুভব করল উত্তাপের এক উদ্দাম তরঙ্গ। সপ্রভ কালো আলখাল্লার ওপরে বেরিয়ে থাকা ওর শুভ্র গলার দিকে তাকাল সে, এবং এক ভিন্ন ধরনের উষ্ণতা তীব্র হতে লাগল। ভালোবাসা, আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং এক তীব্র খিদে।

হেন্ডারসনের চোখে এসব নিশ্চয়ই ও দেখে থাকবে, কিন্তু ও এতটুকু কাঁপল না। বরং উত্তরে ওর দৃষ্টি জ্বলতে লাগল।

pathagar.net

শীলাও তাকে ভালোবাসে।

হঠাৎই এক ঝটকায় গলার কাছে থেকে আলখাল্লার বাঁধন খুলে ফেলল হেন্ডারসন। বরফের ভার থেকে সে মুক্ত হল। এখন সে স্বাধীন। যে-কোনও কারণেই হোক আলখাল্লাটা সে খুলতে চায়নি, কিন্তু খুলতে বাধ্য হয়েছে। পোশাকটা অভিশপ্ত। আর এক মিনিটের মধ্যেই সে হয়তো মেয়েটিকে কাছে টেনে নিত, ঠোঁটে এঁকে দিত ভালোবাসার চুমু, এবং—।

'ছদ্মবেশ ধরে ক্লান্ত?' শীলা জিগ্যেস করল। একই ভঙ্গিতে নিজের আলখাল্লাটাও খুলে ফেলল ও। ওর সোনালি চুলের বন্যা, ভাস্কর্যের মতো নিখুঁত সৌন্দর্য, হেন্ডারসনের গলায় এক অস্ফুট শব্দের জন্ম দিল।

পরমুহূর্তেই ওরা অতলান্ত আবেগে একে অপরকে কাছে টেনে নিল। হেন্ডারসন নিজের পোশাকের সঙ্গে ওর পোশাকটাও হাতে ধরে রইল। ওদের অনুসন্ধানী ঠোঁটে আকাঙ্ক্ষা বিনিময়ের মাঝপথে লিন্ডস্ট্রম ও একদল অতিথি সোচ্চারে ঘরে ঢুকল।

হেন্ডারসনকে দেখেই লিন্ডস্ট্রম শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল।

'তুমি—' সে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি—।'

'চলে যাচ্ছি,' হেন্ডারসন হাসল। মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে গেল খালি লিফটের দিকে। লিন্ডস্ট্রমের বিবর্ণ আতঙ্কগ্রস্ত মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল লিফটের দরজা।

যন্ত্রযান ওপরে উঠতে শুরু করল। ওদের ঠোঁট ততক্ষণে খুঁজে পেয়েছে পরস্পরকে। ভেজা পাখির মতো আশ্রয়ের আশায় হেন্ডারসনের বুকের আরও কাছে সরে এসে শীলা বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'ওপরে—ছাদের বাগানে।' অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল হেন্ডারসন।

জনশূন্য ছাদে এসে ওরা পা রাখল। আরও একবার হেন্ডারসনের মনে হল এ-রাত হ্যালোউইন-এর রাত।

আকাশের রং নীলের বদলে এখন কালো। গোলাকার কমলা-রং চাঁদের দিকে জরিপ-নজরে তাকিয়ে ঘুরে বেড়ানো দৈত্যদের ধূসর দাড়ির মতো মেঘ এখানে-ওখানে ঝুলছে। সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসছে ঠান্ডা বাতাস, আর বহু দূরে শোনা যাচ্ছে তরঙ্গের অস্ফুট উচ্ছ্বাস। একইসঙ্গে শীতও করছে।

'আমার পোশাকটা দাও,' শীলা ফিসফিস করে বলল। যান্ত্রিকভাবে পোশাকটা এগিয়ে দিল হেন্ডারসন। কাপড়টার কৃষ্ণদীপ্তিতে ঘুরপাক খেল মেয়েটির শরীর। ওর দু-চোখ জ্বলে উঠল হেন্ডারসনের দিকে, অনিবার্য আমন্ত্রণে তাকে ডেকে নিল কাছে। সে কাঁপতে-কাঁপতে চুমু খেল ওকে।

'তোমার গা কী ঠান্ডা,' মেয়েটি বলল, 'পোশাকটা পরে নাও।'

ঠিকই বলেছে, হেন্ডারসন নিজের মনে ভাবল। সুতরাং, ওর গলার দিকে তাকিয়ে তোমার আলখাল্লাটা পরে নাও। তারপর, পরের বার যখন ওকে চুমু খাবে,

pathagar.net

তখন ওর গলাটা চাইবে, আর ও ভালোবেসে নিজের গলা এগিয়ে দেবে তোমার দিকে। তখন তুমি সেটা গ্রহণ করবে প্রচণ্ড—খিদেয়।

'ওটা পরে নাও, সোনা,' মেয়েটি ফিসফিস করে উঠল। ওর চোখ অধৈর্য, হেন্ডারসনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় জ্বলছে।

হেন্ডারসন কেঁপে উঠল।

এই অন্ধকারের আলখাল্লা পরে নেব? যে-আলখাল্লা কবরের, মৃত্যুর, ভ্যাম্পায়ারের? অশুভ আলখাল্লা—যার নিজস্ব শীতল প্রাণ বদলে দিয়েছে তার মুখ, মন?

'এই যে।'

মেয়েটির তন্বী বাহু এখন তাকে ঘিরে, আলখাল্লাটা ঠিক করে বসিয়ে দিচ্ছে দু-কাঁধের ওপর। আলখাল্লার বাঁধনটা দেওয়ার সময় ওর আঙুল আদর করে ছুঁয়ে গেল হেন্ডারসনের ঘাড়।

ঠিক তখনই সে টের পেল—তার শরীরের বরফ শীতলতা ক্রমে পরিণত হচ্ছে এক ভয়ঙ্কর উত্তাপে। সে নিজে যেন স্ফীত হয়ে উঠেছে, মুখ হয়ে উঠেছে বিকৃত। এরই নাম ক্ষমতা।

আর তার সামনে দাঁড়ানো মেয়েটার দু-চোখে শ্লেষ, এবং দুরন্ত আমন্ত্রণ। সে আমন্ত্রণ তার প্রতি, তার ঠোঁটের প্রতি। তার দাঁতের প্রতি।

না—এ হতে পারে না। হেন্ডারসন ওকে ভালোবাসে। এই ভয়ঙ্কর উন্মত্ততাকে জয় করবে সেই ভালোবাসা। হ্যাঁ, আলখাল্লাটা পরে নাও, প্রতিরোধ করো সেটার অশুভ ক্ষমতা, আর ওকে বুকে টেনে নাও মানুষ হিসেবে, শয়তান অমানুষ হিসেবে নয়।

এ তাকে পারতেই হবে। এটাই একমাত্র পরীক্ষা।

'শীলা, তোমাকে একটা কথা আমি না বলে পারব না।'

ওর চোখ। কী অদ্ভুত নেশা ধরানো। না, একটুও কষ্ট হবে না।

'শীলা, একটু শোনো। আজ রাতের কাগজটা পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওই...ওই দোকান থেকে আমার পোশাকটা কিনেছি। আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। লিন্ডস্ট্রমকে আমি কেমন করে ধরেছিলাম তা তো তুমি দেখেছ। আমি চেয়েছিলাম তার শেষ দেখতে। বুঝতে পারছ আমার কথা? আমি...আমি ওকে...কামড়ে দিতে চেয়েছিলাম। এই পোশাকটা পরে নিজেকে কেমন যেন অন্য কিছু মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি, শীলা।'

'জানি।' চাঁদের আলোয় ওর চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

'আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। এই আলখাল্লাটা পরে আমি তোমাকে চুমু খাব। আমি দেখাতে চাই, আমার ভালোবাসা এই—এই পোশাকটার চেয়ে শক্তিমান।

pathagar.net

যদি আমি দুর্বল হয়ে পড়ি, তা হলে কথা দাও, আমার হাত ছাড়িয়ে সেই মুহূর্তে তুমি ছুটে পালাবে। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই আমাকে লড়াই করতে হবে; আমি চাই তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এইরকম খাঁটি হোক, শক্তিশালী হোক। তোমার কী ভয় করছে?'

'না।' ও এখনও হেন্ডারসনের দিকে তাকিয়ে, এবং তার অপলক চোখ ওর নরম গলার দিকে। যদি ও জানত হেন্ডারসনের মনে কী রয়েছে।

'আমাকে নিশ্চয়ই তুমি পাগল ভাবছ না? আমি ওই পোশাকের দোকানটায় গিয়েছিলাম—দোকানদার এক ভয়ঙ্কর খুদে বুড়ো—সে-ই আমাকে এই আলখাল্লাটা দিয়েছিল। এমনকী বলেছিল, এটা সত্যিকারের একজন ভ্যাম্পায়ারের পোশাক। ভেবেছিলাম, লোকটা ঠাট্টা করছে, কিন্তু আজ রাতে আয়নায় আমি নিজেকে দেখতে পাইনি। আমি লিন্ডস্ট্রমের ঘাড়ে দাঁত বসাতে চেয়েছিলাম, আর এখন তোমাকে চাইছি। কিন্তু যাচাই আমাকে করতেই হবে।'

মেয়েটির মুখভঙ্গি তাকে ঠাট্টা করল। হেন্ডারসন শরীরে শক্তি সঞ্চয় করল। সে ঝুঁকে পড়ল সামনে। মনে আবেগের যুদ্ধ। একমুহূর্ত সে সর্বনাশা কমলা-চাঁদের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিকৃত হল তার মুখ।

আর মেয়েটি তাকে লোভ দেখাতে লাগল।

ওর অদ্ভুত অস্বাভাবিক রক্তিম ঠোঁট চিরে গেল এক রুপোলি কর্কশ হাসিতে। আলতো করে হেন্ডারসনের গলা জড়িয়ে ধরতে কালো আলখাল্লার আবরণ সরিয়ে শ্বেতশুভ্র দুটি বাহু উঠে এল ঃ 'জানি, গো, জানি...আয়নায় তাকিয়েই আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার আলখাল্লাটাও আমার মতো...সেই দোকান থেকেই কিনেছ...আমারটা যেখান থেকে কিনেছি...।'

অবাক স্তম্ভিত হেন্ডারসন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। বিচিত্রভাবে শীলার ঠোঁট তার ঠোঁটকে পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর সে গলায় অনুভব করল ওর ছোট্ট ধারালো দাঁতের বরফ-কঠিনতা, এক অদ্ভুত মিষ্টি আমেজ-ভরা দংশন, এবং এক অন্ধকারের ঢেউ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে ধীরে-ধীরে গ্রাস করল তাকে।

pathagar.net

আপনারই একান্ত, জ্যাক দ্য রিপার

রবার্ট ব্লক

pathagar.net

নাটকের 'আদর্শ ইংরেজ' ভদ্রলোকটির দিকে তাকালাম। তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে।

'স্যার গাই হলিস?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'অবশ্যই। আমি কি মনস্তত্ত্ববিদ জন কার্মডির সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করছি?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আমার দু-চোখ খেলে বেড়াল বিশিষ্ট আগন্তুকের শরীরে। দীর্ঘকায়, কৃশ, বালি-রং চুল—সঙ্গে ঐতিহ্যগত পুরুষ্টু গোঁফ, এবং পশমী স্যুট। সন্দেহ হল, একটা এক-চক্ষু চশমা হয়তো ভদ্রলোকের জামার পকেটে লুকোনো রয়েছে, আর সঙ্গের ছাতাটিকে তিনি বাইরের ঘরে রেখে এসেছেন কি না কে জানে।

কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম এই কথা ভেবে, কোন পবিত্র কারণ ইংরেজ দূতাবাসের স্যার গাই হলিসকে এই শিকাগোয় আমার মতো একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে বাধ্য করেছে।

স্যার গাই বসলেন—সমস্যার কোনও সুরাহা না করেই। তিনি গলাখাঁকারি দিলেন, দ্বিধাভরা চঞ্চল চোখে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলেন, টেবিলের গায়ে হাতের পাইপটাকে বারকয়েক ঠুকলেন, তারপর মুখ খুললেন।

'লন্ডন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?' তিনি বললেন।

'কেন—?'

'আপনার সঙ্গে আমি লন্ডন নিয়ে আলোচনা করতে চাই, মিস্টার কার্মডি।'

সবরকমের মালই এখানে জোটে। তাই আমি শুধু হাসলাম, হেলান দিয়ে বসলাম চেয়ারে, এবং ভদ্রলোককে ধীরে-সুস্থে বলার সময় দিলাম।

'ওই শহরটা সম্পর্কে কখনও অদ্ভুত কিছু আপনার নজরে পড়েনি?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'বলতে পারেন, ওখানকার কুয়াশা বিখ্যাত।'

'হ্যাঁ, কুয়াশা। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কুয়াশাই নিখুঁত পটভূমি জুগিয়ে সাহায্য করে।'

'কিসের পটভূমি?'

স্যার গাই হলিসের ঠোঁটে হেঁয়ালি ভরা হাসি খেলে গেল।

'খুনের।' তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

'খুনের?'

'হ্যাঁ। কখনও কি এটা আপনার নজরে পড়েনি যে, খুন নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, তাঁদের সঙ্গে এত শহর থাকতে শুধু লন্ডনেরই এক অদ্ভুত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে?'

সাধারণত গল্প-উপন্যাসে ছাড়া এ ধরনের কথাবার্তা মানসিক রুগিরা বলে না। তবুও এঁর কথায় চিন্তার খোরাক আছে। খুনের আদর্শ অকুস্থল হিসেবে লন্ডনের ভূমিকা!

স্যার গাই বললেন, 'আপনার কথামতো, তার একটা স্বাভাবিক কারণ রয়েছে। ওই কুয়াশা সৃষ্টি করে আদর্শ পরিবেশ। আর তা ছাড়া এধরনের ব্যাপারে ইংরেজদের মনোভাবও একটু অদ্ভুত। বলতে পারেন, সেটা তাঁদের খেলোয়াড়ি মেজাজ। তাঁরা খুনের ব্যাপারটাকে নিছকই একটা খেলা হিসেবে দেখেন।'

সোজা হয়ে বসলাম। এবারে পাওয়া যাচ্ছে তত্ত্বের আভাস।

'যা বলছিলাম—খুনের পরিসংখ্যান শুনিয়ে আপনাকে আমি বিরক্ত করতে চাই না। তার জন্যে সরকারি নথিপত্র রয়েছে। নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে, মেজাজের দিক থেকে, শুধুমাত্র নৃশংস খুনের প্রতিই ইংরেজরা কৌতূহলী।

'কোনও মানুষ খুন করে। তারপরই শুরু হয় আসল উত্তেজনা। শুরু হয় খেলা। অপরাধী কি পারবে বুদ্ধির লড়াইয়ে পুলিশকে টেক্কা দিতে? খবরের কাগজে প্রকাশিত খবরের নিহিত লক্ষ্য আপনি সহজেই বুঝতে পারেন। প্রত্যেকেই মগ্ন একই প্রতীক্ষায়—কে জিতবে।

'ব্রিটিশ আইনে একজন বন্দিকে নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী বলে মনে করা হয়। এটাই তাদের বিরাট সুবিধে। কিন্তু প্রথম সেই বন্দিকে ওদের বন্দি করতে হবে। আবার লন্ডন পুলিশকে সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হয় না। সেটা আবার ফেরারি আসামির পক্ষে একটা মস্ত বড় সুবিধে। দেখছেন তো?

pathagar.net

সবই আপনার খেলার নিয়মে ছক বাঁধা।'

স্যার গাই কোন লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন, বুঝলাম না। কোনও সিদ্ধান্তে, না পাগলা গারদে। কিন্তু মুখ বুজে থেকে তাঁকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিলাম।

'খুনিদের প্রতি এই ব্রিটিশ মনোভাবের যুক্তিসম্মত ফলাফল—শার্লক হোমস।' তিনি বললেন, 'কখনও কি খেয়াল করেছেন, ইংরেজদের গল্পে এবং নাটকে খুনের ঘটনা কী অসম্ভব জনপ্রিয়?'

হাসলাম। প্রসঙ্গ এবারে আমার আওতার মধ্যে ফিরে এসেছে।

'অ্যাঞ্জেল স্ট্রিট।' উদাহরণ হিসেবে নাম করলাম।

'লেডিজ ইন রিটায়ারমেন্ট,' তিনি বলে চললেন, 'নাইট মাস্ট ফল।'

'পেমেন্ট ডেফার্ড,' আমি যোগ করলাম, 'লেবারনাম গ্রোভ। কাইন্ড লেডি। লাভ ফ্রম এ স্ট্রেঞ্জার। পোর্ট্রেট অফ এ ম্যান উইথ রেড হেয়ার। ব্ল্যাক লাইমলাইট।'

তিনি মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন: 'অ্যালফ্রেড হিচকক আর এমলিন উইলিয়াম্‌স-এর ছবিগুলোর কথা ভেবে দেখুন। তাদের অভিনেতারা—উইলফ্রেড লসন আর লেসলি ব্যাঙ্কস।'

'চার্লস লটন,' আমি তাঁর হয়ে খেই ধরলাম, 'এডমন্ড জেন। বেসিল র‍্যাথবোন। রেমন্ড ম্যাসি। স্যার সেডরিক হার্ডউইক।'

'এসব নিয়ে আপনিও বেশ খোঁজ-খবর রাখেন দেখছি।' আমাকে বললেন তিনি।

'মোটেও না।' আমি হাসলাম, 'আমি একজন মনস্তত্ত্ববিদ।'

তারপর আমি সামনে ঝুঁকে এলাম। গলার সুর এতটুকুও পালটালাম না। মিঠে সুরে বললাম, 'আমি শুধু জানতে চাই, আপনি আমার অফিসে এসে হঠাৎ খুনের রগরগে গল্প নিয়ে আলোচনা ফাঁদলেন কেন।'

কথাটা জায়গামতো বিঁধল। তিনি সোজা হয়ে বসলেন, বারকয়েক চোখ পিটপিট করলেন।

'আমার আসল উদ্দেশ্য মোটেই তা নয়,' তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'না—মানে আমি প্রথমে একটা তত্ত্ব খাড়া করতে চাইছিলাম—।'

'ন্যাকামো ছাড়ুন, স্যার গাই,' আমি বললাম, 'নিন, এবার ঝেড়ে কাশুন দেখি।'

চোর-ছ্যাঁচোড়ের মতো কথাবার্তা বলাটা ফলিত মনস্তত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতির অন্যতম। অন্তত আমার ক্ষেত্রে সেটা বেশ কাজ দেয়।

এখনও দিল।

স্যার গাই বকবকানি বন্ধ করলেন। তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে এল।

আবার যখন তিনি সামনে ঝুঁকে এলেন, তখন তাঁর মুখে-চোখে আসল প্রসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার মাপা অভিব্যক্তি।

pathagar.net

'মিস্টার কার্মডি,' তিনি বললেন, 'কখনও—জ্যাক দ্য রিপারের নাম শুনেছেন?'

'বিখ্যাত খুনি?' প্রশ্ন করলাম।

'ঠিক ধরেছেন। সকলের সেরা নৃশংস খুনি। স্প্রিং-হিল জ্যাক অথবা ক্রিপেন-এর চেয়েও কুখ্যাত। জ্যাক দ্য রিপার! রেড জ্যাক!'

'নাম শুনেছি।' আমি বললাম।

'ওর পুরো ইতিহাস জানেন?'

আবার রূঢ় হলাম। 'দেখুন স্যার গাই,' নিচু গলায় বললাম, 'ইতিহাসের বিখ্যাত খুন-খারাপির গপ্পো নিয়ে আমড়াগাছি করে কাজের কাজ কিছু হবে না।'

আবার সরাসরি লক্ষ্যভেদ। তিনি গভীর শ্বাস নিলেন।

'এটা গপ্পো নিয়ে আমড়াগাছি নয়। জীবন-মরণ সমস্যা।'

নিজের আচ্ছন্নতায় তিনি এত মগ্ন যে, এই সুরেও কথা বলতে পারলেন।

'যাকগে, শুনতে আমি রাজি। আমরা মনস্তত্ত্ববিদেরা শোনার জন্যেই পয়সা পাই।'

'বলুন,' তাঁকে বললাম, 'গল্পটা শোনা যাক।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে স্যার গাই গল্পে মন দিলেন।

'লন্ডন, ১৮৮৮,' তিনি শুরু করলেন, 'গ্রীষ্মের শেষ এবং নিয়মিত সময়ের আগেই শীতের শুরু। ঠিক সেই সময়। কে জানে, কোথা থেকে আবির্ভূত হল জ্যাক দ্য রিপারের ছায়াময় শরীর—ছুরি হাতে মার্জার-চরণ এক অন্ধকার ছায়া, লন্ডনের ইস্ট-এন্ড জুড়ে যার আনাগোনা। হোয়াইট চ্যাপেল, স্পিট্যালফিল্ড্স-এর জীর্ণ আনাচে-কানাচে যার তরান্বিত চলাচল। কোথা থেকে সে এসেছে, কেউ জানে না। কিন্তু সে নিয়ে এসেছে মৃত্যু। ছুরির ফলায় মৃত্যু।

'ছ'বার সেই ছুরি নেমে এসেছে লন্ডনের মেয়েদের গলা, শরীর, চিরে ফালাফালা করতে। বেশ্যা ও হাফগেরস্ত মেয়েরাই হয়েছে তার শিকার। প্রথম খুনের দিনটা ছিল সাতই আগস্ট। মেয়েটার মৃতদেহে ওরা ঊনচল্লিশটা ছুরির আঘাত আবিষ্কার করে। নৃশংস খুন সন্দেহ নেই! একত্রিশে আগস্ট আর-একজন। খবরের কাগজওয়ালারা এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল। বস্তির বাসিন্দারা হল আরও গভীরভাবে আগ্রহী।

'কে এই অজ্ঞাত জল্লাদ, যে তাদের মাঝে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাতের শহরে নির্জন গলিপথে খুশিমতো আঘাত হানছে চকিতে? আর তার চেয়েও বেশি জরুরি হল—আবার কবে সে আঘাত হানবে?

'সে-দিনটা হল আটই সেপ্টেম্বর। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নতুন-নতুন লোক নিয়োগ করল এ-রহস্যের সমাধানে। গুজব ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। খুনের অতি-নৃশংস পদ্ধতি হয়ে উঠল আতঙ্কঘন অনুমানের বিষয়বস্তু।

'খুনি ব্যবহার করেছে ছুরি—অত্যন্ত দক্ষভাবে। সে গলা কাটে। তার শিকার

pathagar.net

ও পরিবেশ বেছে নেয় অমানুষিক ধূর্ততায়। কেউ তাকে দ্যাখে না, তার আসা-যাওয়ার শব্দ শোনে না। অথচ ভোরবেলার পাহারাদাররা দৈনন্দিন রোঁদের পথে হোঁচট খায় কুপিয়ে কাটা একটা ভয়ঙ্কর জিনিসে, যা রিপারের হস্তশিল্পের অকাট্য নিদর্শন।

'কে সে? সে কী কোনও পাগল শল্য চিকিৎসক? কোনও কসাই? কোনও পাগল বিজ্ঞানী? অপরাধী-আশ্রম থেকে পালিয়ে আসা কোনও বিকারগ্রস্ত অমানুষ? কোনও উন্মত্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি? লন্ডন পুলিশের কোনও লোক?

'তারপর খবরের কাগজে বেরোল সেই কবিতাটি। বিভিন্ন অনুমানের শেষে পূর্ণচ্ছেদ টানতে যে-কবিতার অজ্ঞাতকুলশীল আবির্ভাব—কিন্তু—কার্যত সেটা জনসাধারণের কৌতূহলকে টেনে নিয়ে গেল উন্মাদনার তুঙ্গে ঃ তার একটা ব্যঙ্গ ভরা ছোট্ট প্যারা হল ঃ

জল্লাদ নই আমি, নই কোনও খোকা
নই পরদেশি কাপ্তেন খেলোয়াড়,
শুধু আমি আপনার বন্ধু ও সখা,
আপনারই একান্ত—জ্যাক দ্য রিপার।

'আর তিরিশে সেপ্টেম্বর বিচ্ছিন্ন হল আরও দুটো কণ্ঠনালী।'

মুহূর্তের জন্যে স্যার গাইকে বাধা দিলাম ঃ 'তাই নাকি?' আগ্রহ-বিস্ময়ের সুরে মন্তব্য করলাম। বলতে বাধা নেই, ব্যাঙ্গের একটা সূক্ষ্ম প্রলেপ আমার স্বরে জায়গা করে নিল।

কিন্তু তিনি মানসিক হোঁচটের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেও বক্তব্যের প্রবাহে নিখুঁত রইলেন:

'এরপর কিছুদিন চুপচাপ ছিল লন্ডন। চুপচাপ এবং একইসঙ্গে অজানা এক আতঙ্ক। রেড জ্যাক আবার কখন তার আঘাত হানবে? গোটা অক্টোবর কেটে গেল প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায়। কুয়াশার আস্তরণ তার অশরীরী উপস্থিতি লুকিয়ে রাখে। লুকিয়ে রাখে নিখুঁতভাবে—কারণ, রিপারের পরিচয় অথবা উদ্দেশ্য কিছুই জানতে পারে না লোকে। লন্ডনের বেশ্যারা নভেম্বরের শুরুর নগ্ন হাওয়ায় কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে, এবং প্রতিদিনের নতুন সূর্য দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।

'নয়ই নভেম্বর। ওরা মেয়েটাকে আবিষ্কার করল নিজের ঘরে। অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে ও পড়ে আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপাটিভাবে সাজানো। আর ওর পাশে, সমান পরিপাটিভাবে সাজানো ওর মাথা এবং হৃৎপিণ্ড। হননের পরাকাষ্ঠায় নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছে রিপার।

'তারপর আতঙ্ক। কিন্তু সে-আতঙ্ক অকারণে। খবরের কাগজওয়ালা, পুলিশ এবং জনসাধারণ, সকলে অসুস্থ তরাসে প্রতীক্ষা করলেও জ্যাক দ্য রিপার ও তার ছুরি নীরব রইল।

pathagar.net

'মাস কেটে গেল। বছর কেটে গেল। তাৎক্ষণিক কৌতূহল কমে এলেও স্মৃতির রেখা অস্পষ্ট হল না। লোকে বলতে লাগল, জ্যাক আমেরিকায় আস্তানা নিয়েছে; সে আত্মহত্যা করেছে। লোকে বলতে লাগল—আর একইসঙ্গে চলল ওদের লেখালেখি। ওদের লেখা কখনও থামেনি। তত্ত্ব, অনুমান, তর্ক, আলোচনা। কিন্তু আজও কেউ জানে না কে এই জ্যাক দ্য রিপার। কেন সে খুন করত। কেন সে হঠাৎই স্তব্ধ হল।'

স্যার গাই নীরব হলেন। স্পষ্টতই তিনি আমার তরফ থেকে কোনও মন্তব্য আশা করছেন।

'আপনি গল্পটা বলেছেন ভালোই,' মন্তব্য করলাম, 'যদিও আবেগকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন।'

'সমস্ত নথিপত্র আমার হাতে আছে,' বললেন স্যার গাই হলিস, 'অস্তিমান সমস্ত তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলো বিচার করে দেখেছি।'

উঠে দাঁড়ালাম। হাই তুললাম—ব্যঙ্গ ভরা ক্লান্তিতে: 'যাক আপনার ঘুমপাড়ানি গল্প আমার দারুণ ভালো লেগেছে, স্যার গাই। ইংরেজ দূতাবাসের কর্তব্যে ক্ষান্তি দিয়ে আপনি যে আমার মতো হতভাগ্য এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে এসেছেন এবং আপনার ক্ষুদ্র কাহিনি শুনিয়ে আমাকে পরিতৃপ্ত করেছেন সে আপনার মহানুভবতা।'

মিষ্টি চাবুকের আঘাত তাঁর ক্ষেত্রে মন্ত্রের মতো কাজ দিল।

'আপনি হয়তো জানতে চান, এসব নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন?' তিনি তীব্র স্বরে বললেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক সেই কথাটাই আমি জানতে চাই। এ নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?'

'কারণ, বর্তমানে আমি জ্যাক দ্য রিপারকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।' বললেন স্যার গাই হলিস, 'আমার ধারণা, সে এখানে—শিকাগোয় রয়েছে।'

আবার বসলাম। এবারে আমার চোখ পিটপিট করার পালা।

'আর একবার বলুন তো।' তোতলা সুরে বললাম।

'জ্যাক দ্য রিপার বেঁচে আছে। এই শিকাগোয় আছে। আমি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি।'

'এক মিনিট,' আমি বললাম, 'এক মিনিট।'

তাঁর মুখে হাসি নেই, সুতরাং কথাটা মোটেই কোনও রসিকতা নয়। আমি বললাম, 'আচ্ছা, ওই খুনগুলো কোন সময়ে হয়েছিল?'

'১৮৮৮-র আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে।'

'১৮৮৮? তা হলে ১৮৮৮-তে জ্যাক দ্য রিপার যদি একজন সমর্থ পুরুষ হয়ে থাকে, তা হলে এখন সে নির্ঘাত মারা গেছে। আরে মশাই—সেই বছরে যদি তার

pathagar.net

জন্মও হয়ে থাকে, তা হলেও আজ সেই লোকের বয়েস হবে পাক্কা পঞ্চান্ন।'

'সেই লোকের বয়েস?' হাসলেন স্যার গাই হলিস: 'নাকি বলব, সেই স্ত্রীলোকের বয়েস? কারণ জ্যাক দ্য রিপার স্ত্রীলোকও হতে পারে। হতে পারে আরও অনেক কিছু।'

'স্যার গাই,' আমি বললাম, 'আপনি দেখছি ঠিক লোকের কাছেই এসেছেন। সত্যি-সত্যিই আপনার একজন মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্যের দরকার।'

'হয়তো। কিন্তু বলুন মিস্টার কার্মডি, আপনার কি মনে হয়, আমি পাগল?'

তাঁর দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালাম। কিন্তু সত্যি জবাবটাই আমাকে দিতে হল। 'খোলাখুলি বলতে গেলে—না, মনে হয় না।'

'তা হলে জ্যাক দ্য রিপার যে আজও বেঁচে আছে, আমার এই বিশ্বাসের যুক্তি আর কারণগুলো আপনি হয়তো শুনতে পারেন।'

'পারি।'

'এই ঘটনাগুলো নিয়ে আমি তিরিশ বছর ধরে গবেষণা করেছি। সরেজমিনে তদন্ত করেছি। সরকারি অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি। যে-হতভাগ্য বেশ্যারা মারা গেছে, তাদের বন্ধুবান্ধব পরিচিতজনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। স্থানীয় পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করেছি। জ্যাক দ্য রিপার সম্পর্কে যাবতীয় অস্তিমান তথ্য সংগ্রহ করে আমি একটা গোটা লাইব্রেরি বানিয়ে ফেলেছি। সমস্ত আজগুবি উদ্ভট সম্ভাবনা খতিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি।

'কিন্তু জেনেছি খুব সামান্যই। খুব বেশি নয়, সামান্যই। আমার সিদ্ধান্তের মিছিল শুনিয়ে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। কিন্তু তদন্তের অন্য একটা ভিন্ন দিক আমাকে অনেক বেশি সুফল এনে দিয়েছে। আমি অমীমাংসিত অপরাধ নিয়ে বেশ কিছু চর্চা করেছি। অর্থাৎ, অমীমাংসিত খুন নিয়ে।

'পৃথিবীর বড় শহরগুলোর অন্তত অর্ধেকের খবরের কাগজের কাটিং আপনাকে আমি দেখাতে পারি। সানফ্রান্সিসকো। সাংহাই। ক্যালকাটা। অমস্ক। প্যারিস। বার্লিন। প্রিটোরিয়া। কায়রো। মিলান। অ্যাডিলেড।

'রিপারের পদক্ষেপের ইঙ্গিত সেখানে রয়েছে, রয়েছে একই পদ্ধতির নকশা। অমীমাংসিত রহস্য। মহিলাদের বিচ্ছিন্ন কণ্ঠনালী। সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গ ও বিভিন্ন বিকৃতি। হ্যাঁ, বলতে গেলে রক্তের রেখাই আমি অনুসরণ করেছি। নিউ-ইয়র্ক থেকে ইউরোপ অতিক্রম করে পশ্চিমদিকে। সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। তারপর আফ্রিকা। ১৯১৪-১৮-তে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পটভূমি ছিল ইউরোপ। তারপর, দক্ষিণ আমেরিকা। এবং ১৯৩০ থেকে আবার আমেরিকা। একই ধরনের সাতাশিটা খুন—এবং অভিজ্ঞ অপরাধ-বিজ্ঞানীর কাছে প্রতিটি খুনেই উপস্থিত রিপারের হস্তশিল্পের স্পষ্ট ছাপ।

pathagar.net

'সম্প্রতি ঘটে গেল ক্লিভল্যান্ডের ওই হাত-পাবিহীন ধড়গুলোর ঘটনা। মনে পড়ে? শিউরে ওঠার মতো ব্যাপার। আর সব শেষে, শিকাগোয় ঘটে যাওয়া দুটো সাম্প্রতিক মৃত্যু। গত ছ'মাসের মধ্যে। একটা সাউথ ডিয়ারবর্নে। অন্যটা হ্যালস্টেডের কাছাকাছি। একই ধরনের খুন, একই পদ্ধতি। আমি বলছি, ওই সমস্ত ঘটনায় অভ্রান্ত ইঙ্গিত রয়েছে—জ্যাক দ্য রিপারের স্বাক্ষরের অভ্রান্ত ইঙ্গিত!'

আমি নিঃশব্দে হাসলাম।

'বড় কষ্টকল্পিত তত্ত্ব।' বললাম আমি, 'আপনার সিদ্ধান্ত অথবা সাক্ষ্য নিয়ে কোনও সন্দেহের প্রশ্ন আমি তুলছি না। এক্ষেত্রে আপনিই হলেন অপরাধ-বিজ্ঞানী—সুতরাং আপনার কথাই আমি ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিচ্ছি। শুধু একটা সামান্য জিনিস ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। একটা তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু সম্ভবত, এর উল্লেখের দরকার আছে।'

'কী সেটা?' জানতে চাইলেন স্যার গাই।

'কী করে একজন, ধরা যাক, পঁচাশি বছরের মানুষের পক্ষে এই খুনগুলো করা সম্ভব? কারণ যদি ১৮৮৮ সালে রিপারের বয়েস মোটামুটি তিরিশ হয়ে থাকে এবং সে আজও বেঁচে থাকে, তা হলে এখন তার বয়েস হবে পঁচাশি।'

স্যার গাই হলিস নীরব। তাঁকে কোণঠাসা করতে পেরেছি। কিন্তু—।

'ধরুন, যদি তার বয়েস একটুও না বেড়ে থাকে?' ফিসফিস করে বললেন স্যার গাই।

'তার মানে?'

'ধরুন, যদি জ্যাক দ্য রিপারের বয়েস না বেড়ে থাকে? যদি সে এখনও একজন যুবক থেকে থাকে?

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'এখনকার মতো তাই ধরে নিলাম। কিন্তু তারপর এসব ধরাধরি থামিয়ে আমার নার্সকে ডাকা দরকার আপনাকে চেপে ধরতে।'

'আমি ঠাট্টা করছি না।' বললেন স্যার গাই।

'এখানে যারা আসে তারা কেউই ঠাট্টা করে না,' তাঁকে বললাম, 'আর সেটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা, তাই না? তারা হলফ করে বলে যে, তারা নানারকম কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, দৈত্য-দানো দেখতে পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাদের তালাবন্ধ ঘরে আটকে রাখি।'

কথাগুলো নিষ্ঠুর হলেও ফল পাওয়া গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, তাকালেন আমার চোখে।

'মানছি, আমার তত্ত্ব নিতান্তই আজগুবি,' তিনি বললেন, 'রিপার সম্পর্কে যত তত্ত্ব আছে সবই আজগুবি। যেমন, সে ডাক্তার ছিল। অথবা কোনও বিকারগ্রস্ত অমানুষ। কোনও মহিলা। এই সব বিশ্বাসের পেছনে যেসব যুক্তি খাড়া করা হয়েছে,

pathagar.net

তা নেহাতই পলকা। অটল যুক্তি খাড়া করার কোনও সূত্র আমাদের হাতে নেই। তা হলে আমার তত্ত্বই বা এদের চেয়ে কী এমন বেশি আজগুবি?'

'কারণ প্রত্যেক মানুষের বয়েস বাড়ে।' আমি যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, 'ডাক্তার বলুন, পাগল বলুন, আর মেয়েই বলুন।'

'কিন্তু—মায়াবীদের ক্ষেত্রে।'

'মায়াবী?'

'জাদুকর। ডাইনি। যারা ডাকিনীবিদ্যার চর্চা করে?'

'কী বলতে চান আপনি?'

'আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি,' বললেন স্যার গাই, 'সমস্ত খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছি। বেশ কিছুদিন ধরে আমি খুনের দিনগুলো মনোযোগে পরীক্ষা করে দেখলাম। দিনগুলোর গড়ে তোলা ছক, নকশা। তাদের ছন্দ। সৌর, চান্দ্র ও নাক্ষত্র ছন্দ। নক্ষত্রগত দৃষ্টিভঙ্গি। জ্যোতিষবিদ্যাগত তাৎপর্য।'

লোকটা সত্যিই পাগল। কিন্তু তবুও শুনে চললাম।

'যদি ধরে নেওয়া যায়, জ্যাক দ্য রিপার শুধুমাত্র খুন করার জন্যেই খুন করেনি? ধরুন, সে চেয়েছিল—নরবলি দিতে?'

'কীসের নরবলি?'

স্যার গাই কাঁধ ঝাঁকালেন ঃ 'বলা হয় যে, অপদেবতাদের উদ্দেশে কেউ রক্ত উৎসর্গ করলে দেবতারা তাকে বর দেন। হ্যাঁ, যদি উপযুক্ত সময় সেই রক্ত উৎসর্গ করা যায়—যখন চন্দ্র এবং নক্ষত্রের অবস্থান কোনও বিশেষ অবস্থানে নির্ভুল থাকে এবং উপযুক্ত অনুষ্ঠান করে ব্যাপারটা করা যায়—তারা তখন বর দেন। যৌবন লাভের বর। চিরযৌবন।'

'কিন্তু এ নেহাতই ফালতু কথা!'

'না। এ-ই হল—জ্যাক দ্য রিপার।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে আপনার তত্ত্বের তুলনা নেই।' তাঁকে বললাম, 'কিন্তু স্যার গাই, শুধু একটা জিনিস আমি জানতে চাই। আপনি এখানে কেন এলেন, আর আমাকেই বা এসব বলছেন কেন? আমি তো ডাকিনীবিদ্যায় পণ্ডিত নই। আমি একজন পেশাদার মনস্তত্ত্ববিদ। সুতরাং আমার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী?'

স্যার গাই ঠোঁটে হাসলেন।

'আপনার তা হলে ও-বিষয়ে কৌতূহল আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু আপনার কোনও কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে।'

'আছে। কিন্তু প্রথমে আপনার কৌতূহল সম্পর্কে আমার নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার ছিল। এখন আপনাকে আমার পরিকল্পনার কথা বলতে আর বাধা নেই।'

pathagar.net

'সে-পরিকল্পনাটা কী?'

স্যার গাই আমাকে এক দীর্ঘ চাউনি উপহার দিলেন। তারপর মুখ খুললেন তিনি।

'জন কার্মডি,' তিনি বললেন, 'আপনি আর আমি জ্যাক দ্য রিপারকে বন্দি করতে চলেছি।'

ঘটনার শুরু এইভাবেই। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সমস্ত জটিল এবং বিরক্তিকর পুঙ্খানুপুঙ্খ সংক্ষিপ্তসার আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি, কারণ, আমার মতে তার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। স্যার গাইয়ের চরিত্রে এবং আচরণে আলোকপাত করতে সেটা সাহায্য করবে। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী যে-ঘটনা ঘটল—।

কিন্তু সে-কথায় পরে আসছি।

স্যার গাইয়ের চিন্তা অতি সরল। সেটাকে ঠিক চিন্তাও বলা যায় না। বরং নিছকই একটা অনুমান।

'স্থানীয় লোকজনদের আপনি চেনেন,' তিনি আমাকে বললেন, 'আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি। সেই কারণে আমার কাজের পক্ষে উপযুক্ত লোক হিসেবে আপনার কাছেই আমি এসেছি। আপনার পরিচিতের গণ্ডিতে অনেক লেখক, শিল্পী, কবি আছেন। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল। বোহেমিয়ান। নিকট-উত্তর অঞ্চলের উন্মাদ ব্যক্তিরা।

'বিশেষ-বিশেষ কারণে—সেগুলো না হয় না-ই শুনলেন—আমার সমস্ত সূত্র এই সিদ্ধান্তই আমাকে নিতে বাধ্য করেছে যে, জ্যাক দ্য রিপার আসলে এ-জাতীয় কোনও লোক। সে কোনও উন্মাদের ভূমিকা ছদ্মবেশ হিসেবে বেছে নিয়েছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, যদি আপনি আপনার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন, তা হলে আমি আসল লোককে খুঁজে পেলেও পেতে পারি।'

'আমার তরফে কোনও আপত্তি নেই,' বললাম আমি, 'কিন্তু কীভাবে তার খোঁজ করবেন? আপনার কথা অনুযায়ী সে যে-কেউ হতে পারে, যেখানে খুশি থাকতে পারে। তাকে কীরকম দেখতে আপনি জানেন না। সে যুবকও হতে পারে, বৃদ্ধও হতে পারে। জ্যাক দ্য রিপার—জ্যাক অফ অল ট্রেডস? ধনী, গরিব, ভিখিরি, চোর, ডাক্তার, উকিল—কী করে আপনি চিনবেন?'

'সে দেখা যাবে।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্যার গাই ঃ 'কিন্তু আমি তাকে খুঁজে বের করবই। তক্ষুনি।'

'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্যার গাই ঃ 'কারণ আর দু-দিনের মধ্যেই সে আর-একটা খুন করবে!'

'ঠিক জানেন?'

'আকাশের নক্ষত্রের মতোই আমার অনুমান অভ্রান্ত। তার কর্মপদ্ধতির ছক

pathagar.net

আমি তৈরি করে ফেলেছি। তার সাতাশিটা খুনই জ্যোতিষের একটা বিশেষ ছন্দে গাঁথা। আমার সন্দেহ যদি তাকে নবযৌবন ধারণের জন্যে রক্ত উৎসর্গ করতে হয়, তা হলে আগামী দু-দিনের মধ্যে তাকে একটা খুন করতেই হবে। লন্ডনে তার প্রথম দিককার খুনগুলোর চেহারা লক্ষ করে দেখুন। সাতই আগস্ট। তারপর একত্রিশে আগস্ট। আটই সেপ্টেম্বর। তিরিশে সেপ্টেম্বর। নয়ই নভেম্বর। বিরতির সময়গুলো হল চব্বিশ দিন, ন'দিন, বাইশ দিন—এবারে সে দুটো খুন করে—আর তারপর, চল্লিশ দিন। এ সময়ের মাঝেও অবশ্য খুনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটতেই হবে। কিন্তু সেগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং তাকেও দায়ী করা যায়নি।

'যাই হোক, আমার সমস্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে আমি তার কাজের স্টাইল চিনে ফেলেছি। আমি বলছি, আগামী দু-দিনের মধ্যেই সে আর-একটা খুন করবে। সুতরাং তার আগেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে, সে যে-করেই হোক।'

'আর আপনাকে আমি এখনও জিগ্যেস করছি, আমাকে দিয়ে আপনি কী করাতে চান?'

'আমাকে বেড়াতে নিয়ে চলুন,' বললেন স্যার গাই, 'আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন। বিভিন্ন সান্ধ্য আড্ডায় আমাকে নিয়ে চলুন।'

'কিন্তু শুরু করব কাকে দিয়ে? আমার শিল্পী-বন্ধুদের আমি যদ্দুর জানি, তাদের খামখেয়ালি স্বভাবটুকু বাদ দিলে, তারা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক লোক।'

'রিপারও তাই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শুধু কয়েকটা বিশেষ রাত ছাড়া।' স্যার গাইয়ের চোখে আবার সেই অন্যমনস্ক দৃষ্টি ঃ 'তখন সে হয়ে ওঠে এক বয়েসহীন বিকারগ্রস্ত খুনি। ওত পেতে থাকে খুন করার জন্যে। সেইসব সন্ধ্যায়, যখন তারাদের উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ে মৃত্যুর উজ্জ্বল নকশায়।'

'ঠিক আছে। আমি আপনাকে বিভিন্ন সান্ধ্য আড্ডায় নিয়ে যাব, স্যার গাই। অবশ্য এমনিতেই যেতাম। কারণ, তাদের পরিবেশন করা পানীয় আমার সত্যিই কাজে লাগবে—বিশেষ করে এ-জাতীয় কথাবার্তা শোনার পর।'

আমাদের পরিকল্পনা সাঙ্গ হল। আর সেই সন্ধ্যায় আমি তাঁকে নিয়ে গেলাম লেস্টার ব্যাস্টনের স্টুডিয়োতে।

এলিভেটরে চড়ে আকাশছোঁয়া বাড়ির ওপরতলায় ওঠার সময় স্যার গাইকে সাবধান করে দেওয়ার সুযোগ পেলাম।

'ব্যাস্টনটা এক নম্বরের পাগলা,' তাঁকে সাবধান করলাম, 'ওর বন্ধুরাও তাই। যে-কোনও কিছুর জন্যেই তৈরি থাকবেন।'

'থাকব।' স্যার গাই হাসলেন—মুখমণ্ডলে নিখুঁত গাম্ভীর্য। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিনি একটা রিভলভার বের করে আনলেন।

'আরে, এসব কী—' বলতে শুরু করলাম।

pathagar.net

'তাকে খুঁজে পেলে আমি তৈরিই থাকব।' স্যার গাই বললেন। তিনি হাসলেন না এতটুকু।

'কিন্তু একটা গুলিভরা রিভলভার নিয়ে তো আপনি অন্য লোকের বাড়িতে ঘুরে বেড়াতে পারেন না!'

'নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি বোকার মতো কোনও কাজ করব না।'

চিন্তিত হলাম। আমার ধারণা অনুযায়ী, স্যার গাই হলিস মোটেই সুস্থ নন।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম ব্যাস্টনের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে।

'ভালো কথা,' নিচু স্বরে তাঁকে বললাম, 'সবার কাছে কী বলে আপনার পরিচয় দেব? বলব, আপনি কে, আর কী জন্যে এখানে এসেছেন?'

'সে আমি পরোয়া করি না। হয়তো সত্যি কথা বলাটাই ভালো হবে।'

'কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে, রিপার—যদি কোনও অলৌকিক শক্তিতে সে ওখানে উপস্থিত থাকে—সঙ্গে-সঙ্গে ভয় পেয়ে আত্মগোপন করবে?'

'আমার ধারণা, আমি যে-রিপারকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে-কথা শোনামাত্রই নার্ভাস হয়ে আমাকে সূত্র জুগিয়ে দেবে।' বললেন স্যার গাই।

'আপনি নিজেও একজন দারুণ ভালো মনস্তত্ত্ববিদ হতে পারেন।' আত্মসমর্পণের সুরে বললাম, 'তত্ত্ব হিসেবে এটা চমৎকার। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আপনার ভাগ্যে প্রচুর হেনস্থা আছে। এ সত্যিই একটা পাগলের দল।'

স্যার গাই হাসলেন।

'আমি তৈরি,' তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমার নিজেরও একটা ছোট্ট পরিকল্পনা আছে। আমার কোনও আচরণে যেন ভয় পাবেন না।' তিনি আমাকে সাবধান করে দিলেন।

সম্মতি জানিয়ে দরজায় টোকা মারলাম।

ব্যাস্টন দরজা খুলল এবং হুড়মুড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। গম্ভীর মুখে আমারে জরিপ করতে-করতে সে সামনে পেছনে টলতে লাগল। আমার চৌকো ধাঁচের টুপি ও স্যার গাইয়ের গোঁফের দিকে দেখতে লাগল তির্যক চোখে।

'আ—হা—' সুর করে সে বলল, 'শ্রীমান সিন্ধুঘোটক ও শ্রীমান সূত্রধর।'

স্যার গাইয়ের পরিচয় দিলাম।

'সুস্বাগতম।' বলল ব্যাস্টন। অতিরিক্ত ভদ্রতার ভঙ্গিতে আমাদের ভেতরে আহ্বান জানাল। স্খলিত পায়ে আমাদের অনুসরণ করে চটকদার বসবার ঘরে ঢুকল সে।

সিগারেটের ধোঁয়ার কুয়াশা ভেদ করে চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়ানো অতিথিদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

pathagar.net

এদের কাছে এখন সবে সন্ধে শুরু। প্রত্যেকের হাতেই মদের গেলাস। প্রতিটি মুখমণ্ডলেই জ্বরগ্রস্তের রক্তিম উচ্ছ্বাস। ঘরের এক কোণে সর্বশক্তিতে বেজে চলেছে পিয়ানো।

তৎক্ষণাৎ একচক্ষু চশমা পরিপূর্ণ এক দৃশ্য উপহার পেলেন স্যার গাই। তিনি দেখলেন, মহিলা কবি লা র্ভেন গনিস্টার হাইমি ক্র্যালিককে আঘাত করল চোখে। দেখলেন, হাইমি মেঝেতে বসে কাঁদতে লাগল যতক্ষণ না ডিক পুল খাওয়ার ঘরে মদ আনতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাবশত তার পেটে পা ফেলল।

তিনি শুনলেন প্রচারশিল্পী নাদিয়া ভিলিনফ জনি অডকাটকে বলছে যে, তার মতে জনির শরীরের উল্কিগুলো রুচির দিক থেকে বীভৎস।

তাঁর প্রাণীবিদ্যাগত অভিনিবেশ হয়তো নির্বাধায় গতিশীল থাকত যদি না লেস্টার ব্যাস্টন ঘরের ঠিক মাঝখানে হাজির হয়ে একটা ফুলদানি মেঝেতে চুরমার করে সকলকে চুপ করার নির্দেশ জানাত।

'গণ্যমান্য অতিথিরা আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন।' হাতের খালি গেলাসটাকে আমাদের দিকে নাচিয়ে চিৎকার করে বলল ব্যাস্টন, 'আর কেউ নন, স্বয়ং শ্রীসিন্ধুঘোটক এবং শ্রীসূত্রধর। সিন্ধুঘোটক হলেন স্যার গাই হলিস, ইংরেজ দূতাবাসের যা-হোক-কিছু-একটা হবেন। আর সূত্রধর, আপনারা তো সবাই জানেন, আমাদের জন কার্মডি, বিশিষ্ট কামশক্তিমলম ফিরি করেন।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সে স্যার গাইয়ের হাত চেপে ধরল, টানতে-টানতে নিয়ে গেল গালিচার ঠিক মধ্যবিন্দুতে। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হল হলিস হয়তো এতে আপত্তি করতে পারেন, কিন্তু তাঁর একটা দ্রুত চোখ টেপার ভঙ্গি আমাকে আশ্বস্ত করল: এর জন্যে তিনি তৈরি আছেন।

'আমাদের নতুন বন্ধুকে একটু-আধটু জিজ্ঞাসাবাদ করা আমাদের রীতি, স্যার গাই।' ব্যাস্টন চিৎকার করে বলল, 'এ-জাতীয় নিয়মমাফিক জটলায় নিতান্ত নিয়ম রক্ষার ব্যাপার—বুঝতেই তো পারছেন। আপনি কি প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত?'

স্যার গাই সম্মতি জানিয়ে হাসলেন।

'ভালো কথা,' ব্যাস্টন বিড়বিড় করে বলল, 'বন্ধুগণ, আমি আপনাদের ব্রিটেনের এই বস্তুটি উপহার দিচ্ছি। নিন, আপনাদের সাক্ষী।'

তারপরই শুরু হল ব্যবচ্ছেদ। সবটা শোনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই লিডিয়া ডেয়ার আমাকে দেখতে পেল এবং টানতে-টানতে নিয়ে গেল একটা অ্যান্টিরুমে, 'সোনা-তোমার-ফোনের-জন্যে-আমি-সারাটা-দিন-অপেক্ষা-করেছি,' জাতীয় অধ্যায়ের জন্যে।

ওর হাত থেকে রেহাই পেয়ে যখন ফিরে এলাম, তখন উপস্থিতবুদ্ধিমতো তৈরি প্রশ্নের খেলা পুরোদমে চলছে। জনতার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলাম স্যার গাই

pathagar.net

নিজের ভূমিকা যথাযথভাবেই পালন করছেন।

এমনসময় ব্যাস্টন নিজেই এমন প্রশ্ন মাঝপথে ছুড়ে দিল যে, সমস্ত বানচাল হয়ে গেল।

'দয়া করে জানতে পারি, কী এমন প্রয়োজন আপনাকে আজ রাতে আমাদের মাঝে উপস্থিত করেছে? কী আপনার মহান উদ্দেশ্য, হে সিন্ধুঘোটক?'

'আমি জ্যাক দ্য রিপারের খোঁজ করছি।'

কেউ হাসল না।

সম্ভবত তারাও আমার মতোই গভীর মানসিক ধাক্কা খেয়েছে। পলকে তাকালাম প্রতিবেশীদের দিকে এবং ভাবতে লাগলাম।

লা র্ভেন গনিস্টার। হাইমি ক্র্যালিক। নিরীহ। ডিক পুল। নাদিয়া ভিলিনফ। জনি অডকাট ও তার স্ত্রী। বার্কলে মেলটন। লিডিয়া ডেয়ার। প্রত্যেকেই নিরীহ।

কিন্তু ডিক পুলের হাসিটা কী অদ্ভুত চেষ্টাকৃত। আর বার্কলে মেলটনের মুখে ওই ধূর্ত, আত্মসচেতন, বোকা হাসির মুখোশ।

ওঃ, মানছি, পুরোটাই উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু এই প্রথম এই মানুষগুলোকে আমি নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। তাদের আসল জীবনযাপনের কথা ভেবে অবাক হলাম—সান্ধ্যচক্রের এই দৃশ্যের পেছনে লুকিয়ে আছে তাদের আসল গোপন জীবন।

নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখে এদের মধ্যে কে-কে অভিনয় করে চলেছে? এখানে কে পুজো করে হেক্যাটির, সেই ভয়ঙ্কর গ্রিক দেবীকে উৎসর্গ করে রক্তের প্রসাদ?

এমন কি লেস্টার ব্যাস্টনও হতে পারে সেই ছদ্মবেশী।

এই ভাবনা আমাদের সকলের মনেই জায়গা করে নিল—অন্তত মুহূর্তের জন্যে। দেখলাম, ঘরের চারপাশে উপস্থিত চোখের বৃত্তে ঝিলিক মারল প্রশ্ন।

স্যার গাই দাঁড়িয়ে আছেন; শপথ করে বলতে পারি, যে-পরিস্থিতির তিনি জন্ম দিয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন, এবং তা রীতিমতো উপভোগ করছেন।

অলস চিন্তায় ভাবলাম, লোকটার মধ্যে সত্যিকারের গোলমালটা কোথায়। জ্যাক দ্য রিপার সম্পর্কে তাঁর এরকম অদ্ভুত একরোখা মনোভাবই বা কেন? হয়তো তিনিও কিছু গোপন করেছেন...।

বরাবরের মতো ব্যাস্টনই পরিবেশ হালকা করল। ব্যঙ্গ করল তাঁকে।

'শ্রীমান সিন্ধুঘোটক মোটেই ঠাট্টা করছেন না, বন্ধুগণ।' সে বলল। বক্তৃতার সঙ্গে-সঙ্গে স্যার গাইয়ের পিঠে সশব্দে চাপড় মারল, জড়িয়ে ধরল তাঁকে: 'আমাদের বিলিতি মাসতুতো ভাই সত্যি-সত্যিই রূপকথার জ্যাক দ্য রিপারের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে চলেছেন। জ্যাক দ্য রিপারের কথা আপনাদের সকলেরই মনে আছে

pathagar.net

আশা করি? যদ্দুর মনে পড়ে, সে পুরোনো দিনের এক জব্বর কসাই ছিল। কাটা-ছেঁড়ার কাজে যখন বেরোত, তখন সত্যিই আনন্দ পেত লোকটা।

'সিন্ধুঘোটকের বিশ্বাস রিপার এখনও বেঁচে আছে। হয়তো শিকাগোর আশেপাশে বয় স্কাউটদের ছুরি নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী—' ব্যাস্টন প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য একটু থামল, তারপর কর্কশ নাটকীয় ফিসফিসে স্বরে ছুড়ে দিল বাকি কথাগুলো ঃ 'সত্যি কথা বলতে কী, জ্যাক দ্য রিপার যে আজ রাতে আমাদের মাঝে এখানেই উপস্থিত থাকতে পারে, সেরকম বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ স্যার গাইয়ের রয়েছে।'

খিলখিল ও প্রকট হাসির মাধ্যমে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। ব্যাস্টন তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাল লিডিয়া ডেয়ারের দিকে।

'মেয়েরা, তোমাদের এত হাসির প্রয়োজন নেই,' বোকা হেসে বলল সে 'জ্যাক দ্য রিপার যে মেয়েছেলেও হতে পারে, তা তো জানো। জিল দ্য রিপার জাতীয়।'

'তার মানে, আপনি সত্যি-সত্যি আমাদের কাউকে সন্দেহ করেন?' তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলে উঠল লা র্ভেন গনিস্টার, কাষ্ঠহাসি হাসল স্যার গাইয়ের দিকে তাকিয়ে: 'কিন্তু এই জ্যাক দ্য রিপার লোকটা তো বহু বছর উধাও হয়ে গেছে, তাই না? ১৮৮৮ সালে?'

'হু—' বাধা দিল ব্যাস্টন, 'এ সম্পর্কে আপনি এত কথা জানলেন কেমন করে, দেবী? রীতিমতো সন্দেহজনক। এঁর প্রতি লক্ষ রাখুন, স্যার গাই—এঁকে দেখে যতটা যুবতী মনে হয়, হয়তো আসলে ততটা যুবতী নন। এইসব মহিলা কবিদের অতীত বরাবরই অন্ধকার হয়।'

থমথমে ভাব মিলিয়ে গেছে। চুরমার হয়ে গেছে উৎকণ্ঠাময় পরিবেশ। পুরো ব্যাপারটা ধীরে-ধীরে এক তুচ্ছ সান্ধ্যচক্রের রসিকতায় অধঃপতিত হচ্ছে।

ঠিক তখনই ব্যাস্টন টের পেল।

সে চিৎকার করে উঠল, 'জানেন কি, সিন্ধুঘোটকের কাছে একটা রিভলভার রয়েছে!'

তার জড়িয়ে ধরা হাত পিছলে গিয়ে অনুভব করেছে স্যার গাইয়ের পকেটে রাখা রিভলভারের কঠিন সীমারেখা। হলিস কোনওরকম প্রতিবাদ করার আগেই সে ওটা ছিনিয়ে বের করে নিল তাঁর পকেট থেকে।

আমি কঠিন দৃষ্টিতে স্যার গাইয়ের দিকে তাকালাম এই ভেবে যে, ঘটনাকে যথেষ্ট গড়াতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি আমাকে লক্ষ করে চকিতে চোখ টিপতেই মনে পড়ল, তিনি আমাকে ভয় পেতে বারণ করেছেন।

ব্যাস্টন টলোমলো প্রেরণায় মুখ খুলল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। 'সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে আমরা কোনওরকম ছলনা করব না,' সে চিৎকার করে বলল,

pathagar.net

'সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এতখানি পথ অতিক্রম করে আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় তিনি এসেছেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে। আপনাদের কেউই যদি স্বীকারোক্তি দিতে রাজি না হন, তা হলে আমার মত হল, তাঁকে রিপারকে খুঁজে বের করার একটা সুযোগ আমরা দেব—ঠেকে জানার সুযোগ।'

'মতলবটা কী?' প্রশ্ন করল জনি অডকাট।

'এক মিনিটের জন্যে সমস্ত আলো আমি নিভিয়ে দেব। স্যার গাই বন্দুক হাতে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এ-ঘরে যদি রিপার হাজির থেকে থাকে তা হলে সে পালাতে পারবে, অথবা অন্ধাকারের সুযোগ নিয়ে তার অনুসরণকারীকে সমূলে বিনাশ করতে পারবে। ঠিক আছে?'

শুনে যতটা মনে হয়, তার চেয়েও অর্থহীন এই প্রস্তাব, কিন্তু সকলেরই সেটা পছন্দ হল। উদ্ভূত গুঞ্জনে স্যার গাইয়ের প্রতিবাদ চাপা পড়ে গেল। আমি এগিয়ে গিয়ে মিনমিন করে কিছু বলার আগেই লেস্টার ব্যাস্টনের হাত পৌঁছে গেল আলোর সুইচে।

'কেউ নড়বেন না,' কপট আনুষ্ঠানিক সুরে ঘোষণা করল সে, 'এক মিনিটের জন্যে আমরা অন্ধকারে থাকব—সম্ভবত কোনও খুনির করুণার পাত্র হয়ে। এক মিনিট পেরিয়ে গেলে আমি আবার আলো জ্বেলে দেব এবং সন্ধান করব মৃতদেহের। নিজেদের সঙ্গী বেছে নিন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ।'

আলো নিভে গেল। কেউ হেসে উঠল খিলখিল করে।

অন্ধকারে শুনতে পেলাম পায়ের শব্দ। বিড়বিড় করে কথা।

একটা হাত আলতোভাবে ছুঁয়ে গেল আমার মুখ।

আমার কবজিতে বাঁধা ঘড়িটা ভয়ঙ্কর তীব্রভাবে টিকটিক করতে লাগল। কিন্তু তার চেয়েও জোরে, সেই টিকটিক শব্দকে ছাপিয়ে, শুনতে পেলাম একটা ছন্দময় শব্দ। আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ!

অযৌক্তিক। একদল সুরাসক্ত নির্বোধের সঙ্গে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা। অথচ তবুও সেখানে লুকিয়ে রয়েছে প্রকৃত ত্রাস, খসখস শব্দ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মখমল অন্ধকারে।

এইভাবেই শ্বাপদ-চরণে জ্যাক দ্য রিপার ঘুরে বেড়ায় অন্ধকারে। সেইসঙ্গে জ্যাক দ্য রিপারের হাতের ছুরি। জ্যাক দ্য রিপারের আছে একটা উন্মত্ত মস্তিষ্ক এবং উন্মাদ-উদ্দেশ্য।

কিন্তু জ্যাক দ্য রিপার মরে গেছে। এত দীর্ঘ সময়ে সে মরে গিয়ে ধুলোয় মিশে গেছে—সমস্ত বাস্তব সূত্র অন্তত সেই কথাই বলে।

অন্ধকারে যখন নিজেকে অনুভব করা যায়, তখন সেখানে কোনও মানবিক সূত্র খাটে না। সেখানে অন্ধকার লুকিয়ে রাখে ও রক্ষা করে। আর বাইরের মুখোশটা

pathagar.net

তোমার মুখ থেকে সরে যায়। তুমি অনুভব করো উদ্‌গত নিঃস্রাবী কোনও অনুভূতি আর চিন্তাপ্রসূত নিরাকার এক উদ্দেশ্য—যা অন্ধকারের পরমাত্মীয়।

স্যার গাই হলিস চিৎকার করে উঠলেন।

শোনা গেল ভারি জিনিস পড়ে যাওয়ার এক ভয়াবহ শব্দ।

ব্যাস্টন আলো জ্বেলে দিল।

সবাই চিৎকার করে উঠল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন স্যার গাই হলিস। রিভলভারটা তখনও তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা।

আমি সারি-সারি মুখের দিকে তাকালাম। আতঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যে কত বিচিত্র রকমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে তা দেখে আশ্চর্য হলাম।

বৃত্তের পরিধিতে প্রতিটি মুখই উপস্থিত। কেউই পালায়নি। অথচ তা সত্ত্বেও স্যার গাই মেঝেতে পড়ে রয়েছেন...।

লা ভের্ন গনিস্টার মুখ ঢেকে চিৎকার করে কাঁদছে।

'কোনও ভয় নেই।' স্যার গাই মেঝেতে একটা পাক খেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি হাসছেন।

'শুধু একটা ছোট্ট পরীক্ষা, কী বলেন, হুঁ? যদি জ্যাক দ্য রিপার এখানে হাজির থাকত, আর ভাবত আমি খুন হয়ে গেছি, তা হলে আলো জ্বলে ওঠার পর আমাকে পড়ে থাকতে দেখে সে কোনও-না-কোনও এক বিশ্বাসঘাতক অভিব্যক্তি প্রকাশ করত।

'আপনারা প্রত্যেকে যে নির্দোষ তা নিয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। এটা নিছকই একটা ছোট্ট ধাপ্পা, বন্ধুগণ।'

বিস্ফারিত চোখ ব্যাস্টন ও তার পেছনে ভিড় করে দাঁড়ানো বাকি সকলের দিকে অপলকে চেয়ে রইলেন হলিস।

'আমরা এবার গেলে হয় না, জন?' তিনি আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'ক্রমশ দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি রওনা হলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। কেউ একটাও কথা বলল না।

এরপর সান্ধ্যচক্রের মেজাজটাই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় ঊনত্রিশতম পথ ও সাউথ হ্যালস্টেডের মোড়ে স্যার গাইয়ের সঙ্গে কথামতো দেখা করলাম।

গত রাতের ঘটনার পর বলতে গেলে যে-কোনও কিছুর জন্যেই আমি তৈরি। কিন্তু একটা ঝুলকালি মাখানো দরজার কাছে জড়োসড়ো হয়ে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে

pathagar.net

থাকা স্যার গাইকে দেখে যথেষ্ট সহজ ও স্বাভাবিক বলেই মনে হল।

'ও—!' পিছন থেকে হঠাৎ লাফিয়ে এসে চিৎকার করে উঠলাম।

তিনি হাসলেন। শুধু তাঁর বাঁ-হাতের বিশ্বাসঘাতক ভঙ্গি জানিয়ে দিয়েছে যে, আমি তাঁকে চমকে দেওয়ার মুহূর্তে সহজাত প্রবৃত্তিবশে তিনি রিভলভারের দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

'আমাদের বুনো হাঁস তাড়া করার জন্যে সব তা হলে তৈরি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ।' তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন ঃ 'আপনি যে বিনা প্রশ্নে আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন, সেজন্যে আমি খুশি হয়েছি।' তিনি আমাকে বললেন, 'এতে বোঝা যায় যে, আমার বিচার-বিবেচনায় আপনার বিশ্বাস আছে।'

আমার হাত ধরলেন তিনি। রাস্তা ধরে ধীরে-ধীরে আমাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

'আজ রাতে কুয়াশা রয়েছে, জন,' বললেন স্যার গাই হলিস, 'ঠিক লন্ডনের মতোই।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

'নভেম্বরের পক্ষে ঠান্ডাও বেশি।'

আবার মাথা নাড়লাম এবং আমার সম্মতিকে অর্ধেক পথেই শেষ করলাম।

'আশ্চর্য,' আনমনাভাবে বললেন স্যার গাই, 'লন্ডনের কুয়াশা আর নভেম্বর। রিপারের খুনের সেই অকুস্থল আর সময়।'

অন্ধকারে প্রকট হাসলাম ঃ 'আপনাকে মনে করিয়ে দিই স্যার গাই, এটা লন্ডন নয়, শিকাগো। আর এটা ১৮৮৮-র নভেম্বর নয়। তারপর প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে।'

আমার প্রকট হাসি ফিরিয়ে দিলেন স্যার গাই, কিন্তু তাতে আনন্দের লেশমাত্র ছিল না।

'সে-বিষয়ে তেমন বিশ্বাস আমার নেই,' তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'তাকিয়ে দেখুন চারদিকে। এইসব জট পাকানো গলি, আঁকাবাঁকা পথ। যেন ইস্ট-এন্ড-এর মতো, অথবা মিটার স্কোয়ার। আর এগুলো অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরোনো তো বটেই।'

'আপনি এখন সাউথ ক্লার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি মধ্যবিত্ত অঞ্চলে রয়েছেন,' সংক্ষেপে বললাম, 'আর এখানে যে কেন আমাকে টেনে এনেছেন, তা এখনও জানি না।'

'নেহাতই হঠাৎ মনে হল,' স্বীকার করলেন স্যার গাই, 'যেন আমার মন বলছে, জন! আমি এ-জায়গাটায় ঘুরে বেড়াতে চাই। যেখানে রিপার ঘুরে বেড়াত, খুন করত, সে-জায়গাগুলোর সঙ্গে এ-জায়গাটার চেহারায় অদ্ভুত মিল রয়েছে। এখানেই তাকে

pathagar.net

আমরা খুঁজে পাব। বোহেমিয়ান অঞ্চলের উজ্জ্বল আলোয় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না—যাবে এখানে, এই অন্ধকারে। অন্ধকারে, এখানে সে অপেক্ষা করছে, গুড়ি মেরে বসে আছে।'

'সেইজন্যেই কি আপনি রিভলভার নিয়ে এসেছেন?' প্রশ্ন করলাম। কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গভরা অস্বস্তির সুরটুকু এড়াতে পারলাম না। এত সব কথা, জ্যাক দ্য রিপার সম্পর্কে এই অবিরাম আচ্ছন্নতা, যতটা স্বীকার করতে চাই তার চেয়েও বেশি চেপে বসেছে আমার নার্ভে।

'রিভলভারের দরকার হতে পারে,' গম্ভীরভাবে বললেন স্যার গাই, 'কারণ, আজকের রাতই সেই বিশেষ রাত।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। নির্জন কুয়াশা বিজড়িত পথে আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এখানে-ওখানে দরজার মাথায় ম্লান আলো জ্বলছে। এ ছাড়া সবই অন্ধকার এবং ছায়াচ্ছন্ন। একটা তির্যক রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার পথে গভীর বিস্ফারিত মুখ শীর্ণ গলিগুলোকে মনে হল কোনও মরীচিকা।

সেই নির্জন কুয়াশায় আমরা গুড়ি মেরে এগিয়ে চললাম। নিঃশব্দে। যেন দুটো ছোট্ট শূককীট কোনও পরদার ভাঁজে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই চিন্তা মাথায় আসতেই কুঁকড়ে গেলাম। পরিবেশ ক্রমশ আমাকেও সম্মোহিত করে তুলেছে। যদি এরপর থেকে সতর্ক না হই, তা হলে আমিও স্যার গাইয়ের মতো উন্মাদ-বিশ্বাসের শিকার হয়ে পড়ব।

'দেখছেন না, এসব রাস্তায় একটাও লোক নেই?' তাঁর কোটে টান মেরে বলে উঠলাম।

'সে এখানে আসতে বাধ্য,' বললেন স্যার গাই, 'কোনও আকর্ষণ তাকে ঠিক এখানে টেনে নিয়ে আসবে। হুবহু এইরকম একটা জায়গারই আমি খোঁজ করছি। এইরকম একটা সংসর্গ। একটা অশুভ জায়গা—যা অশুভকে টেনে আনে। যখন সে খুন করে, সবসময় তার ঘটনাস্থল হয় বস্তি অঞ্চল।

'বুঝতেই পারছেন, সেটা নিশ্চয়ই তার তরফে কোনও দুর্বলতা। নোংরা অঞ্চলকেই তার বরাবর বেশি পছন্দ। তা ছাড়া, উৎসর্গের জন্যে যেসব মেয়ে তার দরকার, বড় শহরের আনাচেকানাচে তাদের বেশি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।'

আমি হাসলাম। 'ঠিক আছে, তা হলে সেরকম কোনও জায়গাতেই যাওয়া যাক।' প্রস্তাব রাখলাম ঃ 'আমার শীত করছে। একটু গলা ভেজানো দরকার। এই কুয়াশা যেন হাড়ে বিঁধছে। আপনাদের ইংরেজদের এসব গা সওয়া, কিন্তু উষ্ণতা আর শুকনো গরম আমার পছন্দ।'

ছোট রাস্তা ছেড়ে এক সরু গলিপথের মুখে এসে দাঁড়ালাম।

সামনের সাদা মেঘ আর কুয়াশা ভেদ করে দেখতে পেলাম একটা ম্লান নীল

pathagar.net

আলো। গলিপথের এক পানশালার বাইরে 'বিয়ার' লেখা সাইনবোর্ড থেকে ঝুলছে উলঙ্গ আলোটা।

'আসুন দেখা যাক।' বললাম আমি, 'শীতে আমার কাঁপুনি লাগছে।'

'আপনি আগে চলুন।' বললেন স্যার গাই।

সরু গলি ধরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম। পানশালার দরজার কাছে গিয়ে দুজনে থামলাম।

'কী জন্যে অপেক্ষা করছেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'এমনি দেখছি,' তাঁকে বললাম, 'এটা বড় ঝামেলার এলাকা, স্যার গাই। কখন হুট করে কী হবে, কেউ বলতে পারে না। আমি চাই না, সেরকম একটা গুণ্ডা-দলের মাঝে গিয়ে আমরা হাজির হই।'

'ভালো খেয়াল করেছেন, জন।'

দরজা থেকে পানশালার অন্দরমহল পর্যবেক্ষণের কাজ শেষ করলাম।

'একেবারে খালিই মনে হচ্ছে।' বিড়বিড় করে বললাম, 'চলুন দেখা যাক।'

নোংরা পানশালায় প্রবেশ করলাম। কাউন্টার ও রেলিংয়ের ওপর কমজোরি আলোর রোশনাই, কিন্তু সে-আলোর রেশ পেছনের সারির আসনের জোরালো প্রচ্ছায়া ভেদে ব্যর্থ হয়েছে।

এক বিশালকায় নিগ্রো কাউন্টারের ওপর অলসভাবে শুয়ে আছে। আমাদের ঢোকার ফলে তার শরীরে কোনওরকম চাঞ্চল্য নজরে পড়ল না, কিন্তু তার চোখ-জোড়া আচমকা খুলে গেল। বুঝলাম, আমাদের উপস্থিতি সে লক্ষ করেছে এবং আমাদের খতিয়ে দেখছে।

'শুভ সন্ধ্যা।' আমি বললাম।

উত্তর দিতে সে ভালোই সময় নিল। তখনও আমাদের জরিপ করছে। তারপর সে দাঁত বের করে হাসল।

'শুভ সন্ধ্যা, স্যার, বলুন কী দেব?'

'জিন,' আমি বললাম, 'দুটো জিন। আজ রাতে ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার।'

সে পানীয় ঢালল, আমি পয়সা মিটিয়ে দিলাম। গেলাস দুটো নিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। ওগুলো খালি করতে আমরা বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট করলাম না। অগ্নিময় তরলে উষ্ণতা ফিরে পেলাম।

কাউন্টারে ফিরে গিয়ে এবার বোতলটা নিয়ে এলাম। স্যার গাই ও আমি আরও একবার করে গেলাস ভরতি করলাম। বিশাল নিগ্রোটা আবার ঝিমোতে লাগল। তার একটা সতর্ক চোখ কোনও চকিত ঘটনার জন্যে আধখোলা হয়ে তৈরি।

পানশালার দেওয়াল-ঘড়ি টিকটিক করে বেজে যায়। বাইরে কুয়াশার পরদা

pathagar.net

ছিন্নভিন্ন করে বাতাসের তেজ বাড়ছে। স্যার গাই ও আমি ভেতরের উষ্ণতায় বসে জিনে চুমুক দিচ্ছি।

তিনি কথা বলতে শুরু করলেন, এবং গভীর ছায়ারা হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের ঘিরে ধরল সে-কথা শুনতে।

তিনি সমানে এলোমেলো আলোচনা করে চললেন। তাঁর সঙ্গে অফিসে প্রথম দেখা হওয়ার সময়ে আমাকে যা-যা বলেছেন সেগুলোই আবার বলতে লাগলেন। যেন সে-কথা আমি আগে শুনিনি। বেচারা ভূতগ্রস্থ লোকগুলো এইরকমটাই হয়।

অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে শুনতে লাগলাম। স্যার গাইয়ের গেলাসে ঢেলে দিলাম তরল নেশা। তারপর আর-একবার।

কিন্তু পানীয় শুধু তাঁকে আরও বেশি বাচাল করে তুলল। কত কথাই না তিনি বলে চললেন। নরবলি সম্পর্কে, কৃত্রিম উপায়ে জীবনকে দীর্ঘায়ু করার পদ্ধতি সম্পর্কে—গোটা উদ্ভট অবান্তর গল্পটা আবার শুনতে হল। আর সেইসঙ্গে তিনি তাঁর বদ্ধমূল ধারণায় অবিচল যে, রিপার আজ রাতে নিঃশব্দ ভ্রমণে বেরিয়েছে।

হয়তো তাঁকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্যে আমিই অপরাধী।

'ঠিক আছে।' বললাম আমি, গলার সুরে অধৈর্য ভাবকে অস্পষ্ট রাখতে পারলাম না: 'ধরে নেওয়া যাক, আপনার কথাই ঠিক—যদিও এ-কথা বিশ্বাস করতে গেলে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিসর্জন দিয়ে একরাশ কুসংস্কার হজম করতে হয়।

'কিন্তু তবুও ধরা যাক, অন্তত তর্কের খাতিরে, আপনার কথাই ঠিক। জ্যাক দ্য রিপার এমন একজন মানুষ, যে নরবলির মাধ্যমে নিজের জীবন দীর্ঘায়ু করার পদ্ধতি জানতে পেরেছে। আপনার বিশ্বাসমতো সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন সে আছে শিকাগোতে এবং খুনের পরিকল্পনা করছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি যা-যা বলেছেন সবই ধ্রুব সত্য। কিন্তু তাতে হলটা কী?'

'তাতে হলটা কী মানে?' পালটা বললেন স্যার গাই।

'মানে, যা বলছি তাই।' উত্তর দিলাম, 'এসব যদি সত্যিও হয়, তা হলে এটা তো প্রমাণিত হয় না যে, সাউথ সাইড-এর এই নোংরা জিন চোলাইয়ের আড়তে বসে থাকলেই জ্যাক দ্য রিপার এখানে সটান এসে ঢুকে পড়বে এবং তাকে খতম করার অথবা পুলিশে দেওয়ার সুযোগ আপনাকে দেবে। আর ভালো কথা, তাকে খুঁজে পেলে আপনি তাকে নিয়ে কী করতে চান, সেটাও আমি এখনও জানি না।'

স্যার গাই এক ঢোক জিন গলায় ঢাললেন। 'হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে আমি বন্দি করব।' তিনি বললেন, 'বন্দি করে তুলে দেব সরকারের হাতে। আর বহু বছর ধরে তার সম্পর্কে যেসব কাগজপত্র ও নথিগত সাক্ষ্য আমি জোগাড় করেছি, সেসবও তাঁদের হাতে তুলে দেব। এ-রহস্যের তদন্তে বহু টাকা আমি খরচ করেছি, জানেন, বহু টাকা। তাকে গ্রেপ্তার করার অর্থ বহু অমীমাংসিত অপরাধের কিনারা হওয়া—

pathagar.net

সে-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

'জেনে রাখুন, একটা উন্মাদ পশু ছাড়া পেয়ে এ-পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়েসহীন, চিরকালের এক পশু—যে হেক্যাটি ও অন্ধকারের দেবতাদের উদ্দেশে নরবলি দেয়!'

বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু। নাকি এসব আবোল-তাবোল কথা অতিরিক্ত জিনের পরিণতি? তাতে কিছু যায় আসে না। স্যার গাই হলিস আরও এক গেলাস খেলেন। বসে ভাবতে লাগলাম, তাঁকে নিয়ে এখন কী করি। ভদ্রলোক ক্রমেই উন্মত্ত মাতলামির তুঙ্গে এগিয়ে চলেছেন।

'আরও একটা কথা,' খবর সংগ্রহের আশা না করে নেহাত কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার জন্যেই আমি বললাম, 'আপনি এখনও বলেননি কীভাবে রিপারের সঙ্গে আপনার হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে বলে আপনি মনে করেন।'

'সে আশেপাশেই থাকবে,' বললেন স্যার গাই, 'আমার মন বলছে। আমি বুঝতে পারি।'

স্যার গাইয়ের মন কিছুই বলছে না। তিনি এখন সম্পূর্ণ মাতাল।

পুরো ব্যাপারটায় ক্রমশ আমার রাগ হতে লাগল। আমরা এখানে বসে আছি প্রায় একঘণ্টা, আর এই সময়ের সর্বক্ষণ আমি এক বাচাল গর্দভের নার্স এবং শ্রোতার ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছি। যতই হোক, তিনি তো আর আমার বরাবরের রুগি নন!

'যথেষ্ট হয়েছে,' স্যার গাই অর্ধেক খালি বোতলটার দিকে আবার হাত বাড়াতেই আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'অনেক খেয়েছেন। এবার আমার কথা শুনুন। চলুন, একটা ট্যাক্সি ডেকে এখান থেকে যাওয়া যাক। ক্রমশ দেরি হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় না, আপনার ছলনাময় বন্ধু আজ আর দর্শন দেবেন। আমি হলে আগামীকালই সমস্ত কাগজপত্র এফ-বি-আই-এর হাতে তুলে দিতাম। নিজের উদ্ভট তত্ত্বে যদি আপনার সেরকম আস্থা থাকে, তা হলে তারা বিস্তারিত তদন্ত করার ক্ষমতা রাখে এবং আপনার আসামিকে তারা খুঁজে বের করবেই।'

'না,' স্যার গাই নেশার ঝোঁকে জেদি হলেন, 'ট্যাক্সি নয়।'

'কিন্তু এখান থেকে তো চলুন,' হাতঘড়িতে এক পলক চোখ রেখে আমি বললাম, 'এখন বারোটা বেজে গেছে।'

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কাঁধ ঝাঁকালেন, টলোমলোভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েই এক টানে পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে আনলেন।

'দিন—ওটা এদিকে দিন।' আমি চাপা ফিসফিসে গলায় বললাম, 'খোলা রাস্তায় ওটা নাচিয়ে ঘোরা যায় না।'

রিভলভারটা নিয়ে আমি কোটের ভেতরে রাখলাম। তারপর তাঁর ডানহাত

pathagar.net

ধরে এগিয়ে নিয়ে চললাম দরজার দিকে। আমরা বেরোনোর সময় নিগ্রোটা চোখ তুলে তাকাল না।

সরু গলিতে দাঁড়িয়ে আমরা কাঁপতে লাগলাম। কুয়াশা অনেক গাঢ় হয়েছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে গলির কোনও মাথাই স্পষ্ট দেখা যায় না। ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে। অন্ধকার। কুয়াশা থাক বা না থাক, একটুকরো ছোট্ট হাওয়া আমাদের পেছনের ছায়াগুলোকে ফিসফিস করে গোপন কথা শুনিয়ে চলেছে।

বাইরের তাজা হাওয়া, যেরকমটা অনুমান করেছিলাম, সেইরকমভাবেই স্যার গাইয়ের মস্তিষ্কে বিঁধল। কুয়াশা ও জিনের বাষ্প একে অপরে ভালো মিশ খায় না। কুয়াশা ভেদ করে তাঁকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলতেই তিনি টলে পড়লেন।

স্যার গাই, তাঁর অক্ষমতা সত্ত্বেও, এখনও প্রত্যাশা নিয়ে গলিটার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এখুনি কোনও এগিয়ে আসা ছায়ামূর্তি তাঁর নজরে পড়বে।

বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছলাম।

'ছেলেমানুষের মতো বোকামি,' ঘন নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'জ্যাক দ্য রিপারই বটে! একে শখের চূড়ান্ত ছাড়া আর কী বলব!'

'শখ?' তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন; কুয়াশায় পরদার পেছনে তাঁর বিকৃত মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম ঃ 'আপনি এটাকে শখ বলছেন?'

'তা ছাড়া আর কী?' গজগজ করে বললাম, 'নইলে এই অবাস্তব খুনিকে খুঁজে বের করতে আপনার কী এত দায় পড়েছে?'

আমার হাত তাঁকে ধরে রেখেছে। কিন্তু তাঁর অপলক দৃষ্টিও ধরে রাখল আমাকে।

'লন্ডনে,' তিনি ফিসফিস করে বললেন, '১৮৮৮-তে...রিপার যেসব মেয়েছেলেকে খুন করেছিল তাদের একজন ছিল...আমার মা।'

'কী?'

'বাবা এবং আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, প্রাণ দিয়েও রিপারের সন্ধান করব। বাবা-ই প্রথম সে-কাজ শুরু করেন। তিনি ১৯২৬-এ হলিউডে মারা যান—রিপারের খোঁজ করতে গিয়ে। লোকে বলে এক ঝগড়ার সময় কোনও এক অজ্ঞাত আততায়ী তাঁকে ছুরি মেরে খুন করে। কিন্তু আমি জানি, কে সেই আততায়ী।

'তাই তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ আমি কাঁধে তুলে নিয়েছি। এবার বুঝতে পারছেন, জন? আমি সে-কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছি। এবং তাকে খুঁজে বের করে নিজে হাতে খুন না করা পর্যন্ত আমার কাজ শেষ হবে না।

'সে আমার মাকে খুন করেছে, খুন করেছে আরও শত-শত লোককে—নিজের নারকীয় শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। একটা রক্তচোষা বাদুড়ের মতো সে রক্তে পুষ্ট হয়। পিশাচের মতো মৃত্যু দিয়ে সে লালিত-পালিত। ভয়ঙ্কর দানবের মতো সারা

pathagar.net

পৃথিবী সে নিঃশব্দে চষে বেড়ায় নতুন শিকারের লোভে। সে ধূর্ত, শয়তানের মতো ধূর্ত। কিন্তু তাকে খুঁজে না বের করা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না, কোনওদিনও না!'

এবার তাঁকে বিশ্বাস করলাম। তিনি সহজে ছাড়বেন না। তিনি শুধু আর নেশাগ্রস্ত বাচাল নন। তিনি রিপারের মতোই লক্ষ্যে স্থির, উন্মাদ সংকল্পে অবিচল, অনমনীয়।

আগামীকাল তিনি প্রকৃতিস্থ হবেন। আবার শুরু করবেন অনুসন্ধান। হয়তো ওইসব নথিপত্র তুলে দেবেন এফ-বি-আই-এর হাতে। আজ হোক, কাল হোক, এই জেদ নিয়ে এবং তাঁর প্রতিহিংসা-প্রসূত উদ্দেশ্য নিয়ে—তিনি সফল হবেনই। বরাবরই আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাঁর বিরাট কোনও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে।

'চলুন, যাওয়া যাক।' বলে গলিপথ ধরে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চললাম।

'এক মিনিট দাঁড়ান,' বললেন স্যার গাই, 'আমার বন্দুকটা ফেরত দিন।' তিনি সামান্য টলে উঠলেন, 'ওটা কাছে থাকলে আমি স্বস্তি পাব।'

একটা ছোট্ট ছায়াচ্ছন্ন খাঁজে আমাকে চেপে ধরলেন তিনি। তাঁকে ছাড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা।

'রিভলভারটা এখনই আমাকে ফেরত দিন, জন।' তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন।

'ঠিক আছে।' আমি বললাম।

কোটের ভেতরে হাত ঢোকালাম, আবার বের করে আনলাম বাইরে।

'কিন্তু এটা তো রিভলভার নয়,' তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'এটা তো একটা ছুরি।'

'জানি।'

চকিতে ঝুঁকে পড়লাম তাঁর শরীরের ওপর।

'জন!' তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

'জন নামটা ছেড়ে দিন,' ফিসফিস করে বললাম, আমার ছুরিসমেত হাতটা শূন্যে স্থির: 'শুধু বলুন...জ্যাক।'

➤ *ইওর্স ট্রুলি, জ্যাক দ্য রিপার*

pathagar.net

স্বপ্ন অথবা

গী দ্য মপাসাঁ

pathagar.net

ওকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। মানুষ কেন ভালোবাসে? কেন মানুষ ভালোবাসে? কী অদ্ভুত লাগে যদি কেউ পৃথিবীতে শুধু একজনকেই দ্যাখে, মনে একজনকেই ভাবে, অন্তরে একজনকেই চায়, আর তার ঠোঁটে থাকে শুধু একটাই নাম—যে-নাম ক্রমাগত উঠে আসে ঝরনার জলের মতো, আত্মার গভীর স্তর থেকে পৌঁছে যায় ঠোঁটের সীমারেখা পর্যন্ত, যে-নাম সে উচ্চারণ করে বারবার, অলসভাবে সর্বত্র ফিসফিস করে ঈশ্বরের প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো।

আমাদের গল্পটা এবার আপনাদের বলব, কারণ প্রেমের গল্প বলতে আছে শুধু একটাই, আর সে-গল্প বরাবর সেই একই। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়, আর তারপর থেকে আমি বেঁচেছিলাম ওর কোমলতায়, ওর আদরে, ওর আশ্লেষে, ওর পোশাকে, ওর কথায়। একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে ওর প্রতিটি জিনিসে বাঁধা পড়েছি যে, আমাদের এই পৃথিবীতে রাত কি দিন তার পরোয়া আমি করিনি, এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি।

আর তারপরই ও মারা গেল। কেমন করে? আমি জানি না; তারপর থেকে আর কিছুই জানি না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ও ভিজে ফিরল বাড়িতে এবং পরদিন থেকেই কাশতে শুরু করল; এক সপ্তাহ চলল এই কাশি, তারপরই ও বিছানা নিল। ঠিক কী যে হয়েছিল আমার এখন স্পষ্ট মনে নেই। তবে ডাক্তারবাবুরা এসেছে, লেখালেখি করেছে, আবার চলেও গেছে। ওষুধ কিনে আনা হল। অন্য

মহিলারা সে-ওষুধ ওকে খাইয়ে দিল। ওর দুটো হাত গরম। কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে। আর দু-চোখ উজ্জ্বল ও বিষণ্ণ। আমি কথা বলতেই ও উত্তর দিল, কিন্তু কী কথা আমরা বলেছি আমার মনে নেই। সবকিছু ভুলে গেছি। সবকিছু। সবকিছু! ও মরে গেল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, ওর সেই হালকা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস। নার্স বলে উঠল, আহা রে! তখন আমি বুঝলাম। সব বুঝতে পারলাম।

আর কিছুই আমি জানি না—কিছু না। একজন ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, কে, আপনার প্রণয়িনী? আর আমার মনে হল উনি যেন ওকে অপমান করছেন। ও মরে গেছে, সুতরাং এ-কথা বলার অধিকার এখন আর কারও নেই। সুতরাং, আমি সেই ধর্মযাজককে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। আরও একজন এলেন—নরম ও দয়ালু প্রকৃতির। তিনি যখন ওর কথা আমাকে শোনাতে লাগলেন তখন আমি শুধু চোখের জল ফেলে চললাম।

ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে সবাই আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে, কিন্তু ওরা কে কী বলেছে কিছুই আমার মনে নেই। বরং কফিনের কথা আমার মনে আছে। মনে আছে, ওকে শুইয়ে দিয়ে কফিনে পেরেক ঠোকার হাতুড়ির শব্দ। ওঃ! ভগবান, ভগবান!

ওকে কবর দেওয়া হল! কবর! ওকে! ওই গর্তে! কিছু-কিছু লোক এল—মেয়ে-বন্ধুর দল। আমি লুকিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। ছোটা শেষ করে নানান পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। একসময় পৌঁছলাম বাড়িতে, কিন্তু পরদিনই আবার পাড়ি দিলাম দেশান্তরে।

গতকালই আমি প্যারিসে ফিরে এসেছি; এসে নিজের ঘরে ঢুকতেই নতুন এক দুঃখের ঢেউ নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর, আমাকে গ্রাস করল। মনে হল, জানলা খুলে এখুনি লাফিয়ে পড়ি নীচের রাস্তায়। কারণ, আমার চোখের সামনে আমাদের ঘর, আমাদের বিছানা, আমাদের আসবাবপত্র—কোনও মানুষের মৃত্যুর পর তার জীবনের যতটুকু পড়ে থাকা সম্ভব তার সবটুকুই উপস্থিত। এসব জিনিসের মাঝে আমি আর একমুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। এই দেওয়াল একদিন ওকেই ঘিরে ছিল, আশ্রয় দিয়েছিল। এই দেওয়ালের প্রতিটি অদৃশ্য ফাটলে রয়েছে ওর সহস্র পরমাণুর স্বাক্ষর, ওর ত্বক ও নিশ্বাসের অস্তিত্ব। সুতরাং টুপিটা তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু যেই দরজার কাছে এসেছি চোখ পড়ল হলঘরের বিশাল আয়নাটায়। আয়নাটা ও-ই এখানে বসিয়েছিল যাতে বাইরে বেরোনোর সময় ও নিজের আপাদমস্তক দেখতে পায়; পরখ করতে পারে সাজগোজ ঠিক আছে কি না; পায়ের জুতো থেকে মাথার টুপি পর্যন্ত সবকিছু নিখুঁত হল কি না।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আয়নাটার সামনে। এই আয়না কতবার ওর ছায়া বুকে ধরেছে...এত বহুবার যে, সে-ছায়া নিশ্চয়ই স্থায়ী হয়ে আছে আয়নার কাচের গভীরে! আমি সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করলাম। আমার চোখ কাচের ওপর

pathagar.net

স্থির—সমতল, গম্ভীর, শূন্য কাচ...যে-কাচ ওকে গ্রহণ করেছে সম্পূর্ণভাবে। অধিকার করেছে আমারই মতো, আমার প্রণয়াচ্ছন্ন দৃষ্টির মতো। মনে হল যেন আয়নাটাকে আমি ভালোবাসি। ওটা স্পর্শ করলাম ঃ ঠান্ডা! ওঃ, সেই স্মৃতি! বিষণ্ণ আয়না, ভয়ঙ্কর আয়না, তুমি মানুষকে কত যন্ত্রণা দাও! সেই মানুষই সুখী যার হৃদয় ভুলে যায় কতটুকু সে পেয়েছিল, তার চোখে গভীর চোখ মেলে কে তাকিয়েছিল, ভুলে যায় তার অনুরাগে ভালোবাসায় প্রতিফলিত হওয়া সবকিছু! সত্যি, কী কষ্টই না আমি পাচ্ছি!

সেসব কিছু না ভেবে না জেনে আমি বেরিয়ে এলাম, রওনা হলাম কবরখানার দিকে। ওর সাদাসিধে সমাধি আমি খুঁজে পেলাম—একটা সাদা ক্রুশ চিহ্ন ও এই ক'টি কথা লেখা ঃ

ও ভালোবেসেছিল, ভালোবাসা পেয়েছিল, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছে।

ওর ক্ষয়ে যাওয়া শরীর এর নীচেই শুয়ে রয়েছে। ভয়ঙ্কর! মাটিতে মাথা রেখে আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। অনেক অনেকক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। তারপর এক সময় লক্ষ করলাম, অন্ধকার নেমে আসছে। আর এক অদ্ভুত পাগল করা ইচ্ছে—হতাশ কোনও প্রেমিকের ইচ্ছে—আমাকে গ্রাস করল। ইচ্ছে করল, ওর সমাধিতে চোখের জল ফেলে সারাটা রাত কাটিয়ে দিই, কাটিয়ে দিই শেষ একটা রাত। কিন্তু আমাকে এখানে দেখতে পেলেই বের করে দেওয়া হবে। কী করে সেটাকে আমি আটকাই? আমার বুদ্ধি আছে। সুতরাং, উঠে দাঁড়িয়ে মৃতের শহরে ঘুরতে শুরু করলাম। হেঁটে চললাম, শুধু হেঁটে চললাম। যে-শহরে আমরা বাস করি তার তুলনায় এই শহর কত ছোট। অথচ জীবিতদের চেয়ে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি। যে-চার পুরুষ একসঙ্গে দিনের আলো দ্যাখে তাদের জন্যে দরকার হয় বিশাল-বিশাল বাড়ি, চওড়া রাস্তা, চাই অনেক জায়গা।

আর মৃতদের সমস্ত পুরুষের জন্যে, যে বংশের-ধারা নেমে এসে আমাদের ছুঁয়েছে, তাদের জন্যে প্রায় কিছুই দরকার হয় না, কিচ্ছু না। পৃথিবীর মাটি তাদের ফিরিয়ে নেয়, আর বিস্মৃতি তাদের মুছে ফ্যালে। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন!

কবরখানার শেষপ্রান্তে পৌঁছে হঠাৎই বুঝতে পারলাম আমি একেবারে প্রাচীন অংশে এসে হাজির হয়েছি। এখানে মৃতেরা শুয়ে আছে অনেক দিন ধরে, ওদের দেহ এখন মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। এখানকার ক্রুশচিহ্নগুলো ক্ষয়ে গেছে কালের প্রকোপে, আর আগামীকাল থেকেই সম্ভবত নতুনদের এখানে এনে শোওয়ানো হবে। অযত্নে বেড়ে ওঠা অসংখ্য গোলাপ ও বিশাল কালো সাইপ্রেস গাছে জায়গাটা ছেয়ে আছে। এক বিষণ্ণ অথচ সুন্দর বাগান...নরমাংসে লালিত-পালিত।

আমি এখানে একা, সম্পূর্ণ একা। সুতরাং একটা সবুজ গাছের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে বসলাম। ঘন মলিন শাখাপ্রশাখার মাঝে নিজেকে পুরোপুরি লুকিয়ে ফেললাম। জাহাজডুবি হওয়া কোনও মানুষ যেমন করে ভাসমান কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরে, ঠিক তেমনি করে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আমি অপেক্ষায় রইলাম।

pathagar.net

যখন পুরোপুরি অন্ধকার হল, আমি আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। হালকা নিঃশব্দ পায়ে ধীরে মৃত মানুষে আকীর্ণ ওই মাটিতে পায়চারি করতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু ওর সমাধি আর খুঁজে পেলাম না। দু-হাত সামনে বাড়িয়ে হাতে, পায়ে, হাঁটুতে, বুকে, এমনকী মাথাতেও বিভিন্ন সমাধির ধাক্কা খেয়ে আমি এগিয়ে চললাম, কিন্তু তবু ওকে খুঁজে পেলাম না। অন্ধের মতো আমি পথ হাতড়ে চললাম। স্পর্শে অনুভব করলাম সমাধি-প্রস্তরগুলো, ক্রুশগুলো, লোহার রেলিং, ধাতুর মালা ও বিবর্ণ ফুলের অঞ্জলি। আঙুলে অনুভব করে অক্ষরে আঙুল বুলিয়ে তাদের নামগুলো আমি পড়তে লাগলাম। কী ভয়ঙ্কর রাত! কী ভয়ঙ্কর রাত! ওকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

আকাশে চাঁদ নেই। এ এক অদ্ভুত রাত। আমি ভয় পেলাম। কবরের দুই সারির মাঝের সরু পথটায় দাঁড়িয়ে ভীষণ ভয় পেলাম। কবর! কবর! কবর! কবর ছাড়া আর কিছু নেই। আমার ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, চারপাশে, প্রতিটি জায়গায় শুধু কবর! তারই একটার ওপরে বসে পড়লাম, কারণ, আর আমি হাঁটতে পারছি না, আমার হাত যেন ভেঙে পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। আর সেইসঙ্গে আরও একটা শব্দ কানে এল। কীসের শব্দ? এক অস্পষ্ট নাম-না-জানা শব্দ। শব্দটা কি আমার মাথার ভেতর থেকে আসছে, নাকি এর জন্ম দিয়েছে অভেদ্য রাত, অথবা মানুষের মৃতদেহ রোপিত এই রহস্যময় মাটির গভীর স্তর? চারপাশে ভালো করে তাকালাম, কিন্তু কিছুই ঠাহর হল না। কতক্ষণ যে ওখানে বসেছিলাম বলতে পারি না। আতঙ্কে আমি তখন অসাড়, স্থবির। ভয়ে শরীর ঠান্ডা। চিৎকার করে ওঠার জন্যে আমি তৈরি, হয়তো মরার জন্যেও।

হঠাৎই মনে হল, যে-মার্বেল পাথরের ওপরে আমি বসে আছি সেটা সত্যিই নড়ছে। যেন কেউ ওটা ধীরে-ধীরে তুলে ধরছে। একলাফে আমি পাশের কবরে গিয়ে পড়লাম এবং দেখলাম, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখলাম, এইমাত্র ছেড়ে আসা পাথরটা ওপরে উঠছে। তারপর দেখা গেল মৃত মানুষটাকে ঃ এক উলঙ্গ কঙ্কাল—পিঠ কুঁজো করে পাথরটা ঠেলে তুলছে। রাত ঘন অন্ধকার, কিন্তু আমি পরিষ্কার সব দেখতে পেলাম! ক্রুশ চিহ্নের ওপর লেখা আছে ঃ

এখানে শুয়ে আছেন জ্যাক অলিভ্যাঁ—একান্ন বছর বয়েসে মারা গেছেন। পরিবারের সকলকে তিনি ভালোবাসতেন, তিনি দয়ালু ও সম্মানিত ছিলেন এবং ঈশ্বরের করুণায় মুক্তি লাভ করেছেন।

সমাধি-প্রস্তরে লেখা কথাগুলো মৃত ব্যক্তিও পড়ল। তারপর রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট ছুঁচলো পাথর সে কুড়িয়ে নিল। অক্ষরগুলোকে অতি যত্নে ঘষে তুলতে লাগল। ধীরে-ধীরে সে মুছে ফেলল লেখাগুলো। যেখানে সেগুলো খোদাই করা ছিল, সেই জায়গাটা দেখতে লাগল চোখের অন্ধকার কোটর মেলে। তারপর, চকমকি দেশলাই দিয়ে ছোট-ছোট ছেলেরা যেমন দেওয়ালে লেখে, সেইরকম করে তার তর্জনীর হাড়ের প্রান্ত দিয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে সে লিখতে লাগল ঃ

এখানে বিশ্রাম করছেন জ্যাক অলিভ্যাঁ। একান্ন বছর বয়সে মারা গেছেন। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার বাসনায় তিনি নির্দয় ব্যবহারে তাঁর পিতার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছেন। নিজের স্ত্রীকে যন্ত্রণা দিয়েছেন। পুত্র-কন্যাদের কষ্ট দিয়েছেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। যাঁকে সম্ভব লুণ্ঠন করেছেন এবং চরম দুর্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

লেখা শেষ করে মৃত মানুষটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দেখতে লাগল নিজের সদ্যসমাপ্ত সৃষ্টি। ফিরে তাকিয়ে দেখি সমস্ত কবরই খোলা, আর সেখান থেকে সব মৃতদেহ বেরিয়ে এসেছে। সমাধি-প্রস্তরের ওপর থেকে তারা মুছে দিয়েছে তাদের আত্মীয়দের লেখা সুন্দর-সুন্দর কথাগুলো এবং পরিবর্তে লিখে দিচ্ছে নিখাদ সত্যিটুকু। আমি দেখলাম, প্রত্যেকেই তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছে—প্রত্যেকেই বিদ্বেষপরায়ণ, অসাধু, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী, দুর্বৃত্ত, কুৎসাপ্রিয়, পরশ্রীকাতর। দেখলাম, ওরা চুরি করেছে, প্রতারণা করেছে, কোনওরকম লজ্জাকর ও জঘন্য কাজ বাদ দেয়নি—এইসব আদর্শ পিতা, বিশ্বস্ত স্ত্রী, অনুরক্ত পুত্র, চরিত্রবতী কন্যা ও সৎ ব্যবসায়ীর এই হল স্বরূপ! এইসব নারী ও পুরুষদের সকলে সমস্ত নিন্দার ঊর্ধ্বে বলে এতদিন জেনে এসেছে! নিজেদের চিরন্তন আবাসের প্রবেশ-পথে ওরা সকলে একইসঙ্গে লিখে চলেছে সত্যি কথাটুকু—ভয়ঙ্কর ও পবিত্র সত্য, ওরা বেঁচে থাকতে যা কেউ জানত না, অথবা না জানার ভান করে এসেছে।

ভাবলাম, ও নিজেও হয়তো ওর সমাধি-প্রস্তরে কিছু না কিছু লিখেছে। সুতরাং এখন নির্ভয়ে আধখোলা কফিন, মৃতদেহ ও কলঙ্কের সমারোহ ভেদ করে আমি ছুটে চললাম ওর কাছে। মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এক্ষুনি ওকে খুঁজে বের করতে হবে। শবাচ্ছাদনবস্ত্রে ওর মুখ ঢাকা ছিল, কিন্তু মুখ না দেখেও আমি ওকে পলকে চিনতে পারলাম, আর সেই মার্বেল পাথরের ক্রুশ চিহ্নে, যেখানে একটু আগে লেখা ছিল—

ও ভালোবেসেছিল, ভালোবাসা পেয়েছিল, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছে।

সেখানে এখন লেখা রয়েছে—

নিজের প্রেমিককে প্রতারণা করতে একদিন বৃষ্টিতে ও বেরিয়েছিল। তারপর সর্দির প্রকোপে মৃত্যুবরণ করে।

মনে হয়, পরদিন সকালে ওই কবরের ওপর অজ্ঞান অবস্থায় ওরা আমাকে আবিষ্কার করে।

➤ *ওয়াজ ইট এ ড্রিম!*

pathagar.net

কবর

রিচার্ড ম্যাথিসন ও রিচার্ড ক্রিশ্চান ম্যাথিসন

pathagar.net

সে জেগে উঠল।

চারদিক অন্ধকার, ঠান্ডা। চুপচাপ।

দারুণ তেষ্টা পেয়েছে, সে ভাবল। হাই তুলে উঠে বসল, এবং যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে পড়ে গেল। তার মাথাটা কিছুতে ধাক্কা খেয়েছে। ভুরুর ওপরে কেঁপে ওঠা পেশিতে সে হাত ঘষল। টের পেল, ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে মাথা পর্যন্ত।

ধীরে-ধীরে সে আবার উঠে বসতে গেল, কিন্তু আবার চোট পেল মাথায়। বিছানা এবং ওপরের কোনও ছাদের মাঝে সে আটকা পড়েছে। ওপরের ছাদটা অনুভব করতে সে হাত তুলল। নরম, কমনীয়। তার আঙুলের চাপে টোল পড়ছে। ছাদের মসৃণ তলে সে হাত বোলাল। যতদূর নাগাল পৌঁছয় ততদূর এই ছাদ বিছিয়ে রয়েছে। দুশ্চিন্তায় ঢোক গিলল সে। শিউরে উঠল।

এই জিনিসটা আসলে কী?

চাপ দিয়ে পায়ের দিকে নামতে চাইল সে, কিন্তু শ্বাস টেনে আচমকা থমকাল। একটা দেওয়াল তাকে থামিয়ে দিয়েছে। ডানদিকে হাত বাড়াতেই তার হৃৎপিণ্ডের গতি আরও দ্রুত হল। বাঁদিকেও একই অবস্থা। সে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি। নরম-পানীয়ের কৌটোর মতো তার হৃৎপিণ্ড চুপসে গেল, রক্তের জোয়ার বেড়ে উঠল শতগুণ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে বুঝতে পারল তার গায়ে পোশাক রয়েছে। প্যান্ট, কোট, জামা, টাই ও বেল্ট। পায়ে জুতো।

তার ডানহাত ঢুকে গেল প্যান্টের পকেটে, হাতড়াল। ঠান্ডা চৌকো ধাতুর স্পর্শ পেল সে এবং সেটা নিয়ে এল পকেটের বাইরে, চোখের সামনে। তার আঙুল কাঁপছে। ওপরের কবজা দেওয়া ঢাকনাটা খুলে বুড়ো আঙুলে চাপ দিয়ে চাকা ঘোরাল সে। আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরুল, কিন্তু শিখা জ্বলে উঠল না। আবার চাকা ঘোরাতেই শিখা জন্ম নিল।

কমলা আভায় আলোকিত নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে সে আবার শিউরে উঠল। আলোর শিখায় এখন সে দেখতে পাচ্ছে চারপাশ। সব দেখে তার বুক চিরে বেরিয়ে আসতে চাইল দমফাটা এক চিৎকার।

সে একটা বাক্সের মধ্যে রয়েছে। একটা কফিন!

তার হাত থেকে লাইটার খসে পড়ল। বাতাসে হলদে দাগ কেটে শিখা নিভে গেল। আবার সব অন্ধকার। কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু শুনতে পাচ্ছে নিজের ভয়ার্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। হৃৎপিণ্ড হোঁচট খাচ্ছে চলতে-চলতে, লাফিয়ে উঠতে চাইছে গলা দিয়ে।

এখানে সে কতক্ষণ রয়েছে? কয়েক মিনিট? কয়েক ঘণ্টা? নাকি কয়েক দিন?

হয়তো এটা কোনও দুঃস্বপ্ন, এই প্রত্যাশা ঝলসে উঠল তার মনে। নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখছে, তার অবচেতন মনে ছায়া পড়েছে কোনও বিকৃত দৃশ্যপটের। কিন্তু সে জানে, এ অনুমান ভুল। যত বীভৎসই হোক, সে জানে আসলে কী হয়েছে।

যে-জায়গাটা সে সবচেয়ে ভয় পেত, ওরা তাকে ধরে সেখানেই পুরে দিয়েছে। ওদের কাছে নিজের এই ভয় প্রকাশ করে সে আরও মারাত্মক ভুল করেছে। এর চেয়ে ভালো অত্যাচারের পথ আর খুঁজে পেত না ওরা। একশো বছর ধরে ভাবলেও খুঁজে পেত না।

হা ভগবান! ওরা কি তাকে এতই ঘেন্না করত যে, শেষ পর্যন্ত এই কাণ্ড করল?

অসহায়ভাবে সে কাঁপতে শুরু করল, তারপর নিজেকে সামলে নিল। না, ওদের সে জিততে দেবে না। তাকে মেরে ফেলে এত সহজে তার ব্যবসা দখল করবে? না, না কিছুতেই না।

তাড়াতাড়ি সে লাইটারটা খুঁজতে লাগল। এটাই ওরা ভুল করেছে, সে ভাবল। গর্দভ বেজন্মার দল। ওরা ভেবেছে এটা এক চরম জুতসই ঠাট্টা: কোম্পানিকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বর্ণাক্ষরে ধন্যবাদ জানানো। সোনালি লাইটারের গায়ে খোদাই করে লেখা রয়েছে: 'চার্লিকে—ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।'

ঠিক—সে বিড়বিড় করল। হতচ্ছাড়া কুত্তার বাচ্চাগুলোকে সে হারিয়ে দেবে। এত সহজে তার নিজের হাতে গড়া কোম্পানি সে ওদের চুরি করতে দেবে না। এত সহজে তাকে খুন করে ফেলা যায় না। হ্যাঁ, 'ইচ্ছে' তার ছিল। শেষ 'ইচ্ছে'। উইল। তার উইল।

pathagar.net

লাইটারের ওপর তার আঙুল আঁকড়ে বসল। আঙুলের গাঁট সাদা হয়ে গেল চাপে। হাঁপানো বুকের ওপর সেটা তুলে ধরল সে। বুড়ো আঙুলে চাকতিটা ঘোরাতেই চকমকি পাথরে ঘষা খেল চাকার রুক্ষ শরীর। শিখা জ্বলে উঠল দপ কর। শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত করে সে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল কতটুকু জায়গা রয়েছে কফিনের ভেতরে : চারপাশে মাত্র কয়েক ইঞ্চি করে জায়গা।

এইটুকু জায়গায় কতটা বাতাস থাকতে পারে? সে ভাবল। লাইটার নিভিয়ে দিল সে। অক্সিজেন ফুরিয়ে ফেল না, সে বলল নিজেকেই। অন্ধকারেই কাজ সারো।

সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত ছিটকে গেল ওপরে, চেষ্টা করল ঢাকনাটা ঠেলে খুলতে। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে সে ঠেলতে লাগল। কিন্তু ঢাকনা অনড়-অটল। দু-হাত শক্ত মুঠো পাকিয়ে সে ঢাকনায় ঘুষি মেরে চলল। তার শরীর ভিজে গেল ঘামে, চুল স্যাঁতস্যাঁতে হল, কিন্তু সবই নিষ্ফল।

প্যান্টের বাঁ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটো চাবিসমেত একটা চেন বের করে নিল সে। চাবি দুটোও ওরা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। বোকা বেজন্মার দল। ওরা কি ভেবেছে, সে এত ভয় পেয়ে যাবে যে, মাথা খাটাতে পারবে না? এও ওদের এক মজার ঠাট্টা। তার জীবনকে পুরোপুরি তালা বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা। গাড়ি আর অফিসের চাবি আর কোনওদিন তার দরকার হবে না; তা হলে সে-দুটো তার সঙ্গে কফিনে ভরে দেওয়া যাক না কেন?

ভুল, সে ভাবল। এখন এ-দুটোই তার কাজে লাগবে।

চাবি দুটো মাথার ওপরে নিয়ে এসে একটার ধারালো মুখ দিয়ে রেশমি আস্তরণটা কাটতে লাগল সে। প্রথমে সুতো, তারপর কাপড়। অবশেষে হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল আস্তরণের রেশমি কাপড়, ভেতরের পালকের গদি। ছিঁড়ে-ছিঁড়ে সেগুলো জড়ো করল সে। চেষ্টা করল খুব ধীরে-ধীরে শ্বাস নিতে। বাতাস বুঝে-শুনে খরচ করতে হবে।

সে লাইটার জ্বালাল। ওপরের পরিষ্কার জায়গাটার দিকে তাকাল। আঙুলের টোকা মারল সেখানে। তারপর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওক কাঠ, ধাতুর চাদর নয়। ওদের আরও গলদ। ঘেন্নায় হাসল সে। সহজেই বোঝা যায়, কেন সে চিরটাকাল ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। বোকা বেজন্মার ঝাড়—সে অস্ফুটভাবে বলল। তাকিয়ে রইল ভারি কাঠের ঢাকনার দিকে। চাবি দুটোকে শক্ত মুঠোয় ধরে ওদের খাঁজকাটা প্রান্ত দুটো ওক কাঠের ওপর ঘষতে লাগল। খুঁড়তে লাগল। লাইটারের শিখা কেঁপে উঠল। চাবির খোঁচায় ঢাকনা থেকে খসে পড়ছে কাঠের কুচি। টুকরোর পর টুকরো। সে দেখতে লাগল। লাইটার বারবার নিভে যাচ্ছে, আর বারবার চকমকি ঘষে সেটা জ্বালতে হচ্ছে। বাতাস ফুরিয়ে যাবে এই ভয়ে আবার লাইটার নিভিয়ে দিল সে। অন্ধকারেই কাঠ খুঁড়ে চলল। কাঠের কুচি ঝরে পড়ছে তার গলায়, থুতনিতে। তার হাত ব্যথা করতে লাগল।

pathagar.net

শক্তি ফুরিয়ে আসছে। আগের মতো আর সহজে কাঠ খসে পড়ছে না। চাবি দুটো বুকের ওপর রেখে আবার লাইটার জ্বালাল সে। নজরে পড়ল, কাঠের গায়ে ইঞ্চি কয়েক গভীর এবড়োখেবড়ো একটা দাগ। উহুঁ, এতে হবে না, সে ভাবল। এতে হবে না।

গা ছেড়ে দিয়ে একটা গভীর শ্বাস নিল সে, কিন্তু থমকে গেল মাঝপথেই। বাতাস ফুরিয়ে আসছে। সে হাত বাড়িয়ে ঢাকনার ওপর ঘুষি মারতে শুরু করল।

এই হতচ্ছাড়া ঢাকনাটা খুলে দাও—সে চিৎকার করে উঠল। চামড়ার নীচে তার ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠল একইসঙ্গে : এটা খুলে আমাকে বেরোতে দাও।

আরও কিছু করতে না পারলে আমি মারা যাব, সে ভাবল। তখন ওরাই জিতবে।

তার মুখ কঠিন হয়ে এল। জীবনে কোনওদিন সে হাল ছাড়েনি। কোনওদিনও না। না, ওদের জিততে দেবে না কিছুতেই। মন স্থির করে ফেলার পর পৃথিবীর কোনও শক্তি তাকে রুখতে পারে না। মনের জোর কাকে বলে, সে দেখিয়ে দেবে ওই বেজন্মাগুলোকে।

চটপট লাইটারটা ডানহাতে নিয়ে বারকয়েক চাকা ঘোরাল সে। দপদপ করে উঠল আগুনের শিখা, তার চোখের সামনে নাচতে লাগল অনিশ্চিতভাবে। বাঁ-হাতে ডানহাত চেপে ধরল সে, তারপর স্থিতিশীল হাতটা জ্বলন্ত শিখা সমেত নিয়ে গেল কফিনের ঢাকনার ক্ষতের কাছে। সেটাকে পোড়াতে লাগল।

ছোট দ্রুত শ্বাস ফেলে বিউটেন গ্যাসের গন্ধ নিতে লাগল সে। একইসঙ্গে পোড়া কাঠের গন্ধে কফিনটা ভরে উঠছে। ঢাকনার কাঠে ছোট-ছোট আগুনের ফুলকি চোখে পড়ছে। আগুনের শিখাটা সে টেনে নিয়ে চলল কাঠের ক্ষত বরাবর। সামনে। পিছনে। কয়েক মুহূর্ত এক জায়গায় ধরে থাকে, তারপর আর-এক জায়গায়। একসময় অস্ফুট শব্দে সরব হল ঢাকনার কাঠ।

হঠাৎই কাঠের ওপর এক জায়গায় আগুন ধরল। পোড়া ওক কাঠের ধূসর ধোঁয়া নাকে-মুখে যেতেই সে কেশে উঠল। কফিনের বাতাস হালকা হয়ে এসেছে, সে বুঝতে পারছে। তার ফুসফুস আরও পরিশ্রমে বাতাস টেনে চলেছে। এখুনি হয়তো সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তার শরীরের সাড় ক্রমে ফুরিয়ে আসছে।

মরিয়া হয়ে গায়ের জামাটা খুলতে চাইল সে। টানাটানিতে কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে গেল। জামার কিছুটা ছিঁড়ে সে জড়িয়ে নিল ডানহাতে। ঢাকনার একটা অংশ পুড়ে ভঙ্গুর হয়ে গেছে। কাপড় জড়ানো হাতে সে ঘুষি চালাল সেই জায়গাটা লক্ষ্য করে। পোড়া কাঠ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঘুষির জোরে কাঠ ভেঙে পড়ল। জ্বলন্ত কাঠের টুকরো খসে পড়ল তার গলায়, মুখে। দিশেহারা ব্যস্ত হাতে সে পরিষ্কার করতে লাগল কাঠের টুকরোগুলো। কয়েকটা টুকরো পুড়িয়ে দিল তার বুক ও হাত। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠল।

ঢাকনার একটা অংশ এখন জ্বলন্ত কাঠের কঙ্কাল। আগুনের তাপ আসছে তার মুখে। সে কুঁকড়ে সরে যেতে চাইল, খসে পড়া কাঠের টুকরো এড়াতে মাথা ঘোরাল পাশে। কফিন ধোঁয়ায় ভরে গেছে, শ্বাস নিতে চাইলে দম আটকানো পোড়া গন্ধ নাকে আসছে। কাশতে-কাশতে তার গলা জ্বলে গেল। কাপড় জড়ানো হাতে ঢাকনার ওপর সে যত ঘুষি মারছে ধুলোর মতো ছাইয়ের গুঁড়োয় তার নাক-মুখ ততই ভরে উঠছে। ওঃ জলদি, আরও জলদি! অধৈর্য হয়ে সে চিৎকার করে উঠল।

হঠাৎই ঢাকনার অংশটা ভেঙে পড়ল তার চারপাশে। জ্বলন্ত টুকরোগুলোকে নেভাতে সে মুখে, ঘাড়ে, বুকে হাত চাপড়াতে লাগল। কিন্তু হিসহিস শব্দে তার চামড়া পুড়তে লাগল। জ্বলন্ত কণাগুলো নেভাতে গিয়ে অনেক যন্ত্রণা সইতে হল।

জ্বলন্ত কাঠের টুকরোগুলো অবশেষে একে-একে নিভে গেল। লাইটারটা আশেপাশে খুঁজল সে, খুঁজে পেল, জ্বালাল।

যা দেখল তাতে সে শিউরে উঠল। গাছের শিকড়ে ছাওয়া ভিজে মাটিতে ওপরটা আঁটোসাঁটো করে ঠাসা।

হাত বাড়িয়ে মাটিতে আঙুল চালাল সে। অস্থির শিখার আলোয় সে দেখল অসংখ্য পোকা আর সাদা কেঁচো কিলবিল করছে, তার মুখের খুব কাছে ঝুলছে। সে যতটা সম্ভব পিছিয়ে এল—ওদের কিলবিলে শরীর থেকে যতটা দূরে সরে যাওয়া যায়।

হঠাৎই একটা সাদা কীট খসে পড়ল তার মুখের ওপরে। ওটার জেলির মতো আঠালো দেহটা আটকে গেল তার ওপরের ঠোঁটে। ঘেন্নায় সে কুঁকড়ে গেল, শিউরে উঠল, দু-হাত ছুড়ে দিল ওপরে, মাটি খুঁড়তে লাগল। একইসঙ্গে মাথার প্রবল ঝাঁকুনিতে পোকাটাকে ছিটকে ফেলে দিল। তারপর মাটি খুঁড়েই চলল। নোংরা মাটি খসে-খসে পড়তে লাগল তার গায়ে। নাকে মাটি ঢুকে গিয়ে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঠোঁটে আটকে থাকা মাটিগুলো ধীরে-ধীরে ঢুকে যাচ্ছে মুখে। সে শক্ত করে চোখ বুজল, কিন্তু তবু টের পেল মাটির দলা ভোঁতা শব্দে এসে পড়ছে তার চোখের পাতার ওপর। শ্বাস বন্ধ করে এক অমানুষিক মাটি-খোঁড়া যন্ত্রের মতো সে হাত চালাতে লাগল ওপরে, মাটির ভিতরে। মাঝে-মাঝে শরীরটাকে উঁচু করে মাটিগুলো সে জমা হতে দিল পিঠের নীচে, আশেপাশে। বাতাসের খিদেয় তার ফুসফুস হাঁপাচ্ছে। চোখ খুলতে তার সাহস হল না। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে তার আঙুলের ছাল-চামড়া ছিঁড়ে গেল। কয়েকটা আঙুলের নখ উলটে গেল, ভেঙে পড়ল। যন্ত্রণা অনুভব করার মতো অবস্থা তার নেই। দরদর করে যে রক্ত পড়ছে তাও বুঝতে পারছে না। তবে জানে, রক্তের ধারায় মাটিতে মরচের মতো দাগ পড়েছে। প্রতি সেকেন্ডে তার হাত ও ফুসফুসের যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে। সেই ব্যথা যেন নৃশংসভাবে চিরে ফেলছে তার শরীর। হাঁটু ভাজ করে সে প্রাণপণে ওপরে চাপ দিয়ে চলল। ধস্তাধস্তি করে বাঁকাচোরাভাবে কোনওরকমে উবু হয়ে বসল। হাত দুটো মাথার ওপরে, দু-বাহু চেপে বসে আছে মুখের দুপাশে। ভয়ঙ্করভাবে সে

pathagar.net

মাটি খাবলে চলল—তার বাঁকানো আঙুলের তীব্র খোঁচায় মাটি খসে পড়ছে ধীরে-ধীরে। আর একটু—সে মনে-মনে বলল, আর একটু। নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারাতে সে চায় না। এখন থেমে গিয়ে মাটির তলায় মরতে সে রাজি নয়। শক্ত করে দাঁতে দাঁত চাপল—চোয়ালের চাপে তার দাঁত বুঝি ভেঙে যাবে। হাল ছেড়ো না—সে ভাবল। হাল ছেড়ো না! আরও জোরে সে হাত চালাতে লাগল, মাটির স্তূপ জমতে শুরু করল তার শরীরের ওপর। ছেয়ে ফেলল মাথার চুল, কাঁধ। নোংরা আঠালো মাটি চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল তাকে। ফুসফুস দুটো যেন ফেটে যাবে বিকট শব্দে। সে শেষবার শ্বাস নিয়েছে কখন? প্রায় কয়েকমিনিট হবে হয়তো। বাতাসের জন্য সে চিৎকার করে উঠতে চাইল, কিন্তু পারল না ছেঁড়া নখের যন্ত্রণায় তার আঙুলগুলো দপদপ করছে। মাটির কাঁকরে স্নায়ুতন্ত্রী ও মাংস ঘষা খেয়ে জ্বলছে। যন্ত্রণায় হাঁ করল সে। মুখে মাটি ঢুকে গেল, জিভ ঢেকে গিয়ে জমা হল গলার ভেতরে। দম আটকে বমি পেল। বমি ও মাটি মিশে ছিটকে বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। শ্বাসপ্রশ্বাসে যত মাটি নাকে ঢুকছে তার মাথা থেকে জীবনের চিন্তা ততই দূরে সরে যাচ্ছে। দম বন্ধ হয়েই সে বুঝি মারা যাবে। শ্বাসনালীতে মাটি জমাট বেঁধেছে। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্বিগুণ হল। আমি, আমি হেরে যাচ্ছি—। ক্ষোভে হতাশায় সে ভাবল।

হঠাৎই একটা আঙুল মাটি ভেদ করে বেরোল। কিছু না ভেবেই সে কর্নিকের মতো হাত চালাতে শুরু করল, এবং মাটির চাদর ফুটো করে ফেলল অসীম শক্তিতে। তার হাত দুটো যেন পাগল হয়ে গেছে, ধাক্কা মারছে, খুঁড়ছে মাটির স্তূপ—যতক্ষণ না ফুটোটা বড় হল। কাদামাটি মাখা শরীর নিয়ে সে গর্তটা লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি হাত ছুড়তে লাগল। মনে হল, বুকটা বুঝি মাঝখান দিয়ে ফেটে দু-আধখানা হয়ে যাবে।

তারপর তার হাত দুটো কবর খুঁড়ে বেরিয়ে এল, এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে কোনওরকমে শরীরের ওপরের অংশ বের করে নিয়ে প্রাণপণে বেরোনোর চেষ্টা করতে লাগল। শেষে তার পা দুটো বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। একটানে পা দুটোকে মুক্ত করেই সে সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে, বাতাস গিলে ফুসফুস ভরতি করতে চাইল। কিন্তু শ্বাসনালী আর মুখে নোংরা জমাট বেঁধে থাকায় হাওয়া ঢুকতে পারছে না এতটুকু। সে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। কখনও চিত হয়ে, কখনও পাশ ফিরে। অবশেষে সে উপুড় হয়ে হাঁটুগেড়ে বসতে পারল এবং দম আটকানো প্রচণ্ড কাশিতে কফ-মাখা কাদামাটি ছিটকে বেরোল তার শ্বাসনালী থেকে। কালচে থুতু গড়িয়ে পড়ল চিবুক বেয়ে। ভয়ঙ্কর দমকে বমি করতে শুরু করল। মুখ থেকে কাদামাটি গড়িয়ে এসে পড়ছে ঘাসের ওপরে। যখন অনেকটা বেরিয়ে এল, সে হাঁপাতে শুরু করল। কারণ চাপ-চাপ অক্সিজেন ছুটে এসে ঢুকছে তার শরীরের ভেতর, ঠান্ডা বাতাস শরীরের ভেতর জাগিয়ে তুলছে প্রাণের সাড়া।

আমি জিতেছি—সে ভাবল। বেজন্মাগুলোকে আমি হারিয়ে দিয়েছি, হারিয়ে

pathagar.net

দিয়েছি! জয়ের উগ্র আনন্দে সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। একসময় পিটপিট করে চোখ খুলে সে তাকাল চারপাশে। রক্তাক্ত চোখের পাতা ঘষতে লাগল। সে চলন্ত গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। অন্ধ করে দেওয়া তীব্র আলোর রেখা কাটাকুটি খেলতে লাগল। কখনও ছুটে আসছে বাঁ-দিক থেকে, কখনও ডানদিক থেকে। আলোর ঝলসানিতে সে হতবাক হয়ে গেল, কুঁকড়ে উঠল, কিন্তু তারপরই বুঝতে পারল সে কোথায় রয়েছে।

বড় রাস্তার পাশের কবরখানায়।

গর্জন করে এদিক-ওদিক ছুটে চলেছে গাড়ি আর ট্রাকের দল। চলন্ত চাকায় শনশন শব্দ উঠছে। জীবনের কাছাকাছি আবার আসতে পেরেছে বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আবার সে এসেছে স্পন্দন ও মানুষের মাঝে। সশব্দ হাসিতে তার ঠোঁট ফাঁক হল।

ডানদিকে তাকিয়ে সে দেখল, শ'খানেক গজ দূরে রাস্তার ওপর একটা ধাতব খুঁটির মাথায় কাছাকাছি পেট্রল পাম্পের পথ-নির্দেশ লেখা রয়েছে।

কোনওরকমে তার মাথায় একটা মতলব এল। পেট্রল পাম্পে যাবে সে, বিশ্রাম-ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেবে, তারপর একটা দশ সেন্ট ধার করে কোম্পানিতে ফোন করে বলবে, তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা লিমুজিন পাঠিয়ে দিতে। না, তার চেয়ে বরং ট্যাক্সি ভালো। তাতে সে ওই কুত্তার বাচ্চাগুলোকে ধোঁকা দিতে পারবে। ওদের চমকে দিতে পারবে। ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছে এতক্ষণে সে শেষ হয়ে গেছে। উহুঁ, সে ওদের হারিয়ে দিয়েছে। এই মৌতাতে সে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। একবার সত্যি-সত্যি জেদ ধরে ফেললে কেউ তাকে আর রুখতে পারবে না, সে আপন মনেই বলল। ফিরে তাকাল পিছনে ফেলে আসা কবরখানার দিকে, একটু আগেই যেখান থেকে সে পালিয়ে বেঁচেছে। পেট্রল পাম্পে সে পিছনদিক থেকে এসে ঢুকল, এবং চুপিচুপি পৌঁছে গেল বাথরুমে। সে চায় না তার রক্তমাখা নোংরা চেহারা কেউ দেখে ফেলুক।

বাথরুমে একটা টেলিফোন রয়েছে: পয়সা দিয়ে ফোন করা যায়। পকেট হাতড়ে খুচরো পয়সা খোঁজার আগে সে বাথরুমের দরজাটা ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দিল। দুটো পেনি ও একটা সিকি খুঁজে পেল সে। রুপোর পয়সাটা ফোনের বাক্সে ফেলল। ওরা তার সঙ্গে পয়সাও দিয়ে দিয়েছে, সে ভাবল, বেজন্মা গাধার দল!

বউকে ফোন করল সে।

বউ ফোন ধরার পর সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতেই ও চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকার আর থামতে চায় না। এ কী ধরনের নোংরা ঠাট্টা—ও বলল, কে এসব জঘন্য ঠাট্টা করছে! সে কিছু বলে বোঝানোর আগেই ও ফোন রেখে দিল। টেলিফোন নামিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল বাথরুমের আয়নার মুখোমুখি।

সে চিৎকার করতে পারল না। শুধু স্থির চোখে চেয়ে রইল। তার দিকে যে

তাকিয়ে রয়েছে সেই মুখটার বহু জায়গায় মাংস নেই। ধূসর চামড়া ভেদ করে বিবর্ণ হলদে হাড় নজরে পড়ছে।

তখন মনে পড়ল, তার বউ টেলিফোনে আরও কী-কী বলেছে। সে কাঁদতে শুরু করল। তার এই আঘাত ধীরে-ধীরে চরম হতাশ-পরিণতির রূপ নিল।

এসব তো সাত মাসের পুরোনো ব্যাপার—তার বউ বলেছে।

সাত মাস! আয়নায় নিজের দিকে আবার তাকিয়ে সে বুঝল তার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

pathagar.net

➤ *হোয়্যার দেয়ার'স এ উইল*

যযাতি

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট শেলি

pathagar.net

১৬ই জুলাই, ১৮৩৩—আজ এক স্মরণীয় বর্ষপূর্তি; আজ আমার তিনশো তেইশ বছর পূর্ণ হল!

মৃত্যুহীন 'ওয়ান্ডারিং জু'* —মোটেই নয়। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে আঠেরোশো বছর পেরিয়ে গেছে। সেই তুলনায় আমি তো অনেক তরুণ অমর।

তা হলে সত্যিই কি আমি অমর? তিনশো তিন বছর ধরে দিন-রাত নিজেকে এ-প্রশ্ন করেছি, কিন্তু তবুও উত্তর খুঁজে পাইনি। আমার বাদামি চুলের গোছায় আজই একটা ধূসর চুল খুঁজে পেয়েছি—এটা নিশ্চয়ই ক্ষয়ের ইশারা। আবার এমনও হতে পারে, এই চুলটা হয়তো তিনশো বছর ধরেই লুকিয়ে ছিল আমার চুলের মাঝে—কারণ, কোনও-কোনও মানুষ কুড়ি পেরোনোর আগেই পাকাপাকি বুড়িয়ে যায়।

আমার গল্পটা শোনাব, তারপর পাঠকই বিচার করবেন। আমার এই গল্প শুনিয়ে অনন্ত মহাকালের কয়েকটি ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়ার মতলব করেছি—কী দীর্ঘ ক্লান্তিকর এই সময়! এ কি সম্ভব? কেউ কি বাঁচে চিরকাল! অনেক জাদুকাহিনির কথা শুনেছি। তাতে অনেককে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে গভীর ঘুমে—তারপর, একশো বছর পরে, যখন তারা জেগে উঠেছে, তখন একেবারে টগবগে সতেজ। 'সেভেন স্লিপার্স'-এর কথাও আমি শুনেছি—সুতরাং অমর হওয়াটা যে বিরাট বোঝা তা নয়। কিন্তু ওঃ!

---

* **ওয়ান্ডারিং জু** ঃ বাইবেলে বর্ণিত জনৈক ইহুদি। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় যিশুকে অপমান করার অপরাধে এই ব্যক্তি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অমর থেকে নিরন্তর ঘুরে বেড়াবে।

অন্তহীন সময়ের বোঝা যে কী ভীষণ—প্রতি ঘণ্টার ক্লান্তিকর শাসন! গল্পের সেই নূরজাহাদ কী সুখীই না ছিল! না, এবারে কাজের কথায় আসি।

কর্নেলিয়াস অ্যাগ্রিপ্পার কথা দুনিয়ার সবাই শুনেছে। তাঁর কারিকুরি আমাকে যেরকম অমর করেছে, তাঁর স্মৃতিও তেমনই অমর। তাঁর সেই গবেষকের কথাও সকলেই জানে। গুরুর অনুপস্থিতিতে নিজের অজান্তে সে সৃষ্টি করেছিল অপবিত্র দানব—আর ধ্বংসও হয়েছে তারই হাতে। সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ায় খ্যাতিমান দার্শনিকমশায়ের অনেক অসুবিধে হয়েছিল। তাঁর সব গবেষক-ছাত্র ছেড়ে গিয়েছিল তাঁকে—তাঁর ভৃত্যরাও চম্পট দিয়েছিল। তাঁর কাছে এমন একটি মানুষও ছিল না যে তাঁর ঘুমের সময়ে তাপচুল্লিতে কয়লা ঢালবে, কিংবা তাঁর পড়াশোনার সময়ে তাঁর রং পালটানো ওষুধের দিকে নজর রাখবে। একটার পর একটা পরীক্ষা ব্যর্থ হতে লাগল, কারণ, মাত্র একজোড়া হাতে সেসব পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। একটি মানুষকেও তাঁর অধীনে রাখতে না পারার ব্যর্থতার জন্যে রহস্যময় প্রেতের দল তাঁকে বিদ্রুপ করতে লাগল।

তখন আমার বয়স অনেক কম—বেশ গরিবও ছিলাম—আর হাবুডুবু খাচ্ছিলাম প্রেমে। প্রায় এক বছর আমি কর্নেলিয়াসের ছাত্র ছিলাম। তবে ওই দুর্ঘটনার সময়ে আমি হাজির ছিলাম না। ফিরে আসতেই বন্ধুবান্ধবরা আমাকে কাকুতিমিনতি করতে লাগল, আমি যেন ওই অপরসায়নবিদের আস্তানায় আর না যাই। তাদের কাছে দুর্ঘটনার করুণ কাহিনি শুনতে-শুনতে আমি শিউরে উঠেছিলাম। সুতরাং আমাকে দ্বিতীয়বার সাবধান করার দরকার হয়নি। এরপর কর্নেলিয়াস এসে আমাকে যখন প্রস্তাব দিলেন, আমি যদি তাঁর কাছে থাকি তা হলে আমাকে এক থলে মোহর দেবেন, আমার মনে হল, স্বয়ং শয়তান যেন আমাকে লোভ দেখাচ্ছে। আমার দাঁত ঠকঠক করতে লাগল, মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল, আতঙ্কে নড়বড়ে হাঁটু নিয়ে যত জোরে সম্ভব ছুটে পালিয়ে গেলাম।

এরপর দুটি বছর ধরে আমার দুর্বল পদক্ষেপ প্রতি সন্ধ্যায় এক অদ্ভুত আকর্ষণে পবিত্র সজীব জলের এক ঝিরঝিরে ঝরনার কাছে চলে যেত। তার ঠিক পাশটিতেই এক কৃষ্ণকেশী তরুণী পায়চারি করত, আশা-ভরা ঝিকিমিকি চোখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত আমার পথের পানে। বার্থাকে আমি কোন মুহূর্তটা যে ভালোবাসিনি তা মনে পড়ে না। ছোটবেলা থেকেই আমরা প্রতিবেশী, খেলাধুলোও করতাম একসঙ্গে। ওর বাবা-মা ছিলেন আমার মা-বাবারই মতো সাদাসিধে, অথচ মাননীয়। আমাদের মেলামেশা দেখে ওঁরা সকলে আনন্দ পেতেন। এক দুঃসময়ে কঠিন এক অসুখে ওর বাবা-মা দুজনেই চলে গেলেন, আর বার্থা হয়ে গেল অনাথ। ও হয়তো আমাদের বাড়িতেই আপন-ঘর খুঁজে পেত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কাছাকাছি একটি প্রাসাদের ধনী, নিঃসন্তান, একাকিনী এক বৃদ্ধা ওকে দত্তক নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। অতএব এরপর থেকে বার্থার পরনে থাকত রেশমি পোশাক, বাস করত মার্বেল

পাথরের প্রাসাদে, আর সবাই ওকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী ভাবত। কিন্তু এই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন সঙ্গীসাথীর মাঝেও বার্থা ওর দুর্দিনের বন্ধুকে ভোলেনি। ও প্রায়ই আমাদের কুটিরে আসত। কিন্তু যখন ওকে সেখানে যেতে নিষেধ করা হল তখন ও চলে যেত কাছের জঙ্গলে—সেখানে ছায়ামাখা ঝরনার পাশে দেখা করত আমার সঙ্গে।

ও প্রায়ই বলত, ওর নতুন আশ্রয়দাত্রীর প্রতি এমন কোনও কর্তব্যের ঋণ ওর নেই যার পবিত্রতা আমাদের সম্পর্কের চেয়েও বেশি। কিন্তু বিয়ে করার মতো সঙ্গতি আমার ছিল না। আর আমার জন্যে কথা শুনতে-শুনতে ও ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ও ছিল উদ্ধত, অধৈর্য্য। আমাদের মিলনের পথে নানান বাধা ওকে রাগিয়ে তুলত। বেশ কিছুদিন পর একবার আমাদের দেখা হতে ওকে বেশ ক্ষুব্ধ মনে হল। ও তিক্তস্বরে অভিযোগ করল, গরিব হওয়ার জন্যে আমাকে একরকম ভর্ৎসনাই করল। আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, 'আমি সৎ, তাই আমি গরিব! তা না হলে অল্পদিনেই আমি বড়লোক হয়ে যেতে পারি!'

এই কথায় তৈরি হল হাজার প্রশ্ন। সত্যি কথাটা বলে ওকে আমি আঘাত দিতে চাইনি, কিন্তু ও নিজেই আমার কাছ থেকে সেটা টেনে বের করল। তারপর ঘৃণাভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি ভালোবাসার ভান করো, অথচ আমার জন্যে শয়তানের মোকাবিলা করতে ভয় পাও!'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম যে, পাছে ও রাগ করে সেই ভয়ে আমি অ্যাগ্রিপ্পার প্রস্তাবে পিছিয়ে গেছি। ও তখন শুধু অ্যাগ্রিপ্পার পুরস্কারের পরিমাণটার কথাই ভাবছিল। এইভাবে উৎসাহিত হয়ে, ওর তিরস্কারে, ভালোবাসা ও আশার হাতছানিতে, হালকা মনে অপরসায়নবিদের প্রস্তাবে সম্মত হতে দ্রুতপায়ে ফিরে গেলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গেই আমাকে বসিয়ে দেওয়া হল অফিসে।

একটা বছর কেটে গেল। অপর্যাপ্ত অর্থের লোভ আমাকে পেয়ে বসল। অভ্যাস আমার ভয় তাড়িয়ে দিয়েছে। সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেও আমি শয়তানের খুরওয়ালা পায়ের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। আর আমাদের আস্তানার স্বেচ্ছা-নিস্তব্ধতা একবারের জন্যেও দানবীয় গর্জনে বিঘ্নিত হল না। আমি যথারীতি লুকিয়ে বার্থার সঙ্গে দেখা করে চললাম, আর আশা জাগল—মনে আশা—কিন্তু নির্মল আনন্দ নয়। কারণ, বার্থার ধারণা, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা হল পরস্পরের শত্রু। আমার হৃদয়ে সে-দুটোকে আলাদা করে রাখাতেই ওর যত আনন্দ। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, ও যেন অনেকটা ছেনাল স্বভাবের ছিল, আর আমি ছিলাম তুর্কিদের মতো ঈর্ষাকাতর। ও হাজারো রকমে আমাকে অবজ্ঞা করত, কিন্তু কখনও নিজের ভুল স্বীকার করত না। ও আমাকে খেপিয়ে পাগল করে দিত, তারপর ওর কাছেই ক্ষমা চাইতে বাধ্য করত। মাঝে-মাঝে ওর খেয়ালি মন ভাবত যে, আমি ওর যথেষ্ট অনুগত নই। তখনই ও এক প্রতিদ্বন্দ্বীর গল্প ফাঁদত—বলত যে, তাঁকে ওর আশ্রয়দাত্রী বেশ পছন্দ করেন।

ওকে সবসময় ঘিরে থাকত রেশমি পোশাক পরা যুবকের দল—বড়লোক ফুর্তিবাজ যুবকের দল। ওদের সঙ্গে তুলনায় কর্নেলিয়াসের এই দুঃস্থ পোশাক পরা গবেষকের সুযোগই বা ছিল কতটুকু?

একবার তো দার্শনিকমশায় আমাকে এমন কাজের চাপে ফেলে দিলেন যে, বার্থার সঙ্গে অভ্যাসমতো দেখা করতে পারতাম না। তিনি কী এক বিশাল গবেষণায় মগ্ন ছিলেন, আর আমাকেও দিন-রাত বাধ্য হয়ে থাকতে হত তাঁর সঙ্গে—তাপচুল্লিতে নিয়ম করে কয়লা দিতাম আর তাঁর বিভিন্ন রাসায়নিক মিশ্রণের দিকে নজর রাখতাম। ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে বার্থা আমার জন্যে বৃথাই অপেক্ষা করত। এই উপেক্ষায় ওর উদ্ধত মনে আগুন জ্বলত। অবশেষে আমি যখন ঘুমের জন্যে বরাদ্দ সামান্য সময়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে সান্ত্বনার আশায় ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, তখন ও আমাকে অভ্যর্থনা করত ঘৃণা দিয়ে, তাচ্ছিল্যে ফিরিয়ে দিত আমাকে। প্রতিজ্ঞা করত, যে-লোক একইসঙ্গে দু-জায়গায় হাজির থাকতে পারে না, তার পক্ষে ওর পাণিগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং অন্য যে-কোনও লোকই ভালো। বার্থাকে শাস্তি পেতে হবে! সত্যি, পেয়েওছে শাস্তি। আমার মলিন আস্তানায় বসে শুনতে পেলাম, বার্থা অ্যালবার্ট হফারের সঙ্গে শিকারে গেছে। ওর আশ্রয়দাত্রী অ্যালবার্ট হফারকে পছন্দ করেন। আমার মলিন জানলার সামনে দিয়ে ওরা তিনজনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে গেল। মনে হল, ওরা যেন আমার নামটা বলাবলি করছিল। তারপরই শোনা গেল উপহাসের হাসি—আর একইসঙ্গে বার্থার কালো চোখ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখল আমার বাড়ির দিকে।

ঈর্ষা তার যাবতীয় বিষ ও নীচতা নিয়ে ঢুকে পড়ল আমার বুকে। ও আর আমার নয়, এ-কথা ভাবতেই কান্নায় ভেসে যাই। ওর এই অস্থির মতির জন্যে তৎক্ষণাৎ হাজারো অভিশাপ দিই ওকে। কিন্তু তবুও, অপরসায়নবিদের তাপচুল্লির আগুন আমাকে খোঁচাতেই হবে, তাঁর দুর্বোধ্য সব ওষুধের অবস্থা পরিবর্তনের ওপরে নজর রাখতে হবে।

একটানা তিন দিন তিন রাত কর্নেলিয়াস নিজেও নজর রেখে চলেছেন, দু-চোখের পাতা এক করেননি কখনও। তিনি যেরকম আশা করেছিলেন তাঁর পাতন যন্ত্রের বিক্রিয়া তার চেয়ে ধীরেই এগোচ্ছিল। ভীষণ দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও তাঁর চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছিল ঘুমে। বারবার তিনি অমানুষিক শক্তিতে ঝিমুনির ঘোর ঝেড়ে ফেলছিলেন। কিন্তু বারবার সেই ঝিমুনি তাঁর চেতনা অপহরণ করছিল। একান্ত আশা নিয়ে তিনি দেখলেন মুচিগুলোর দিকে।

'এখনও হয়নি দেখছি,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'বিক্রিয়া শেষ হতে কি আরও একটা রাত লেগে যাবে? উইন্‌জি, তুমি তো খুব মনোযোগ দিয়ে নজর রাখো—তা ছাড়া তুমি খুব বিশ্বাসী—তুমি কাল রাতে ঘুমিয়েছ। তুমি এই কাচের পাত্রটার দিকে নজর রেখো। এর তরল পদার্থটি হালকা গোলাপি ঃ যেই এর রং পালটাতে শুরু করবে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ডেকে দেবে—ততক্ষণ পর্যন্ত আমি একটু চোখ বুজে

নিই। প্রথমে ওটা সাদা হয়ে যাবে, তারপর ওটা থেকে সোনালি ঝিলিক বেরোবে। কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা কোরো না। গোলাপি রংটা যেই ফিকে হয়ে আসবে তখনই আমাকে ডেকে দিয়ো।'

বিড়বিড় করে বলা শেষ কথাগুলো আমি প্রায় শুনতেই পেলাম না, কারণ, সেগুলো উচ্চারণ করা হয়েছে ঘুমের ঘোরে। কিন্তু তখনও অ্যাগ্রিপ্পা প্রকৃতির কাছে নিজেকে সঁপে দেননি। তিনি আবার বললেন, 'বাবা উইন্‌জি, পাত্রটা ছুঁয়ো না কিন্তু—আর ওটা ঠোঁটেও দিয়ো না। ওটা প্রণয়-মাদক—ভালোবাসাকে সারিয়ে তোলার প্রণয়-মাদক। বার্থাকে তুমি তখন চিরকাল ভালো না বেসে পারবে না—অতএব ওটা খাওয়ার ব্যাপারে সাবধান!'

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর প্রাচীন মাথা ঢলে পড়ল বুকের ওপরে, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ বলতে গেলে শোনাই যাচ্ছিল না। কয়েক মিনিট ধরে পাত্রটির দিকে আমি নজর রাখলাম—তরলের গোলাপি রঙে কোনও পরিবর্তন হল না। তারপরই আমার মন ভেসে গেল নানা চিন্তায়—চলে গেলাম ঝরনার পাশটিতে, ভাবতে লাগলাম হাজারো অপরূপ দৃশ্যের কথা—আর কখনও সেসব ফিরে আসবে না, কখ্‌খনও না! 'কখ্‌খনও না!' কথাটা আমার ঠোঁটে আধাআধি তৈরি হওয়ামাত্রই বুকের ভেতরে কিলবিল করে উঠল ছোট-বড় সাপ। ছলনাময়ী তরুণী! ছলনাময়ী ও নিষ্ঠুর! সেদিন সন্ধ্যায় অ্যালবার্টের দিকে তাকিয়েও যেমন করে হেসেছিল, কখনও আমার দিকে তাকিয়ে সেরকমটি হাসবে না। অপদার্থ জঘন্য মেয়েছেলে! এর শোধ আমি নেবই—ওর চোখের সামনে অ্যালবার্ট ওর পদতলে মারা যাবে—আমার প্রতিহিংসা ওকে শেষ করে দেবে। ও অবজ্ঞার হাসি হেসেছে, হেসেছে বিজয়ীর হাসি—আমার দুর্দশা ও জানত, জানত নিজের ক্ষমতার কথা। কিন্তু কী ক্ষমতা আছে ওর? আমার ঘৃণা আমার তীব্র অবজ্ঞাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা—আমার—ওঃ, আমার উদাসীনতা ছাড়া আর সব বোধকেই ও উত্তেজিত করে তুলেছে! আমি কি পারব উদাসীন হতে—পারব তাচ্ছিল্যের চোখে ওকে দেখতে? যদি আমার ফিরিয়ে দেওয়া ভালোবাসাকে তুলে দিতে পারি আরও সুন্দরী, আরও অনুগত, কোনও রমণীর হাতে, তা হলে সেটাই হবে আমার সত্যিকারের জয়!

আমার চোখের সামনে ঝলসে উঠল এক উজ্জ্বল আলো। দক্ষ অপরসায়নবিদের ওষুধটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি অবাক চোখে সেটার দিকে চেয়ে রইলাম ঃ সূর্যের আলোয় হিরের টুকরো থেকে যে-ঝিলিক ঠিকরে বেরোয় তার চেয়েও উজ্জ্বল অপরূপ সুন্দর আলোর ঝিলিক ছিটকে বেরোচ্ছে তরলের গা থেকে। এক মহৎ ও তীব্র সুগন্ধের ঘ্রাণ আমার চেতনাকে অবশ করে দিল। পাত্রটা যেন ঝলমলে এক সজীব নয়ন মনোহর গোলক, হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে তার স্বাদ নিতে। স্থূল চেতনা সহজাত প্রবৃত্তিবশে প্রথম যে-চিন্তাটাকে আমার মাথায় এনে দিল সেটা হল, আমি খাব—ওই পাত্রের ওষুধ আমাকে খেতেই হবে। পাত্রটা আমি তুলে নিলাম

ঠোঁটের কাছে।

'এটা আমাকে ভালোবাসা থেকে মুক্তি দেবে—মুক্তি দেবে যন্ত্রণা থেকে!'

আমি ঢকঢক করে পাত্রের অতি সুস্বাদু তরল অর্ধেকটা খেয়ে ফেললাম। মানুষ কখনও এই অপূর্ব স্বাদ পায়নি। এমনসময় দার্শনিকমশায় নড়েচড়ে জেগে উঠলেন। আমি চমকে উঠলাম। কাচের পাত্রটা পড়ে গেল হাত থেকে। তরলে আগুন ধরে গেল। ছড়িয়ে যেতে লাগল মেঝেতে। টের পেলাম, কর্নেলিয়াস বজ্রমুঠিতে আমার টুঁটি টিপে ধরেছেন। তিনি ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করে বললেন, 'হতভাগা! তুই আমার সারা জীবনের পরিশ্রম শেষ করে দিলি।'

দার্শনিকমশায় বুঝতেই পারেননি, আমি তাঁর ওষুধের খানিকটা খেয়ে ফেলেছি। তাঁর ধারণা, আমি কৌতূহলের বশে পাত্রটা তুলে নিয়েছিলাম, তারপর তরলের উজ্জ্বলতা আর তীব্র আলোর ঝিলিকে ভয় পেয়ে হাত থেকে পাত্রটা ফেলে দিয়েছি। আমি তাঁর ভ্রান্ত ধারণায় নীরব সম্মতি দিয়েছি। তাঁর ভুল আর ভাঙাইনি।

ওষুধের আগুন নিভে গিয়েছিল—সুগন্ধও মিলিয়ে গেছে। দার্শনিকরা চরম সঙ্কটে যেরকম শান্ত হয়ে পড়েন, তিনিও সেরকম শান্ত হলেন। আমাকে বিশ্রাম নিতে বিদায় দিলেন।

সেই স্মরণীয় রাতের বাকি কয়েকটি ঘণ্টা মহিমময় স্বর্গীয় ঘুমে কেটে গেল। আমার আত্মা যেন স্বর্গে স্নান সেরে উঠল। সেই ঘুমের বর্ণনা দেওয়া আমরা পক্ষে সম্ভব নয়। সামান্য শব্দ বা বাক্য আমার তৃপ্তিকে বর্ণনা করার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। যখন জেগে উঠলাম, তখনও বুকের মধ্যে যে-আনন্দ অনুভব করলাম, তাও বলার নয়। বাতাসে পা ফেলে আমি চলতে লাগলাম—মন উড়ে গেল স্বর্গে। পৃথিবীটাই যেন স্বর্গ হয়ে গেছে, আর পৃথিবীতে আমার উত্তরাধিকার যেন বিহ্বল এক আনন্দ।

'প্রেম-নিরাময় বোধহয় একেই বলে,' আমি ভাবলাম, 'আজই বার্থার সঙ্গে দেখা করব। ও দেখুক, ওর এই প্রেমিক কীরকম ঠান্ডা ও বেপরোয়া হয়ে গেছে। এত সুখী যে, তার মনে কোনও ঘৃণাও নেই। অথচ ওর ব্যাপারে কী দারুণ নিস্পৃহ!'

সময় এগিয়ে চলল নাচতে-নাচতে। দার্শনিকমশায় নিশ্চিত যে, তিনি একবার সফল হয়েছেন, এবং তাঁর বিশ্বাস, তিনি আবারও সফল হবেন। তাই বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে আবার একই ওষুধ তৈরির উদ্যোগ শুরু করলেন। বইপত্র ও ভেষজ উপাদান নিয়ে মেতে উঠলেন। আর আমিও একটা দিন ছুটি পেলাম। খুব যত্ন নিয়ে পোশাক পরলাম। একটা পুরোনো অথচ ঝকঝকে ঢাল আয়না হিসেবে ব্যবহার করে তাতে মুখ দেখলাম। মনে হল, আমার সুন্দর চেহারা যেন আরও দারুণ সুন্দর হয়েছে। আমাকে ঘিরে স্বর্গ ও মর্ত্যের সৌন্দর্য, মন খুশিতে টগবগ—তাড়াতাড়ি শহরের এলাকা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপর পা ঘোরালাম সেই প্রাসাদের দিকে—প্রেমরোগ থেকে সেরে উঠেছি, তাই তার উঁচু মিনারগুলোর দিকে হালকা মনে তাকাতে পারলাম। তরুছায়াঢাকা পথ ধরে এগোনোর সময়ে আমার বার্থা আমাকে বহুদূর থেকে দেখতে

পেল। জানি না, হঠাৎ কোন ঝোঁকে ওর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল, কারণ, আমাকে দেখামাত্রই চঞ্চল হরিণশিশুর মতো মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ও লাফিয়ে নামতে লাগল, দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল আমারই দিকে। কিন্তু আরও একজন আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে। বার্থার আশ্রয়দাত্রী, ওর স্বেচ্ছাচারী শাসক, উঁচুবংশের সেই কুৎসিত বুড়িটাও আমাকে দেখতে পেয়েছে। জবুথবু পায়ে প্রাসাদ-চত্বর পেরিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে এগিয়ে আসছে। তারই মতো কুৎসিত এক বালক-ভৃত্য তার লুটিয়ে পড়া পোশাক তুলে ধরে তাকে বাতাস করতে-করতে অনুসরণ করেছে। চটপটে পায়ে এগোতে-এগোতে আমার সুন্দরীকে বুড়ি এই বলে থামিয়ে দিল ঃ 'আরে, কী ব্যাপার, সাহসী মেয়ে? এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছো কোথায়? এক্ষুনি খাঁচায় ফিরে যাও—বাজপাখিরা ঘোরাফেরা করছে!'

বার্থা সজোরে হাত মুঠো করল—ওর দৃষ্টি তখনও আমার দিকে। দ্বন্দ্বটা আমি দেখতে পেলাম। বার্থার নরম-হয়ে-আসা মনের আবেগের দমক রুখে দিয়েছে বলে হতচ্ছাড়া বুড়িটাকে অসহ্য মনে হল। এ যাবৎ মহিলার পদমর্যাদার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁকে আমি এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু এখন ওসব তুচ্ছ ব্যাপারকে আমল দিলাম না। আমি মুক্তি পেয়েছি প্রেমরোগ থেকে, এখন আমি যাবতীয় মানবিক আতঙ্কের ঊর্ধ্বে। আমি তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে গেলাম, পৌঁছে গেলাম প্রাসাদ-চত্বরে। বার্থাকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! চোখে আগুনের ঝিলিক, ধৈর্যহীন রাগে গাল রক্তিম। আজ ওকে হাজার গুণ বেশি মধুর ও আকর্ষণীয় লাগছে। আমি ওকে আর ভালোবাসি না—না! বরং আমি ওকে শ্রদ্ধা করি, পুজো করি, উপাসনা করি ওকে!

সেদিন সকালে ওকে যথেষ্ট নির্যাতন করা হয়েছে, যাতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সত্বর বিয়ে করতে ও রাজি হয়। এতদিন তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে ওকে নিন্দে করা হয়েছে—লাঞ্ছনা ও অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হবে বলে ভয়ও দেখানো হয়েছে। ওর উদ্ধত মন এই হুমকিতে প্রতিবাদ করে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু যখনই ওর মনে পড়েছে যে, কী ঘৃণার বোঝা ও আমার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে, কীভাবে ও সম্ভবত ওর একমাত্র বন্ধুকে হারিয়েছে, তখনই অনুশোচনায় রাগে ও শুধু চোখের জল ফেলেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি গিয়ে হাজির হয়েছি।

'ওঃ, উইন্‌জি!' ও আবেগে চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে তোমার মায়ের কুটিরে নিয়ে চলো। এই অভিজাত ঘৃণ্য বিলাস আর চরম দুর্দশা থেকে আমাকে যত শিগগির পারো মুক্তি দাও—আমাকে নিয়ে চলো যেখানে দারিদ্র্য আছে, সুখ আছে।'

আবেগে আত্মহারা হয়ে আমি ওকে জাপটে ধরলাম দু-হাতে। রাগে বুড়ির কথা আটকে গেল। যখন সে কুরুচিকর ভাষায় নিন্দামন্দ শুরু করল, ততক্ষণে আমরা আমার ঘরের পথ ধরে বহুদূর এগিয়ে গেছি। সোনার খাঁচা থেকে প্রকৃতির বুকে মুক্তি পাওয়া সুন্দরী বন্দিনীকে মা আদর ও আনন্দের সঙ্গে বরণ করলেন। বাবা ওকে খুব ভালোবাসতেন। তিনিও সাদরে স্বাগত জানালেন ওকে। সেদিনটা ছিল শুধুই আনন্দের

দিন। সেদিন আমাকে খুশির তুঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে অপরসায়নবিদের স্বর্গীয় সুধার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

ঘটনাবহুল সেই দিনটার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বার্থার স্বামী হলাম। কর্নেলিয়াসের কাছে গবেষক-ছাত্রের চাকরি ছেড়ে দিলাম, তবে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব রইল। নিজের অজান্তে তিনি আমাকে স্বর্গীয় সুধার অপরূপ স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। আমার প্রেমরোগ সারিয়ে তোলার বদলে (বড় দুঃখের সে-নিরাময়! যেসব অশুভ ঘটনা স্মৃতির কাছে আশীর্বাদ, সেগুলো মুছে ফেলার কী নিঃসঙ্গ আনন্দহীন চিকিৎসা।) আমাকে সাহস আর সঙ্কল্পে উদ্দীপিত করেছেন। আজ তাঁর জন্যেই আমি বার্থার মতো অমূল্য সম্পদকে জয় করতে পেরেছি।

প্রায়ই আমার মনে পড়ে যায় মোহময় উল্লাসের সেই মুহূর্তগুলো, আর আমি অবাক হয়ে যাই। কর্নেলিয়াসের পানীয় যে-কাজের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল সে-কাজ করতে পারেনি। কিন্তু তার গুণাগুণ এমন শক্তিশালী ও স্বর্গীয় যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওষুধের প্রভাব ধীরে-ধীরে ক্ষয়ে এসেছে, তবে তার দীর্ঘ রেশ রয়ে গেছে এখনও। সেই রেশ উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে আমার জীবন। আমার হালকা মন আর অনভ্যস্ত আনন্দের প্রকাশ দেখে বার্থা প্রায়ই অবাক হয়ে যেত। কারণ, আগে আমার স্বভাব ছিল অনেক গম্ভীর, এমনকী কখনও-কখনও বিষণ্ণ। আমার হাসিখুশি মেজাজ দেখে ও আমাকে আরও বেশি করে ভালোবাসতে লাগল। আর আমাদের দিনগুলো যেন উড়ে চলল খুশিতে।

পাঁচ বছর পরে হঠাৎই কর্নেলিয়াসের মৃত্যুশয্যায় আমার ডাক পড়ল। আমাকে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি, একান্ত অনুরোধ করেছেন, আমি যেন তক্ষুনি হাজির হই। গিয়ে দেখি তিনি শয্যাশায়ী, মৃত্যুতেও যেন ক্লান্ত। তাঁর শরীরে জীবনের যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তার সবটুকুই জমা হয়েছে তীক্ষ্ণ চোখে। তাঁর স্থির দৃষ্টি গোলাপি তরলপূর্ণ একটি কাচপাত্রে নিবদ্ধ।

'ওই দ্যাখো!' চাপা ভাঙা স্বরে তিনি বললেন, 'মানুষের আকাঙ্ক্ষার অহঙ্কার। এই দ্বিতীয়বার আমার আশা জয়মুকুট পরতে চলেছিল, আর দ্বিতীয়বারও তা ধ্বংস হয়ে গেল। তাকিয়ে দ্যাখো ওই তরলের দিকে—মনে পড়ে, পাঁচ বছর আগে এখনকার মতো এই একই ওষুধ আমি তৈরি করেছিলাম, তখনও যেই আমি তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে ওই অনন্ত-পরমায়ু সুধার স্বাদ নিতে চেয়েছি অমনি তুমি সেটা সরিয়ে নিয়েছ আমার কাছ থেকে! আর, এবার, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

কথা বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। মাথা আবার ঢলে পড়ল বালিশে। আমি না বলে পারলাম না, 'কিন্তু গুরুদেব, প্রেম-নিরাময়ের ওষুধ কী করে আপনাকে জীবন ফিরিয়ে দেবে?'

একটা আবছা হাসি ঝলসে উঠল তাঁর মুখে। আমি কান পেতে একাগ্রভাবে তাঁর অস্পষ্ট জড়ানো উত্তর শুনতে চেষ্টা করলাম।

pathagar.net

'শুধু প্রেম নয়, সবকিছু নিরাময়ের ওষুধ—অনন্ত-পরমায়ুর সুধা। ওঃ! যদি এখন আমি ওই সুধা পান করি, তা হলে আমি অমর হয়ে যাব!'

তাঁর কথার মাঝেই একটা সোনালি ঝিলিক ঠিকরে বেরোল সেই তরল থেকে। স্মরণীয় এক সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। ওই দুর্বল শরীর নিয়ে খানিকটা উঠে পড়লেন তিনি—তাঁর শরীরে যেন আশ্চর্যভাবে শক্তি ঢুকে পড়েছে—তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন—এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ চমকে দিল আমাকে—পাত্রের তরল থেকে ছিটকে বেরোল আগুনের শিখা, আর কাচের পাত্রটি রেণু-রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ফিরে তাকালাম দার্শনিকমশায়ের দিকে। আবার নেতিয়ে পড়েছেন তিনি—চোখ নিষ্প্রাণ—হাত-পা শক্ত—মারা গেছেন।

কিন্তু আমি বেঁচে রইলাম, চিরকাল বেঁচে থাকাই আমার নিয়তি! হতভাগ্য অপরসায়নবিদ তো সেই কথাই বলেছেন। আমি কিছুদিন তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম। মনে পড়ল, চুরি করে সেই সুধায় চুমুক দেওয়ার পর কী দারুণ নেশায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিলাম। শরীরে, মনে, পরিবর্তন অনুভব করেছিলাম। শরীর সীমাবদ্ধ অথচ নমনীয়, আর মন ভেসে বেড়ানো হালকা। আয়নায় খুঁটিয়ে দেখলাম নিজেকে। এই পাঁচ বছর সময়ের কোনও ছাপই নজরে পড়ল না সেখানে। সেই সুস্বাদু পানীয়ের উজ্জ্বল রং ও মহান সুগন্ধের কথা মনে পড়ল আমার—অনন্ত-পরমায়ু সুধার উপযুক্তই বটে! আমি তা হলে এখন অমর!

কয়েকদিন পরে নিজের সরল বিশ্বাসে আমার হাসি পেল। পুরোনো সেই প্রবাদটা মনে পড়ল ঃ 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।' আমার ও আমার মৃত গুরুর ক্ষেত্রে এই প্রবাদটা খুব সত্যি। আমি তাঁকে মানুষ হিসেবে ভালোবাসতাম—মহাজ্ঞানী বলে শ্রদ্ধা করতাম—কিন্তু তিনি অশুভ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বলে যে-ধারণা ছিল, তাতে আমার হাসি পেত। আর সাধারণ মানুষ যে কুসংস্কারের বশে তাঁকে ভয় পেত তারও কোনও মানে হয় না। তিনি ছিলেন জ্ঞানী দার্শনিক। রক্ত-মাংসের পোশাক পরা আত্মা ছাড়া আর কোনও প্রেতাত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। তাঁর বিজ্ঞান ছিল নেহাতই পার্থিব। খুব শিগগিরই আমি নিজেকে বোঝালাম, পার্থিব বিজ্ঞান কখনও প্রকৃতির নিয়মকে জয় করতে পারে না। সুতরাং, শরীরের খাঁচায় আত্মাকে চিরকাল বন্দি করে রাখা অসম্ভব। কর্নেলিয়াস মন চনমনে করার এক পানীয় তৈরি করেছিলেন—সুরার চেয়েও শক্তিশালী মাদক—সব ফলের চেয়ে মিষ্টি, সুগন্ধেও সবার সেরা। হয়তো তার মধ্যে ওষুধের দ্রব্যগুণ ছিল, যার জন্যে মন খুশি-খুশি হয়ে ওঠে, হাত-পা তেজীয়ান হয়। কিন্তু তার প্রভাব ধীরে-ধীরে ক্ষয়ে আসবে। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে। আমি ভাগ্যবান যে, স্বাস্থ্য ও আনন্দের পানীয় পান করতে পেরেছি। হয়তো আমার গুরুর কৃপায় দীর্ঘায়ুও হয়েছি। কিন্তু আমার সৌভাগ্যের সেখানেই ইতি : দীর্ঘায়ু হওয়া আর অমর হওয়ার মধ্যে অনেক তফাত।

বহু বছর ধরে এই বিশ্বাস নিয়েই রইলাম। কখনও-কখনও একটা চিন্তা উঁকি

pathagar.net

দিয়ে যেত মনে ঃ অপরসায়নবিদকে সত্যিই কি কেউ প্রতারণা করেছে? কিন্তু আমার স্বাভাবিক বিশ্বাস ছিল যে, আদমের অন্যান্য সন্তানের মতো আমিও নির্ধারিত সময়ে একই ভবিতব্যে পৌঁছব—একটু দেরিতে হলেও, অন্তত স্বাভাবিক বয়েসে। অথচ এটাও স্পষ্ট, আমার চেহারায় এক আশ্চর্য তারুণ্য রয়ে গেছে। আমার ঘন-ঘন আয়না দেখার দম্ভ দেখে সকলে ঠাট্টা করে, অথচ আমি আয়না দেখি অকারণে—আমার ভুরুতে কোনও ভাঁজ পড়েনি—আমার গাল—আমার চোখ—আমার সারা শরীর সেই বিশ বছর বয়েসের চেহারার মতোই অম্লান।

আমি দুশ্চিন্তায় পড়লাম। বার্থার ফিকে হয়ে আসা সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে দেখি—আমাকে যেন ওর ছেলের মতো দেখায়। ধীরে-ধীরে পাড়াপড়শিরা একই ধরনের মন্তব্য করতে লাগল। শেষপর্যন্ত আমার নাম হয়ে গেল মন্ত্রসিদ্ধ গবেষক। বার্থা নিজেও অস্বস্তিতে পড়তে শুরু করল। ও ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল, খিটখিটে হয়ে উঠল। অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল। আমাদের ছেলেমেয়ে হয়নি, আমরাই আমাদের সব। যদিও বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে ওর হাসিখুশি স্বভাব কিছুটা বদমেজাজি হয়ে উঠেছে, আর রূপেও বিশ্রীরকম ভাটার টান ধরেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কাছে ও আরাধ্য প্রেয়সী, পবিত্র ভালোবাসা দিয়ে জয় করা আকাঙ্ক্ষিত সহধর্মিণী।

অবশেষে পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। বার্থা পঞ্চাশে পৌঁছল—আর আমি সেই কুড়িতেই স্থির। নিতান্ত লজ্জার বশে বয়স্ক লোকেদের হাবভাব কিছুটা রপ্ত করার চেষ্টা করেছি। নাচের আসরে ফূর্তিবাজ তরুণদের সঙ্গে আমি আর মিশতাম না। কিন্তু পা-কে দমিয়ে রাখলেও আমার মন ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে থাকত। আবার গাঁয়ের বয়স্ক জ্ঞানীদের দলেও আমি ছিলাম নিতান্ত বেমানান। কিন্তু যে-সময়ের কথা বলছি, তার আগে সবকিছুই বদলে গেছিল—সকলেই আমাদের একবাক্যে এড়িয়ে চলত। লোকের ধারণা ছিল আমরা—অন্তত আমি—আমার প্রাক্তন গুরুর বন্ধু বলে পরিচিত এমন কয়েকজনের সঙ্গে নাকি অন্যায় সম্পর্ক রেখে চলেছি। বেচারি বার্থাকে সকলে করুণা করত, কিন্তু এড়িয়ে চলত সবাই। আর আমাকে সকলে দেখত ভয়ের চোখে, ঘৃণার চোখে।

কী যে করি এখন! শীতের আগুনের পাশে দুজনে বসে আছি—দারিদ্র্যের চাপ বেশ টের পাচ্ছি, কারণ, আমাদের খেতের শস্য কেউই কেনে না। প্রায় বিশ মাইল পথ পেরিয়ে আমি চলে যাই নতুন কোনও জায়গায়, যেখানে আমাকে কেউ চেনে না—সেখানে আমাদের খেতের শস্য বিক্রি করি। এ-কথা সত্যি যে, দুর্দিনের কথা ভেবে কিছু সঞ্চয় আমরা করেছিলাম—সেই দুর্দিন এখন এসে গেছে।

আগুনের পাশে নিঃসঙ্গ দুজনে বসে আছি—বৃদ্ধ-প্রাণ এক যুবক আর তার প্রাচীনা স্ত্রী। আসল ব্যাপারটা জানার জন্যে বার্থা আবার জেদ ধরল। আমার সম্পর্কে যা-যা শুনেছে সবই ওর মনে আছে। তার সঙ্গে ও জুড়ে নিয়েছে নিজের অভিমত।

pathagar.net

জাদুর প্রভাব কাটানোর জন্যে ও আমাকে মিনতি করতে লাগল। বিশদ করে বোঝাতে লাগল, আমার বাদামি চুলের গোছার চেয়ে পাকা চুল কত সুন্দর। বয়েসের শ্রদ্ধা ও সম্মান বিস্তারিতভাবে বোঝাল আমাকে—নেহাতই শিশুদের প্রতি যে-তাচ্ছিল্য দেখানো হয়, তার চেয়ে এটা কত ভালো। আমার কি ধারণা, যৌবনের জঘন্য সব সহজাত গুণ আর চেহারার সৌন্দর্য অসম্মান, ঘৃণা ও অবজ্ঞাকে ছাপিয়ে যায়? না, শেষ পর্যন্ত আমাকে মায়াবী বলে পুড়িয়ে মারা হবে, আর বার্থা—যাকে আমি আমার সৌভাগ্যের এক কণাও দিইনি—তাকে হয়তো আমার কুকর্মের সহযোগী বলে পাথর ছুড়ে খতম করে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত ও আমাকে বুঝিয়ে দিল, আমার গোপন কথা যদি ওকে আমি না বলি, আমি যে-সৌভাগ্য ভোগ করছি তাতে যদি ওকেও ভাগ বসাতে না দিই, তা হলে ও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তারপরই ও কাঁদতে শুরু করে দিল।

সুতরাং, এইরকম অবস্থায় আমি ভাবলাম, সত্যি কথাটা বোধহয় বলে দেওয়াই ভালো। যতটা নরমভাবে পারি সব ভাঙলাম ওর কাছে। অমর হওয়ার কথা চেপে গিয়ে বললাম দীর্ঘ জীবনের কথা। আমার অনুমানের সঙ্গে এই ধারণাটা দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। কথা শেষ করে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বার্থা, এবার বলো, তুমি কি তোমার যৌবনের প্রেমিককে ছেড়ে চলে যাবে? তুমি যাবে না, আমি জানি। আমার দুর্ভাগ্য আর কর্নেলিয়াসের অভিশপ্ত বিদ্যের জন্যে তুমি শুধু শাস্তি ভোগ করবে, এ বড় কষ্টের গো। আমি বরং তোমাকে ছেড়ে চলে যাই—তোমার অর্থ-সম্পদ যথেষ্ট রয়েছে। আর আমি চলে গেলে বন্ধুবান্ধবরা তোমার কাছে আবার ফিরে আসবে। আমি চলে যাব। আমার চেহারায় যৌবন রয়েছে, আর শক্তি যা আছে তাতে অজানা-অচেনা জায়গায় গিয়ে আমার রুটিরুজি জোটাতে পারব—সেখানে কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না, কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। যৌবনে তোমাকে আমি ভালোবেসেছি। ভগবান সাক্ষী, এই বয়েসে তোমাকে আমি ছেড়ে যেতাম না—কিন্তু তোমাকে নিরাপদে সুখে রাখার জন্যেই এটা দরকার।'

টুপিটা তুলে নিয়ে আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। পরমুহূর্তেই বার্থা জড়িয়ে ধরল আমাকে, ওর ঠোঁট চেপে ধরল আমার ঠোঁটে। বলল, 'না সোনা, আমার উইন্‌জি, তুমি একা যাবে না—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। এ-জায়গা ছেড়ে আমরা চলে যাব। তুমি ঠিকই বলেছ—অচেনা লোকদের মাঝে আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারব, কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না। আমি এখনও ততটা বুড়িয়ে যাইনি যে, তুমি লজ্জা পাবে, উইন্‌জি। আমার মনে হয়, তোমার চেহারার আকর্ষণ শিগগিরই ক্ষয়ে যাবে, আর ভগবানের আশীর্বাদে তোমাকে আরও বয়স্ক দেখাবে—সেটাই তো ভালো। তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

ওর নিষ্পাপ মনের আলিঙ্গনে সানন্দে সাড়া দিলাম : 'না বার্থা, যাব না। শুধু তোমার ভালোর জন্যেই—নইলে এরকম কথা কখনও মনেও আনিনি। আমি

তোমার প্রকৃত বিশ্বস্ত স্বামী হয়েই থাকব, তোমার পাশে থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কর্তব্য করে যাব।'

পরদিন দেশান্তরী হওয়ার জন্যে গোপনে তৈরি হলাম আমরা। অর্থ-সম্পদের অনেক কিছুই আমাদের ছাড়তে হল—কোনও উপায় ছিল না। বার্থা যতদিন বাঁচবে ততদিন চলার মতো টাকা সঙ্গে নিলাম। তারপর কাউকে বিদায় না জানিয়ে দেশ ছেড়ে পশ্চিম ফ্রান্সের এক পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে আশ্রয় নিতে রওনা হলাম।

দেশ-গাঁ ছেড়ে, ছোটবেলার বন্ধুবান্ধব ছেড়ে বেচারি বার্থাকে নতুন ভাষা নতুন নিয়মের নতুন দেশে নিয়ে যাওয়াটা বড় নিষ্ঠুর কাজ। আমার অদৃষ্টের আশ্চর্য রহস্যের জন্যে দেশান্তরী হওয়ার এই ঘটনা আমার মনে কোনওরকম দাগ কাটল না। কিন্তু বার্থার কষ্ট আমি গভীরভাবে অনুভব করলাম। আর নানা রকমের ছোট-ছোট হাস্যকর ঘটনার মধ্যে ও ওর দুর্ভাগ্যের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে দেখে খুশিও হলাম। পরচর্চা করার মানুষজনের কাছ থেকে দূরে এসে ও আমাদের বয়েসের আপাত ফারাকটা কমানোর জন্যে হাজার রকম মেয়েলি চেষ্টায় মন দিল—রুজ, ছেলেমানুষী পোশাক, আর আচরণে কচি খুকির মতো ভান করা। আমি রাগ করতে পারলাম না। আমি নিজেও কি একটা মুখোশ পরে নেই? তা হলে ওর মুখোশটা তেমন ওতরায়নি বলে ওর সঙ্গে ঝগড়া করা কেন? এই ঢঙ্গী, নিষ্প্রাণ হাসিময়, ঈর্ষাকাতর বুড়িটাই আমার সেই বার্থা—কৃষ্ণকেশী, ঠোঁটে মনোহর স্বর্গীয় হাসি, মৃগশিশুর মতো চপল পদক্ষেপ—যাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম, যাকে জয় করে আত্মহারা হয়েছিলাম আমি, একি সেই বার্থা! যখনই এ-কথা মনে পড়ে তখনই ভীষণ কষ্ট হয়। ওর পাকা চুল আর ভাঁজ পড়া গালকে আমার শ্রদ্ধা করা উচিত ছিল। কিন্তু এমনই অবস্থা! জানি, এসবই আমার কর্মফল। কিন্তু তাই বলে এই মানবিক দুর্বলতার জন্যে আমার কম দুঃখ হত না।

ওর ঈর্ষার বিরাম ছিল না। আমার বাইরের চেহারাটা যেমনই থাক, ভেতরে-ভেতরে আমারও যে বয়েস বাড়ছে সেটা খুঁজে বের করাই ছিল ওর প্রধান কাজ। আমি বিশ্বাস করি, বেচারি বার্থা সত্যিই মনেপ্রাণে আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু ভালোবাসা দেখানোর জন্যে এরকম তিতিবিরক্ত করা ঢং আমি আগে কোনও মেয়ের দেখিনি। ও আমার মুখে বলিরেখা খুঁজে বের করে, আমার চলাফেরায় বার্দ্ধক্য দেখতে পায়, অথচ আমি তারুণ্যের তেজে দাপিয়ে বেড়াই, বিশজন যুবকের মধ্যে আমিই সবচেয়ে তরুণ দেখতে। অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সাহস কখনও আমার হয়নি। একবার ওর মনে হয়েছিল গাঁয়ের এক নাগরী কটাক্ষ হেনেছে আমার দিকে, তো সঙ্গে-সঙ্গে একটা সাদা ধবধবে পরচুলা এনে দিয়েছে আমাকে। পরিচিত সবাইকে ও সবসময় বলে বেড়াত যে, আমাকে দেখতে কমবয়েসি মনে হলেও আসলে আমার কাঠামোর ভেতরে-ভেতরে ক্ষয় ধরে গেছে। এ ছাড়া ও জোর দিয়ে বলত, আমার আপাত স্বাস্থ্যই হল সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ। আমার তারুণ্য হল একটা রোগ, আচমকা

ভয়ঙ্কর মৃত্যু না হলেও হয়তো এমন হবে যে, একদিন ভোরে উঠে দেখব আমার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, বয়েসের নানা চিহ্নের ভারে শরীর নুয়ে পড়েছে। অন্তত এরকম একটা পরিণতির জন্যে আমার তৈরি থাকা উচিত। আমি ওকে বাধা দিতাম না—বরং প্রায়ই ওর এই অনুমানের খেলায় যোগ দিতাম। আমার অবস্থা নিয়ে এমনিতেই আমার দুশ্চিন্তা ছিল অবিরাম, আর তার সঙ্গে সুর মেলাত ওর নানান সাবধানবাণী। এ-বিষয়ে ওর উপস্থিতবুদ্ধি আর ভাবপ্রবণ কল্পনা যা-যা বলত কষ্ট হলেও আমি সেসব একান্ত আগ্রহে শুনতাম।

এসব তুচ্ছ ঘটনার কথা টেনে এনে আর লাভ কী? আমরা বহু বছর ধরে বেঁচে রইলাম। বার্থা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। মা যেমন শিশুর সেবা করে সেভাবেই ওর সেবা করলাম আমি। ও খিটখিটে হয়ে পড়ল, বারবার বলতে লাগল একই কথা : ওর পরে আরও কত বছর বাঁচব আমি। আমার বরাবরের এটাই সান্ত্বনা যে, ওর প্রতি আমার কর্তব্যে কোনও ফাঁকি আমি দিইনি। যৌবনে ও আমার ছিল, বার্ধক্যেও তাই। অবশেষে, যখন ওর কবরে ঘাসের চাপড়া বিছিয়ে দিচ্ছিলাম, তখন চোখের জল ফেলতে-ফেলতে অনুভব করলাম, মানবতার সঙ্গে যে সত্যিকারের বন্ধনটুকু আমার ছিল তা আজ হারিয়ে গেল।

তারপর থেকে আমার দুশ্চিন্তা আর দুর্দশার শেষ নেই। সুখের মুহূর্তগুলোও সংখ্যায় কত নগণ্য আর শূন্য! আমার ইতিকথার এখানেই আমি থামব—আর এগোব না। আমার অবস্থা হল, ঝোড়ো সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হাল কিংবা কম্পাসহীন কোনও নাবিকের মতো। অথবা বিস্তীর্ণ ঊষর প্রান্তরে পথ হারানো কোনও পথিক—যার সামনে কোনও পথের নিশানা নেই। না, এদের চেয়েও বেশি দিগভ্রান্ত, বেশি আশাহীন আমি। কারণ, এগিয়ে আসা কোনও জাহাজ, কিংবা দূরের কোনও কুটিরের আলো ওদের বাঁচাতে পারে। কিন্তু আমার সামনে একমাত্র আশার আলো হল মৃত্যু।

মরণ! দুর্বল মানবের রহস্যময় অশুভ-দর্শন বন্ধু! মরণশীল জগতের মধ্যে একমাত্র আমাকেই তুমি কেন ছুড়ে ফেলে দিলে তোমার আশ্রয়-কোল থেকে? ওঃ, কবরে কী শান্তি! লোহায় ঘেরা সমাধি-গৃহে কী গভীর নিস্তব্ধতা! আমার মগজে এই চিন্তার আর কোনও জায়গা নেই। আমার হৃদয়ে নতুন-নতুন বিষণ্ণতা ছাড়া আর কোনও আবেগের ধুকপুকুনি নেই।

আমি কি অমর? ফিরে আসি সেই প্রথম প্রশ্নে। প্রথমত, এটাই কি বেশি বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, অপরসায়নবিদের ওই পানীয় অনন্ত-পরমায়ুর নয়, বরং দীর্ঘজীবনের? এটাই আমার একমাত্র আশা। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে, আমি তাঁর তৈরি ওই পানীয়ের মাত্র অর্ধেকটা খেয়েছিলাম। পুরোপুরি কার্যকরী হওয়ার জন্যে পানীয়ের সবটুকুই কি খাওয়া দরকার ছিল না? অনন্ত-পরমায়ু সুধার অর্ধেকটা খাওয়ার অর্থ অর্ধেক অমর হওয়া—আমার 'চিরজীবন' তা হলে অসম্পূর্ণ, মিথ্যে।

কিন্তু তা হলে অর্ধেক-অনন্ত-পরমায়ুর বছরের হিসেবই বা রাখবে কে? প্রায়ই

ভাবতে চেষ্টা করি, কোন নিয়মে অনন্ত কালকে ভাগ করা যেতে পারে। মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমার বোধহয় বয়েস বাড়ছে। একটা পাকা চুল খুঁজে পেয়েছি। নির্বোধ আমি! এতে কি দুঃখ হয় আমার? হ্যাঁ, প্রায়ই বয়েসের আতঙ্ক, মৃত্যুর আতঙ্ক হিমেল হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে আমার বুকের ভেতরে। জীবনকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু যতই বেঁচে থাকি, মৃত্যুভয় ততই বেড়ে যায়। এইভাবে ধ্বংস হওয়ার জন্যেই যার জন্ম। অথচ প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে সে ক্রমাগত লড়াই করে—আমারই মতো।

চিন্তার এই ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিলে মনে হয় আমার মৃত্যু বোধহয় অনিবার্য ঃ অপরসায়নবিদের ওই ওষুধ নিশ্চয়ই আগুন, তরোয়াল, কিংবা দম আটকানো জলধিকে জয় করতে পারবে না। বহু শান্ত হ্রদের গভীর নীলের পানে অপলকে চেয়ে থেকেছি আমি, শক্তিশালী নদীর বিক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাস দেখেছি, আর উচ্চারণ করেছি ঃ ওই জলে শান্তি আছে। অথচ তা সত্ত্বেও আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি—আরও একটা দিন বাঁচার জন্যে। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, ওপারের জগতে যাওয়ার জন্যে আত্মহত্যাই যার একমাত্র পথ তার ক্ষেত্রে আত্মহত্যা আদৌ পাপ কি না। সব চেষ্টাই আমি করেছি, শুধু সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিইনি বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিনি। কারণ, সতীর্থ মরণশীল মানুষের কাছে আমি ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছি, আর ভয়ে কুঁকড়ে দূরে সরে গেছি। না, সতীর্থ তো নয় ওরা! ওরা আমার কেউ নয়। আমার শরীরের কাঠামোয় জীবনের অনির্বাণ শক্তি, আর ওদের অস্তিত্ব ক্ষণজীবী। অতএব আমরা দুই মেরুর বাসিন্দা। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে নীচ কিংবা সবচেয়ে শক্তিশালী তার বিরুদ্ধেও হাত তুলতে পারি না আমি।

এইভাবেই বহু বছর ধরে আমি বেঁচে আছি—একা, নিজের ওপরে ক্লান্ত—মৃত্যু কামনা করেছি, তবু মরিনি—এক মরণশীল অমর। আমার মনে উচ্চাশা বা লালসার কোনও জায়গা নেই। আর যে-তীব্র ভালোবাসা আমার হৃদয়ে আঁচড় কাটে, তা ফিরিয়ে দেওয়া কারও সাধ্য নয়—এমন সমকক্ষ কেউ নেই যার জন্যে একে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া যায়। এ-ভালোবাসা শুধুই আমার মনে ঝড় তোলে।

এসবের ইতি টানার একটা মতলব আজই মাথায় এসেছে। না, আত্মহনন নয়, আর কাউকে কেইন*ও হতে হবে না। এমন এক অভিযানে আমি রওনা হব যার ধকল কোনও মরণশীল শরীর সইতে পারে না—আমার মতো যৌবন আর শক্তি থাকলেও না। এইভাবেই আমার অমরত্বের পরীক্ষা হোক। হয় আমি চিরবিশ্রাম পাব, নয়তো ফিরে আসব। মানবজাতির এক আশ্চর্য নমুনা হব আমি, এক মহান নজির।

চলে যাওয়ার আগে এক হীন অহঙ্কার আমাকে দিয়ে এই পৃষ্ঠাগুলো লিখিয়ে নিয়েছে। আমি মরব না, আর কোনও নামও রেখে যেতে চাই না আমি। কালান্তক

---

* **কেইন** ঃ বাইবেলে বর্ণিত চরিত্র আদম ও হওয়ার পুত্র কেইন। সে তার ভাই অ্যাবেলকে হত্যা করেছিল।

ওই পানীয় গ্রহণ করার পর তিন শতাব্দী পার হয়ে গেছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ, দুর্দশা, ঝঞ্ঝা বিজড়িত দানবীয় বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করে, তুষারের শক্তির সঙ্গে তাদের দেশে লড়াই করে, একটি বছরও পেরোবে না—মুক্তির তেষ্টায় ছটফট করা একটি আত্মার বড় নাছোড়বান্দা এই খাঁচা, আমার শরীরকে, আমি বাতাস ও জলের বিধ্বংসী প্রাকৃতিক শক্তির হাতে সমপর্ণ করব। আর যদি বেঁচে যাই, তা হলে সবচেয়ে বিখ্যাত মানবপুত্রদের একজন হিসেবে আমার নাম চিরকাল লেখা থাকবে। আমার কর্তব্য সম্পন্ন হলে আমি আরও কঠিন ও নিশ্চিত পথ বেছে নেব। মলিন পৃথিবী ছেড়ে আরও আপন কোনও লোকে জীবনের অমর সত্তা চকিতে ভেসে যেতে চায়, অথচ কী নিষ্ঠুরভাবেই না আটকে রাখা হয়েছে তাকে! তাই আমার শরীরের প্রতিটি পরমাণু ছত্রখান ও নিশ্চিহ্ন করে তার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকা জীবনকে আমি চিরমুক্তি দেব।

➤ *মর্টাল ইম্‌মর্টাল*

নেকড়ে

সাকি

pathagar.net

'তোদের জঙ্গলে একটা বুনো জানোয়ার আছে,' গাড়ি করে স্টেশনে যাওয়ার পথে বলল চিত্রকর কানিংহ্যাম। এতটা পথ আসতে সে শুধু এই একটা মন্তব্যই করল। কিন্তু ভ্যান শীল অনর্গল কথা বলতে থাকায় তার সঙ্গীর নীরবতা তেমন একটা কানে বাজেনি।

'দু-একটা ছিটকে আসা খেঁকশিয়াল আর স্থায়ী বাসিন্দা কয়েকটা বেজি। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কোনও জন্তু নেই।' ভ্যান শীল বলল।

তার চিত্রকর বন্ধু কোনও জবাব দিল না।

'বুনো জানোয়ার বলতে তুই কী বলতে চাস?' পরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভ্যান শীল জানতে চাইল।

'কিছু না। আমার যত উদ্ভট কল্পনা। ওই তো—ট্রেন এসে গেছে,' কানিংহ্যাম বলল।

সেইদিন বিকেলে রোজকার অভ্যেসমতো ভ্যান শীল নিজেদের জঙ্গল এলাকায় উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ল। তার পড়ার ঘরে খড়ে-ঠাসা একটা সারসের মূর্তি আছে, এবং বহু বুনো ফুলের নামও ভ্যান শীল জানে; সুতরাং তার পিসি যে তাকে এক বিরাট প্রকৃতিবিদ বলে পরিচয় দেন তার সামান্য হলেও যুক্তি আছে। মোটের ওপর পায়ে হেঁটে বেড়াতে ভ্যান শীলের জুড়ি নেই। চলার পথে যা-কিছু চোখে পড়ত সেগুলো মনের খাতায় টুকে নেওয়া ছিল তার স্বভাব। এর কারণ বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা নয়, বরং পরে মজলিসে আলোচনার বিষয়বস্তু জোগানো।

আজকের এই বিকেলে ভ্যান শীলের যা নজরে পড়ল তা অন্যান্য দিনের সাধারণ অভিজ্ঞতার অনেক বাইরে। এক গভীর পুকুরের ওপরে ঝুলবারান্দার মতো এক মসৃণ পাথরের তাকে ওক গাছের ঝোপের ফাঁকে শুয়ে রয়েছে বছর ষোলোর একটা ছেলে। বিকেলের রোদে নিজের ভিজে বাদামি শরীরটা রাজকীয় বিলাসে শুকিয়ে নিচ্ছে। সদ্য স্নানের কারণে ওর ভিজে চুল দু-ভাগ হয়ে মাথার সঙ্গে লেপটে রয়েছে, আর হালকা বাদামি চোখ দুটো এত হালকা যে, চিতাবাঘের চোখের মতো দপদপ করে জ্বলছে—অলস অথচ তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ভ্যান শীলেরই দিকে। এ যেন এক অপ্রত্যাশিত অপচ্ছায়া! ভ্যান শীল আবিষ্কার করল, কথা বলার আগেই বিস্ময়করভাবে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে গভীর চিন্তায়। এই বুনো ছেলেটা এল কোত্থেকে? মাস-দুয়েক আগে ঘানিওয়ালার বউয়ের একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে; সকলের ধারণা ঘানির চাকার ধাক্কায় কোথাও ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকবে ছেলেটা। কিন্তু সেটা তো নিতান্তই একটা বাচ্চা ছিল; এরকম বড়সড় কিশোর নয়।

'এই খোকা, কী করছ ওখানে?' ভ্যান শীল জানতে চাইল।

'দেখে বুঝতে পারছ না রোদ পোয়াচ্ছি,' ছেলেটা জবাব দিল।

'থাকো কোথায়?'

'এখানে—এই জঙ্গলে।'

'জঙ্গলে কি কেউ থাকে নাকি?' বলল ভ্যান শীল।

'এ জঙ্গলটা দারুণ', বলল ছেলেটা, কণ্ঠস্বরে সামান্য উৎসাহের ছোঁয়া।

'কিন্তু রাতে ঘুমোও কোথায়?'

'রাতে তো আমি ঘুমোই না; তখনই তো খুব কাজ পড়ে।'

একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ভ্যান শীলের মনে ক্রমে জায়গা করে নিতে লাগল। সে বেশ বুঝল, একটা রহস্যের সমাধানকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সেটা কৌশলে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

'তুমি কী খাও?' সে জানতে চাইল।

'মাংস—কাঁচা মাংস,' ছেলেটা খুব ধীরে-ধীরে শব্দগুলো উচ্চারণ করল, যেন প্রতিটি শব্দের স্বাদ জিভে পরখ করে দেখল।

'মাংস! কীসের মাংস?'

'জানতে যখন চাইছ, খরগোশ, বুনো মুরগি, হাঁস, সময়কালে ভেড়ার ছানা, আর পেলে পরে মানুষের এক-আধটা বাচ্চা-কাচ্চা; আসলে রাত্তিরে ওদের বাড়িতে বন্ধ করে রাখে কিনা, আর সেই সময়টাতেই তো আমি শিকারে বেরোই। শেষ মানুষের বাচ্চা চেখে দেখেছি প্রায় মাস-দুয়েকের ওপর হয়ে গেল।'

শেষ মন্তব্যের তামাশাটুকু গায়ে না মেখে ভ্যান শীল আলোচনাকে শিকারের প্রসঙ্গে নিয়ে আসতে চাইল।

'তুমি খরগোশ ধরে খাও বলছ—কিন্তু এ-কথা কে বিশ্বাস করবে? এই পাহাড়ি এলাকায় খরগোশ ধরা অত সহজ নয়।'

pathagar.net

'রাতে আমি চার পায়ে শিকার ধরি,' মোটামুটি এইরকম রহস্যময় একটা উত্তর পাওয়া গেল।

'তার মানে কুকুর সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরোও?' অনিশ্চিত সুরে বলল ভ্যান শীল।

ছেলেটা ধীরে-ধীরে গড়িয়ে চিত হয়ে শুল, এক অপার্থিব চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল। সে-হাসিতে কিছুটা হিংস্র ছাপ কি ভ্যান শীলের নজরে পড়ল?

'আমার মনে হয়, কোনও কুকুরই আমার কাছে আসার জন্যে ছটফট করবে না—তার ওপর আবার রাতে!'

ভ্যান শীল ক্রমে অনুভব করতে লাগল, এই অদ্ভুত চোখ ও অদ্ভুত কথার মালিক বাচ্চা ছেলেটার মধ্যে নিঃসন্দেহে অলৌকিক কোনও রহস্য রয়েছে।

'জঙ্গলের মধ্যে এভাবে একা তোমাকে থাকতে দেওয়া যায় না।' শাসনের সুরে সে বলল।

'তোমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে তুমি হয়তো আমাকে এখানেই রেখে যেতে চাইবে।' ছেলেটা বলল।

ভ্যান শীলের পরিপাটি করে সাজানো বাড়িতে এই উলঙ্গ বুনো পশুটির উপস্থিতি কল্পনা করতেই ভয় হয়।

'তুমি না গেলে আমি জোর করে নিয়ে যাব।' বলল ভ্যান শীল।

বিদ্যুৎঝলকের মতো ঘুরে ছেলেটা পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুহূর্তের মধ্যে এপারে, ভ্যান শীলের কাছে, এসে ওর ভিজে চকচকে দেহটা লাফিয়ে উঠল। একটা ভোঁদড়ের পক্ষে এ ধরনের কার্যকলাপ হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু একটা ছেলের পক্ষে, ভ্যান শীলের মনে হল, এ-আচরণ রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক পা পিছোতে গিয়ে সে পিছলে পড়ে গেল। আগাছা ভরা পিছল পুকুরের পাড়ে প্রায় শোওয়া অবস্থায় নিজেকে সে আবিষ্কার করল, এবং বাঘের মতো হলদে চোখ দুটো তার চোখের খুব কাছেই স্থির। একরকম সহজ প্রবৃত্তিবশেই তার হাত উঠে এল গলার কাছে—হয়তো বা আত্মরক্ষার তাগিদে। ছেলেটা আবার হাসল। এবারের হাসিতে কর্কশ হিংস্র ভাব অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা বুনো ঝোপের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আশ্চর্য! কী অদ্ভুত জন্তু!' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে মন্তব্য করল ভ্যান শীল। তাঁর মনে পড়ল কানিংহ্যামের কথা ঃ 'তোদের জঙ্গলে একটা বুনো জানোয়ার আছে।'

ধীর পায়ে বাড়ির পথে রওনা হল ভ্যান শীল; এই অবাক-করা বন্য কিশোরটির অস্তিত্বের কারণ জোগাতে পারে এমন সব বিভিন্ন স্থানীয় ঘটনা মনে-মনে যাচাই করে দেখতে লাগল।

সম্প্রতি, যে-কোনও কারণেই হোক, জঙ্গলে শিকারের সংখ্যা বেশ কমে

pathagar.net

এসেছে। লোকজনের খামার থেকে গৃহপালিত পশু চুরি যাচ্ছে। খরগোশ রহস্যময়ভাবে হয়ে উঠছে দুর্লভ, এবং, এ-নালিশও তার কানে এসেছে যে, পাহাড় থেকে ভেড়ার ছানা কে বা কারা প্রায়ই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এ কি সম্ভব যে, এই বুনো ছেলেটা একটা চতুর শিকারি কুকুর নিয়ে সত্যিই শিকার করে বেড়াচ্ছে? ও বলেছে, রাতে ও 'চার পায়ে' শিকার করে। কিন্তু আবার এরকম অদ্ভুত ইঙ্গিতও দিয়েছে যে, কোনও কুকুর ওর সঙ্গে আসতে চাইবে না—'তার ওপর রাতে!' নাঃ, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে রহস্যময়। গত মাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন লুটপাটের ঘটনাগুলো মনে-মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল ভ্যান শীল। এবং পরমুহূর্তেই সে চলার পথে ও অনুমান প্রক্রিয়ায় থমকে দাঁড়াল। মাস-দুয়েক আগে ঘানিওয়ালার যে-বাচ্চাটা হারিয়ে গিয়েছিল, সকলের বিশ্বাস সে ঘানির ধাক্কায় কোথাও ছিটকে গিয়ে পড়েছে; কিন্তু ছেলেটার মা বরাবরই বলে এসেছে বাড়ির পিছনে পাহাড়ের দিক থেকে একটা আর্ত চিৎকার তার কানে এসেছে। এ নিতান্তই অবিশ্বাস্য, কিন্তু ওই বুনো ছেলেটা ওরকম শিউরে ওঠা ভয়ঙ্কর মন্তব্য না করলেও পারত যে, মাস-দুয়েক আগে সে শেষ মানুষের বাচ্চার মাংস খেয়েছে। ঠাট্টা করেও এ-ধরনের বুক-কাঁপানো মন্তব্য করা ঠিক নয়।

স্বভাববিরুদ্ধভাবে তার আবিষ্কারের কথা সবাইকে বলে বেড়ানোটা সমীচীন মনে করল না ভ্যান শীল। যাজকপল্লীর উপদেষ্টা ও শান্তিরক্ষার শাসক হয়েও সে তার এলাকায় একটা সন্দেহজনক চরিত্রের প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছে এ-কথা জানাজানি হলে তার পদমর্যাদার যথেষ্ট ক্ষতি হবে। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হারানো ভেড়া ও গৃহপালিত পশুর জন্য তারই বাড়িতে মোটা আকারের ক্ষতিপূরণের বিল এসে হাজির হবে। সেদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে ভ্যান শীল অস্বাভাবিক চুপচাপ রইল।

'কীরে, মুখে কথা নেই কেন?' তার পিসি বললেন, 'লোকে ভাববে, যেন এইমাত্র কোনও নেকড়ে বাঘ দেখে এসেছিস!'

এই পুরোনো প্রবাদটা ভ্যান শীলের অপরিচিত হওয়ায় তার কাছে কথাটা নিতান্তই নির্বোধ মনে হল; যদি সে নিজের এলাকায় কোনও নেকড়ে বাঘই দেখত, তা হলে সেই বিষয়ে নিয়ে তার জিভ এই মুহূর্তে অত্যধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময়ে ভ্যান শীল স্পষ্ট বুঝতে পারল, গতকালের ঘটনার অস্বস্তিকর অনুভূতি তার মন থেকে পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। সে ঠিক করল, ট্রেনে চড়ে পাশের শহরে যাবে, কানিংহ্যামকে খুঁজে বের করে তার কাছ থেকে জানবে, সত্যি-সত্যি কী দেখে সে মন্তব্য করেছিল, 'তোদের জঙ্গলে একটা বুনো জানোয়ার আছে।' এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ভ্যান শীলের মনে স্বাভাবিক খুশির ভাব আংশিক ফিরে এল, এবং নিত্যকার সিগারেটটি ধরানোর জন্য প্রত্যুষ-কক্ষের দিকে রওনা হতে-হতে এক কলি আনন্দের সুর তার ঠোঁটে গুনগুন করে উঠল। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই সেই সুরের কলি আকস্মিকভাবে রূপ নিল ধর্মীয় প্রার্থনায়। গদি আঁটা সোফার ওপরে স্বাভাবিক সৌষ্ঠবে নিখুঁত বিশ্রামের ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে জঙ্গলের সেই

ছেলেটা। শেষ বার ভ্যান শীল যেমন দেখেছিল, তার চেয়ে ওর শরীর এখন শুকনো তবে সাজ-পোশাকে অন্য কোনও পরিবর্তন নজরে পড়ল না।

'কোন সাহসে এখানে এসেছ?' ভয়ঙ্কর সুরে প্রশ্ন করল ভ্যান শীল।

'তুমিই তো বলেছিলে জঙ্গলে একা না থাকতে,' শান্ত স্বরে ছেলেটা বলল।

'কিন্তু এখানে আসতে বলিনি। যদি আমার পিসি দেখে ফ্যালে!' এবং সেই বিপর্যয়কে রোধ করতে অনাহূত অতিথিকে তড়িঘড়ি 'মর্নিং পোস্ট'-এর ভাঁজের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে চাইল ভ্যান শীল। সেই মুহূর্তেই তার পিসি ঘরে এসে ঢুকল।

'এই বেচারা ছেলেটা পথ হারিয়ে ফেলেছে—এমন কি স্মৃতিশক্তিও। ও কে, কোত্থেকে এসেছে, কিছুই বলতে পারছে না,' মরিয়া হয়ে ব্যাখ্যা করল ভ্যান শীল, আশঙ্কিত নজরে এক পলক তাকাল নিরাশ্রয় প্রাণীটির দিকে : ওর অন্যান্য জান্তব প্রবণতার সঙ্গে অসুবিধেজনক সরলতা এই মুহূর্তে ও যোগ করবে না তো?

মিস ভ্যান শীল ভীষণ কৌতূহলী হয়ে পড়লেন।

'ওর ভেতরকার জামাকাপড়ে নিশ্চয়ই ময়লা লেগেছে,' তিনি অনুমান করলেন।

'সেসবের বেশিরভাগই ওর খোয়া গেছে,' ভ্যান শীল বলল, একইসঙ্গে ক্ষিপ্ত হাতে 'মনিং পোস্ট'-কে জায়গা মতো ধরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

একটি উলঙ্গ নিরাশ্রয় শিশুর আবেদন মিস ভ্যান শীলের কোনও পথহারা বেড়ালছানা কিংবা পরিত্যক্ত কুকুরছানার মতোই উষ্ণ মনে হল।

'ওর জন্যে আমাদের যথাসাধ্য করা উচিত,' তিনি সিদ্ধান্তের সুরে বললেন, এবং অল্পসময়ের মধ্যেই স্থানীয় যাজকের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে ছেলেটার জন্যে জামা-প্যান্ট ইত্যাদি আনানো হল। পরিষ্কার পোশাকে ফিটফাট হয়ে ছেলেটার অপার্থিব রহস্যময় চরিত্র ভ্যান শীলের চোখে কিছুটা প্রশমিত হল, কিন্তু তার পিসির মতে ছেলেটা নাকি দারুণ মিষ্টি।

'ওর আসল পরিচয় না জানা পর্যন্ত ওকে একটা নাম দিতে হবে,' তিনি বললেন, 'ওর নাম হোক, গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্ট—এটা বেশ চমৎকার নাম।'

ভ্যান শীল অমত করল না, কিন্তু মনে-মনে তার সন্দেহ রয়েই গেল যে, সত্যিকারের একটা সুন্দর নিষ্পাপ শিশুকে এ-নাম দেওয়া হচ্ছে কি না। ছেলেটা বাড়িতে পা রাখামাত্রই ভ্যান শীলের বড়সড় স্প্যানিয়েলটা ছুটে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে, এবং শত ডাকাডাকি সত্ত্বেও ফিরে না এসে বাগানের ওপারে দাঁড়িয়ে কাঁপছে আর কেঁউকেঁউ করে ডাকছে; যে-ক্যানারি পাখিটা চব্বিশ ঘণ্টা ভ্যান শীলের মতো প্রাণপাত পরিশ্রমে কিচিরমিচির করে, এখন সে ভয়ার্ত সুরে থেকে-থেকে কিচকিচ করছে। এই ঘটনাগুলো ভ্যান শীলের আশঙ্কা আরও জোরদার করল। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে কানিংহ্যামের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তার মনটা ছটফট করে উঠল।

স্টেশনে যখন সে রওনা হচ্ছে তখন তার পিসি গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্টকে বুঝিয়ে

দিচ্ছেন, যেসব বাচ্চারা আজ বিকেলে তাঁর 'সান্‌ডে স্কুল'-এ পড়তে আসবে তাদের চায়ের সময়ে কীভাবে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

কানিংহ্যাম প্রথমটায় তেমন মুখ খুলতে চাইল না।

'আমার মা মাথার গোলমালে মারা গেছেন,' সে বুঝিয়ে বলল, 'সুতরাং, তুই বুঝতে পারবি ভয়ঙ্কররকম অবাস্তব কোনও ঘটনাও চোখে দেখে, বা দেখেছি ভেবে, কেন সে নিয়ে আমি কোনওরকম আলোচনা করতে চাই না।'

'কিন্তু তুই দেখেছিসটা কী?' ভ্যান শীল নাছোড়বান্দা।

'আমি যা দেখেছি তা এতই অস্বাভাবিক যে, সত্যিকারের কোনও সুস্থ মানুষ তাকে প্রকৃত ঘটনার মর্যাদা দিতে চাইবে না। তোর ওখান থেকে যেদিন চলে আসি তার আগের দিন সন্ধ্যায় তোদের বাগানের দরজার কাছে কতকগুলো আগাছা ঝোপের আড়ালে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। দেখছিলাম অস্ত যাওয়া সূর্যের মিলিয়ে আসা আলো। হঠাৎই একটা নগ্ন কিশোরের দিকে আমার নজর পড়ল; ভাবলাম হয়তো আশপাশের কোনও পুকুরে স্নান-টান করতে এসে থাকবে। ছেলেটাও খোলা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিল। ওর দাঁড়ানোর অদ্ভুত বন্য ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করল। তক্ষুনি ঠিক করলাম, ওকে আমার মডেল করব। ছেলেটাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তেই সূর্য অস্ত গেল পাহাড়ের আড়ালে, এবং সমস্ত কমলা ও গোলাপি রং সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে মুছে গেল—পড়ে রইল ধূসর ঠান্ডা ছায়া। আর ঠিক ওই একই মুহূর্তে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা—ছেলেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল!'

'কী? অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?' উত্তেজিতভাবে জানতে চাইল ভ্যান শীল।

'না; সেটাই তো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার,' চিত্রকর উত্তর দিল, 'খোলা পাহাড়ের ঠিক যে-জায়গাটায় এক সেকেন্ড আগেও ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল, এখন সেখানে দাঁড়িয়ে একটা বিশাল নেকড়ে। গায়ের রং কালচে, শ্বদন্ত ঝকঝক করছে, হলদে চোখ দুটো নৃশংসতায় ভরা। তুই হয়তো ভাববি—।'

কিন্তু ভ্যান শীল চিন্তা-ভাবনা জাতীয় তুচ্ছ জিনিসে এতটুকু সময় নষ্ট করল না। ততক্ষণে সে উল্কাগতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে স্টেশনের দিকে। টেলিগ্রাম করার পরিকল্পনা সে মন থেকে উড়িয়ে দিল। 'গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্ট একটা মানুষ-নেকড়ে' বলে খবর পাঠালে অবস্থার গুরুত্ব এতটুকুও বোঝানো যাবে না, কারণ, তার পিসি হয়তো ভাববেন সেটা একটা সাঙ্কেতিক খবর, যার অর্থ বের করার চাবিকাঠি ভ্যান শীল তাঁকে দিতে ভুলে গেছে। ভ্যান শীলের মনে একটাই আশা যে, সূর্যাস্তের আগে সে হয়তো বাড়িতে পৌঁছতে পারবে।

ট্রেন যাত্রার শেষে স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার জন্য যে-গাড়িটা সে ভাড়া

pathagar.net

করেছিল, সেটা অত্যন্ত ঢিমে তালে গ্রামের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। ডুবে আসা সূর্যের আলোয় রাস্তায় এখন গোলাপি ও লাল রঙের খেলা।

সে বাড়িতে পৌঁছে দেখল, তার পিসি 'পুরোপুরি তৈরি হয়নি' এমন কিছু আচার ও কেক শেল্‌ফে তুলে রাখছেন।

'গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্ট কোথায়?' সে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'ও টুপদের বাচ্চাটাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেছে,' তার পিসি বললেন, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম বাচ্চাটাকে একা-একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। সূর্যটা দেখ, কী সুন্দর লাগছে!'

পশ্চিমের আকাশে রক্তিম ছটা ভ্যান শীলের নজর এড়ায়নি, কিন্তু সেই সৌন্দর্য আলোচনার জন্য সে অপেক্ষা করল না। অস্বাভাবিক তীব্র গতিতে সরু পথ ধরে সে ছুটে চলল টুপদের বাড়ির দিকে।

খোলা পাহাড় ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে গেছে। দিগন্তে নিষ্প্রভ সূর্যের সামান্য অংশ এখনও দেখা যাচ্ছে। সামনের মোড়টা ঘুরলেই হয়তো ওদের দেখা পাওয়া যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে পরিবেশ থেকে সমস্ত রং পলকে অদৃশ্য হল। এক দ্রুত কাঁপুনি দিয়ে ধূসর আলো প্রকৃতির বুকে জাঁকিয়ে বসল। ভ্যান শীলের কানে এল এক তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

pathagar.net

এরপর টুপ ছেলেটাকে কিংবা গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্টকে আর দেখা যায়নি। তবে শেষোক্তজনের ছেড়ে-যাওয়া জামাকাপড় পথের ওপর পাওয়া গিয়েছিল। সেসময়ে ভ্যান শীল ও অন্যান্য শ্রমিক, যারা আশেপাশে ছিল তারা সকলেই একবাক্যে বলেছে, যে-জায়গাটায় জামাকাপড়গুলো পাওয়া গিয়েছিল ঠিক তার কাছ থেকেই একটা বাচ্চাকে ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠতে শোনা গেছে। সুতরাং, ধরে নেওয়া হয় যে, টুপ বাচ্চাটা প্রথমে জলে পড়ে গিয়েছিল। তখন গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্ট জামাকাপড় খুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। মিসেস টুপ তাঁর বাকি এগারোটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নির্বিকারে শোকমগ্ন হলেন, কিন্তু মিস ভ্যান শীল তাঁর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের শোকে সত্যিই মুষড়ে পড়লেন। তাঁর উদ্যোগেই যাজক-পল্লীর গির্জায় একটা পেতলের স্মৃতিফলক লাগানো হল এই বলে ঃ 'গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্ট, একটি অজ্ঞাতপরিচয় কিশোর—যে অন্যের প্রাণ রক্ষায় অসমসাহসিকতায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে।'

প্রায় সব বিষয়েই পিসির কথা শোনে ভ্যান শীল, কিন্তু গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্ট স্মৃতি তহবিলে চাঁদা দেওয়ার অনুরোধ সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল।

দুশমন

আইজ্যাক ব্যাশেভিস সিঙ্গার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেশ কয়েকজন ইদ্দিশ লেখক ও সাংবাদিক কিউবা, মরোক্কো এমন কি সাংহাই হয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে পৌঁছতে পেরেছিল। ওরা সবাই ছিল পোল্যান্ডের উদ্বাস্তু। নিউ ইয়র্কের ইদ্দিশ কাগজে ওদের আসার খবর আমি নিয়মিতভাবে পড়তে পারিনি। ফলে আমার সহকর্মীদের মধ্যে কারা বেঁচে আছে আর কারা শেষ হয়ে গেছে তার খবরও সঠিকভাবে রাখতে পারিনি। একদিন সন্ধেবেলা পঞ্চম অ্যাভিনিউ ও ৪২তম রাস্তায় দাঁড়ানো পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে গার্নি, মেয়ার্স ও পডমোরের লেখা 'দ্য ফ্যান্টম্‌স অফ লিভিং' পড়ছি, কে যেন কনুইয়ে ঠেলা মারল। দেখি একজন ছোটখাটো মানুষ হর্ন-রিম চশমার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখছে। উঁচু কপাল, ধূসর হয়ে আসা কালো চুল, আর চোখ দুটো চিনেদের মতো তেরচা। লম্বা হলদে দাঁত বের করে সে হাসল। ভাঁজ-পড়া গাল, খাটো নাক, আর ওপরের ঠোঁট বেশ ঝোলা। পরনে কোঁচকানো জামা, আর টাইটা কলার থেকে ঠিক ফিতের মতো ঝুলছে। তার চতুর তৃপ্তির হাসি যেন বলে দিচ্ছে এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে আমি চিনতে পারিনি। সন্দেহ নেই, আমার হতবুদ্ধি অবস্থায় সে মজা পাচ্ছিল। সত্যি বলতে কি, মুখটা পরিচিত ঠেকলেও আমি নামটা তখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ারে বসে মনপঠন, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আর মৃতের পুনর্জীবন সংক্রান্ত সত্যকাহিনি পড়তে-পড়তে আমার মনটা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

'আমাকে ভুলে গেছ, অ্যাঁ?' সে বলল, 'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।' শাইকিন নামটা সে উচ্চারণ করামাত্রই সব মনে পড়ে গেল। ওয়ারস'র একটি ইদ্দিশ খবরের

pathagar.net

কাগজে সে পাঠকের-মন-জাগানো ফিচার লেখে। আমরা বন্ধু ছিলাম। বয়সে সে আমার চেয়ে বিশ বছরের বড় হলেও আমাদের সম্পর্ক 'তুমি'তে নেমে এসেছিল।

'তুমি তা হলে বেঁচে আছ?' আমি বললাম।

'যদি এর নাম বেঁচে থাকা হয়। আমি কি সত্যিই খুব বুড়ো হয়ে গেছি?'

'তুমি আমার কাছে সেই একই বুদ্ধুরাম আছ।'

'না, ঠিক একই নেই। তুমি তো ভেবেছিলে আমি মরে গেছি, তাই না? আর একটু হলে তাই হত। চলো, বাইরে বেরিয়ে এক গেলাস কফি খাওয়া যাক। কী পড়ছ তুমি? এর মধ্যেই ইংরেজি শিখে গেছ?'

'ওই পড়ার মতো আর কী।'

'এই মোটা বইটা কীসের?'

বললাম ওকে।

'ও, তুমি তা হলে এখনও এইসব ভোজবাজিতে বিশ্বাস করো?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্যাটালগ রুমের পাশ দিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলাম বাইরে। তারপর এলিভেটরে নেমে এলাম ৪২তম রাস্তার দরজায়। একটা কাফেটেরিয়ায় গিয়ে বসলাম আমরা। শাইকিনকে আমি ডিনার খাওয়াতে চাইলাম, কিন্তু সে আমাকে আশ্বস্ত করে বলল যে, তার পেট ভরতি। স্রেফ এক গেলাস কালো কফি চাইল সে।

'দেখো, যেন গরম হয়,' সে বলল, 'মার্কিন কফি কখনই তেমন গরম পাই না, আর গুঁড়ো চিনিও আমার যাচ্ছেতাই লাগে। চিবোনো যায় এরকম চিনির ডেলা জোগাড় করে দিতে পারো?'

পুরোনো অভ্যেস হাতড়ে বেড়ানো অনভিজ্ঞ আনকোরা এক তরুণকে এক গেলাস কফি, আর এক ডেলা চিনি দেওয়ার জন্য কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো মেয়েটিকে অনেক কষ্টে রাজি করালাম। কারণ, আমি চাইনি যে, শাইকিন আমেরিকাকে আক্রমণ করুক। আমি ইতিমধ্যেই নাগরিকত্বের প্রাথমিক কাগজপত্র পেয়ে গেছি, আর খুব শিগগিরই নাগরিক হয়ে যাব।

শাইকিনকে কালো কফির গেলাস এনে দিলাম, সেইসঙ্গে ওয়ারস'র ধাঁচে সেঁকা এগ কুকি। তামাকের দাগে হলদে হয়ে যাওয়া আঙুলে এক টুকরো ভেঙে খেল সে ঃ 'বড্ড মিঠে।'

কথা বলতে-বলতে সে একটার-পর-একটা সিগারেট ধরাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের টেবিলের ছাইদানিটা সিগারেটের টুকরো আর ছাইয়ে ভরে গেল। শাইকিন বলছিল, 'তুমি বোধহয় জানো গত ক'বছর আমি রিও ডি জেনিরোয় ছিলাম। ''দ্য ফরওয়ার্ট্স'' কাগজে তোমার গল্পগুলো আমি নিয়মিত পড়তাম। সত্যি কথা বলতে কী, অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার আর জাদুবিদ্যা নিয়ে তোমার মেতে থাকাটা ক'দিন আগে পর্যন্তও আমি খামখেয়ালিপনা বলে ভাবতাম—তোমার লেখার এক ধরনের মুদ্রাদোষ। কিন্তু তারপরই আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, আমি ঠিক

pathagar.net

সামলে উঠতে পারলাম না।'

'তুমি কি ভূত দেখেছ নাকি?'

'তা বলতে পারো।'

'ও, তা হলে আর দেরি করছ কেন? এ-ধরনের ঘটনাই আমি সবচেয়ে ভালোবাসি—বিশেষ করে তোমার মতো একজন অবিশ্বাসীর কাছ থেকে।'

'সত্যি ব্যাপারটা বলতে আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে রাজি আছি যে, কোথাও হয়তো একটা ভগবান রয়েছে, হতচ্ছাড়া দুনিয়াটাকে সে যা-হোক তা-হোক করে চালায়। কিন্তু তাই বলে তোমার ওইসব জগাখিচুড়িতে কোনওকালেই আমার বিশ্বাস ছিল না। তবে কখনও-কখনও এমন ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় যাকে কিছুতেই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা স্রেফ পাগলের কাণ্ড। হয় সে-ক'টা দিন আমার মাথার ঠিক ছিল না। অথবা আমি এক লম্বা দিবাস্বপ্ন দেখেছি। তবে আমি আগাপাশতলা পাগল নই। তুমি হয়তো জানো, যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি ফ্রান্সে ছিলাম। যখন ভিশি সরকারের পত্তন হল তখন আমি ক্যাসাব্ল্যাঙ্কায় পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। সেখান থেকে চলে গেলাম ব্রেজিলে। রিওতে একটা ছোট ইদ্দিশ খবরের কাগজ আছে। ওরা আমাকে তার সম্পাদক করে নিল। ও হ্যাঁ, সেই কাগজে আমি তোমার সব লেখা একের পর এক রিপ্রিন্ট করতাম। রিও খুব সুন্দর, ওখানকার মেয়েরা হল গিয়ে এক কিস্‌সা—নির্ঘাত জল-হাওয়ার গুণ। ওদের ভালোবাসার দাবি আমার মতো বুড়ো আইবুড়োর পক্ষে মারাত্মক। তাই নিউ ইয়র্কে আসার একটা সুযোগ পেতেই সেটা একেবারে আঁকড়ে ধরলাম। ভিসা যে খুব সহজে পাইনি তা নিশ্চয়ই তোমাকে আর বলার প্রয়োজন নেই। আর্জেন্টিনার এক জাহাজে চড়ে পাড়ি দিলাম। তাতে নিউ ইয়র্ক পৌঁছতে বারো দিন সময় লেগেছিল।

'যখনই আমি জাহাজে ভেসে পড়ি তখনই এক ঝামেলা তৈরি হয়। হোটেলে আর জাহাজে আমি হরবখত পথ হারিয়ে ফেলি। স্বাভাবিকভাবেই ট্যুরিস্ট ক্লাসের টিকিট কেটেছিলাম। ফলে একটা কেবিন একজন গ্রিক আর দুজন ইটালিয়ানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ছিলাম। গ্রিকটা ছিল খ্যাপা। সবসময়েই বিড়বিড় করছে। গ্রিক ভাষা আমি জানি না, তবে নির্ঘাত বলতে পারি লোকটা গালিগালাজ করছিল। বোধহয় বাড়িতে সোমত্ত বউ রেখে এসেছে, তাই হিংসে হচ্ছে। রাতে যখন সব বাতি নিভে যেত তখন ওর চোখজোড়া নেকড়ের মতো জ্বলত। ইটালিয়ান দুজন বোধহয় যমজ ছিল, দু-জনেই বেঁটে, মোটা, পিঁপের মতো গোল। সারা দিনেও ওদের বকবকানি শেষ হত না, চলত সেই মাঝরাত্তির পর্যন্ত। আর মিনিটে-মিনিটে ওরা ফেটে পড়ত হাসিতে। ইটালিয়ান ভাষাও আমার কাছে গ্রিকের মতোই বিদেশি। ভাঙা-ভাঙা ফরাসি ভাষায় আমি ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে-চেষ্টা দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলার মতোই। ওরা আমাকে পাত্তাই দিতনা। সমুদ্রে সবসময়েই আমার তলপেট

pathagar.net

আইঢাই করে। রাত্তিরে কম-সে-কম দশবার পেচ্ছাপ পায়। আর আমার বার্থ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামা এক ঝঞ্ঝাট বটে।

'আমার ভয় ছিল, ডাইনিং-রুমে আমাকে হয়তো এমন লোকের সঙ্গে বসতে দেবে যাদের ভাষা একবর্ণও বুঝি না। কিন্তু আমাকে দরজার মুখে একটা ছোট টেবিলে একা বসতে দেওয়া হল। প্রথমটা খুশিই হলাম। ভাবলাম, শান্তিতে খাওয়া যাবে। কিন্তু শুরুতেই আমার ওয়েটারের দিকে একপলক দেখেই বুঝলাম লোকটা আমার দুশমন। ঘেন্না করার জন্যে কোনও কারণের দরকার হয় না। আর্জেন্টিনার মানুষেরা খুব একটা প্রকাণ্ড হয় না, কিন্তু এই লোকটা খুব লম্বা, চওড়া কাঁধ, একেবারে যেন দৈত্য। ওর চোখজোড়া যেন কোনও খুনের। প্রথমবারে লোকটা যখন আমার টেবিলে এল, এমন ঘেন্নার চোখে তাকাল যে, আমি শিউরে উঠলাম। ওর মুখটা বিকৃত, আর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। আমি প্রথমে ফরাসি আর তারপরে জার্মানি ভাষায় ওর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু লোকটি কেবলই মাথা নাড়ল। আমি ইশারায় মেনুকার্ড চাইলাম। তার জন্যে লোকটা আমাকে আধঘণ্টা বসিয়ে রাখল। আর যে-খাবারই দিতে বলি ও আমার মুখের ওপর হেসে অন্য কিছু এনে দেয়। টেবিলে প্লেট রাখছিল ঠকঠক করে। মোদ্দা কথা, বেটা যেন আমার সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। ওর আক্রোশের বহর দেখে আমার শরীর বেহাল হয়ে উঠল। দিনের মধ্যে তিনবার আমাকে ওর কবলে পড়তে হত, আর প্রতিবারই ও আমাকে হেনস্থা করার নতুন কায়দা বের করত। লোকটা আমাকে পর্ক চপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি বারবারই সেগুলো ফেরত পাঠিয়েছি। প্রথমটা ভেবেছি বেটা বোধহয় নাৎসি, ইহুদি বলে আমাকে শায়েস্তা করতে চাইছে। কিন্তু না, তা নয়। কাছাকাছি একটা টেবিলে একটি ইহুদি পরিবার বসেছিল। তার মধ্যে মহিলাটি একটি "স্টার অফ ডেভিড" ব্রুচ পর্যন্ত পরেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকটা ওদের ঠিকঠাক খাবারদাবার দিচ্ছিল, এমনকী গল্পগাছাও করছিল ওদের সঙ্গে। প্রধান স্টুয়ার্ডের কাছে গিয়ে আমি অন্য একটা টেবিলে বসতে চাইলাম, কিন্তু সে হয় আমার কথা বুঝতে পারল না, নয়তো না বোঝার ভান করল। জাহাজে ইহুদির সংখ্যা কম ছিল না। আমি খুব সহজেই তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে পারতাম, কিন্তু আমার মেজাজ এমন বিগড়ে গিয়েছিল যে, কারও সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। অবশেষে যখন একজনের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম, সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ততক্ষণে আমি সত্যি-সত্যি ভাবতে শুরু করেছি কোনও অশুভ শক্তি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। আমার রাতের ঘুম উড়ে গেল। যখনই একটু তন্দ্রামতো আসছে তখনই চমকে জেগে উঠছি। নানান ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম—যেন কেউ আমাকে অভিশাপ দিয়েছে। জাহাজে একটা ছোট লাইব্রেরি ছিল। সেখানে বেশ কিছু ফরাসি আর জার্মান বই ছিল। বইগুলো কাচের বুক-কেসে তালাবন্ধ ছিল। লাইব্রেরিয়ান মেয়েটির কাছে একটা বই চাইতেই সে ভুরু কুঁচকে কেটে পড়ল।

'নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বললাম, "কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে লক্ষ-লক্ষ ইহুদি অত্যাচারে অবিচারে জর্জরিত হচ্ছে। আমিই বা তার থেকে বাদ পড়ি কেন?" অন্তত একবারের জন্যে আমি খ্রিস্টান হতে চাইলাম, ঘৃণার জবাব দিতে চাইলাম ভালোবাসা দিয়ে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। আমি আলুর অর্ডার দিলে ওয়েটারটা বাটি করে চিজ লাগানো ঠান্ডা স্প্যাগেটি দিয়ে গেল। তার এমন দুর্গন্ধ যেন সগ্‌গেও টের পাওয়া যাবে। আমি বললাম, "শোনো", কিন্তু কুত্তার বাচ্চাটা কোনও জবাব দিল না। বিদ্রুপ আর ঘেন্নার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। কোনও মানুষের চোখ—এমনকী মুখ কিংবা দাঁতও—কখনও-কখনও কথার চেয়ে অনেক বেশি ভাব প্রকাশ করতে পারে। আমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়ে আমার যত না মাথাব্যথা ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল কৌতূহল। যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটেছে তা যদি নেহাত আমার কল্পনা না হয় তা হলে আমাকে সবরকম মূল্যবোধই আবার খতিয়ে দেখতে হবে—ফিরে যেতে হবে আদিম কুসংস্কারের জগতে। কফিটা দেখছি বরফের মতো ঠান্ডা।'

'তুমিই তো ঠান্ডা করলে।'

'যাকগে, বাদ দাও।'

pathagar.net

২

প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা পায়ে পিষে নেভাল শাইকিন : 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি বরাবরই একটু বেশি সিগারেট খাই। ওই জাহাজে চড়ার পর থেকে একেবারে চেন-স্মোকার হয়ে গেছি। দাঁড়াও, গল্পটা আগে বলে নিই। সাগর পাড়ি দিতে মোট বারো দিন লেগেছিল, আর দিনকে-দিন ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। আমার খাওয়া একরকম বন্ধই হয়ে গেল। প্রথমে ব্রেকফাস্ট বাদ দিয়ে দিলাম। তারপর ঠিক করলাম, দিনে একবার করে খেলেই যথেষ্ট। সুতরাং, স্রেফ রাতের খাওয়া খেতে যেতাম। প্রতিটা দিনই যেন ইয়ম কিপার*। ইস, যদি নির্জনে কাটানোর জন্যে একটা নিরিবিলি জায়গা পেতাম! কিন্তু ট্যুরিস্ট ক্লাস একেবারে ঠাসা। ইটালিয়ান মেয়েরা সারাদিন বসে গান গাইছে। লাউঞ্জে পুরুষরা তাস, ডোমিনো, চেকার খেলছে, আর বড়-বড় মগে বিয়ার গিলছে। যখন আমরা বিষুব অঞ্চল পার হচ্ছি তখন অবস্থা হয়ে উঠল গিহানার (নরকের) মতো। মাঝরাত্তিরে উঠে ডেকে গেলেই এমন গরমের ঝাপটা লাগে যেন চুল্লির হলকা। মনে হচ্ছিল, এখুনি যেন পৃথিবীর সঙ্গে কোনও ধূমকেতুর সংঘর্ষ হবে আর সমুদ্রটা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। বিষুব অঞ্চলে সূর্যাস্ত সুন্দর, আর ভয়ঙ্করও বটে (অবিশ্বাস্যরকম)। রাত নেমে আসে আচমকা। এই দেখলাম দিন, আর পরক্ষণেই অন্ধকার। চাঁদটা সূর্যের মতো বড় আর রক্তের মতো লাল। ওইসব অঞ্চলে তুমি কখনও ঘুরতে গেছ? ইটালিয়ান দুটোকে আর গ্রিকটাকে এড়ানোর

* উপবাস ও প্রার্থনা করে কাটাতে হয়, ইহুদিদের এমন একটি পবিত্র ছুটির দিন।

জন্যে আমি ডেকে গিয়ে শুয়ে-শুয়ে ঝিমোতাম। এর মধ্যে একটা জিনিস শিখে নিয়েছিলাম ঃ টেবিল থেকে যা পারতাম তুলে নিয়ে আসতাম—একটুকরো চিজ, একটা রোল, একটা কলা। যখন আমার দুশমন টের পেল যে, আমি কেবিনে খাবার নিয়ে যাই, সে রাগে একেবারে ফুঁসে উঠল। একবার আমি একটা কমলালেবু নিয়ে যাচ্ছিলাম, লোকটা আমার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল। আমার তো ভয় ধরে গেল আমাকে না মেরে বসে। সত্যি-সত্যি মনে আতঙ্ক ঢুকে গেল। আমার খাবারে যেন বিষ না মিশিয়ে দেয়। এই ভয়ে রান্না করা খাবার খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলাম।

' 'নিউইয়র্কে' পৌঁছনোর দু-দিন আগে ক্যাপ্টেনের নৈশভোজের আয়োজন হল। কাগজের শেকল, লণ্ঠন আর রঙিন কারুকাজে ডাইনিং রুমটা সাজানো হল। সেদিন সন্ধ্যায় ডাইনিং রুমে ঢুকে ঘরটাকে মোটে চিনতেই পারলাম না। যাত্রীরা সব শৌখিন সান্ধ্য পোশাক, টাক্সিডো ইত্যাদি পরে রয়েছে। প্রত্যেক টেবিলে কাগজের টুপি, সোনালি-রুপোলি পাগড়ি, ভেঁপু আর তার সঙ্গে ঝকঝকে চুমকি বসানো নানান সরঞ্জাম—এসব উৎসবে যা থাকে আর কী। মেনু কার্ডগুলো মাপে বড়, ফিতে দিয়ে ফুল বেঁধে সাজানো। দেখি আমার টেবিলে আমার দুশমন একটা জোকারের টুপি সাজিয়ে রেখেছে।

'টেবিলে বসলাম। টেবিলটা একে মাপে ছোট, তার ওপরে ওসব ছেলেমানুষির মেজাজ আমার ছিল না। তাই টুপিটা ফেলে দিলাম মেঝেতে। সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে খাবারের জন্যে সবচেয়ে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখল। সবাইকে সুপ, মাছ, মাংস, সিরাপে ভেজানো ফল, কেক দেওয়া হচ্ছে, আর আমি বসে আছি খালি প্লেটের সামনে। খাবারের গন্ধে আমার জিভে জল এসে গেল। পাক্কা একটা ঘণ্টা পরে ওয়েটারটা হন্তদন্ত হয়ে এসে একটা মেনুকার্ড এমনভাবে আমার হাতে গুঁজে দিল যে, আমার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝের জায়গাটায় চিরে গেল। তারপরেই মেঝেতে পড়ে থাকা টুপিটা লোকটার নজরে পড়ল। ওটা তুলে এমন ক্ষিপ্তভাবে আমার মাথায় চেপে বসিয়ে দিল যে, আমার চশমা খুলে পড়ে গেল। শয়তানটাকে খুশি করার জন্যে জোকার সেজে থাকার কোনও মানে হয় না, তাই টুপিটা খুলে ফেললাম। তাই দেখে লোকটা স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে উঠল, ঘুষি পাকিয়ে শাসাল আমাকে। আমার অর্ডার তো নিলই না, উলটে স্রেফ শুকনো পাঁউরুটি আর এক বোতল টোকো মদ দিয়ে গেল। আমার এত খিদে পেয়েছিল যে, ওগুলোই খেলাম। সাউথ অ্যামেরিকানরা ক্যাপ্টেনের নৈশভোজকে রীতিমতো সিরিয়াসলি নেয়। ক'মিনিট ছাড়া-ছাড়াই শ্যাম্পেনের বোতল খোলার শব্দ হচ্ছিল। ব্যান্ড বাজছে পাগল করা ছন্দে। মোটা বুড়ো-বুড়ির দল নাচছে। আজ পুরো ব্যাপারটাকে তেমন একটা কষ্টের বলে মনে হয় না। কিন্তু তখন, ওই ভয়ঙ্কর লোকটা কেন আমার পেছনে লেগে আছে তা জানার জন্যে আমার জীবনের একটা বছর দিয়ে দিতে পারতাম। আশা ছিল, অন্তত কেউ হয়তো দেখতে পাবে আমাকে কীরকম হেনস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু আমার আশপাশের কেউই দেখলাম সে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। এমন কি এও মনে হল, আমার পাশেই যারা বসে আছে—

pathagar.net

এমন কি ইহুদিগুলোও—আমার দুর্দশায় হাসছে। এইরকম অবস্থায় মাথা কীরকম কাজ করে জানো তো!

'যেহেতু আর খাওয়ার কিছু ছিল না, আমি কেবিনে ফিরে এলাম। দেখলাম, গ্রিক বা ইটালিয়ানদের কেউই নেই। সিঁড়ি বেয়ে বার্থে উঠে জামাকাপড় পরেই শুয়ে পড়লাম। বাইরে সমুদ্র ফুঁসছে, আর ওপরের হলঘর থেকে বাজনা, চিৎকার আর হাসি শোনা যাচ্ছে।

'এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম। কখনও এত গভীর ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার মাথা যেন সোজা বালিশ ফুঁড়ে ডুবে গেল। পা দুটো হয়ে গেল অসাড়। হয়তো মারা যাওয়ার সময় এরকমই হয়। ঠিক তখনই চমকে জেগে উঠলাম। আমার তলপেটে ছুঁচ ফোটানো যন্ত্রণা। পেচ্ছাপ করতে যেতে হবে। আমার প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় জানি—তা ছাড়া আরও কী কে জানে! আমার কেবিনের সঙ্গীরা তখনও ফেরেনি। অলিন্দে সর্বত্র বমি ছড়িয়ে আছে। কাজ সেরে ঠিক করলাম একটু হাওয়া খেতে ডেকে যাব। ডেকের তক্তাগুলো ভেজা, পরিষ্কার, যেন এখুনি ধোলাই করা হয়েছে। আকাশ মেঘে ঢাকা, বড়-বড় ঢেউ উঠছে, আর জাহাজ দুলছে সাঙ্ঘাতিকরকম। এত ঠান্ডা যে, বেশিক্ষণ সেখানে থাকা সম্ভব ছিল না। তবুও ঠিক করলাম, একটু টাটকা হাওয়া খাব। তাই এপাশ-ওপাশ পায়চারি শুরু করলাম।

'তারপরই সেই ঘটনা ঘটল। এখনও বিশ্বাস হতে চায় না যে, সত্যিই সেই ঘটনা ঘটেছিল। জাহাজের পেছন দিকের রেলিং পর্যন্ত পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ভেবেছিলাম আমি একা, কিন্তু দেখলাম তা নয়। আমার সেই ওয়েটার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি কাঁপতে শুরু করলাম। ও কি অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল? বুঝতে পারছিলাম, এ আমার সেই লোক, কিন্তু মনে হল লোকটা যেন কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে আমারই দিকে। আমি পালাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু জাহাজের এক ঝাঁকুনি আমাকে ছিটকে ফেলে দিল সোজা ওরই হাতে। সে-মুহূর্তে মনের যে কী অবস্থা হয়েছিল তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। ছোটবেলায় যখন ইস্কুলে পড়তাম তখন একবার রাতের আঁধারে বেড়ালের ইঁদুর ধরার শব্দ শুনেছিলাম। ঘটনাটা প্রায় চল্লিশ বছর আগের, কিন্তু ইঁদুরটার আর্তচিৎকার এখনও আমাকে তাড়া করে ফেরে। জীবিত সবকিছুর হতাশা যেন ইঁদুরটার মধ্যে দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। দুশমনের থাবায় পড়েছি আমি। ইঁদুরটা যেমন বেড়ালের ঘৃণা বুঝতে পেরেছিল তেমনই ওর ঘৃণা আমি বুঝতে পারলাম। আমি যে তেমন বীর-টির নই সে-কথা তোমাকে বোধহয় আর বলার দরকার নেই। বাচ্চাবয়েস থেকেই আমি মারপিট এড়িয়ে চলি। কারও ওপর হাত তোলা কখনও আমার স্বভাবে ছিল না। আমি ভেবেছিলাম লোকটা বোধহয় আমাকে তুলে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখলাম আমি লড়ে যাচ্ছি। ও আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে, আর আমিও পালটা ধাক্কা দিচ্ছি। ধস্তাধস্তির মধ্যেই অবাক হয়ে ভাবলাম, এ কি আমার ডাইনিং

pathagar.net

রুমের সেই জানী দুশমন! ওই লোকটা তো এক ঘুষিতেই আমাকে খতম করে দিতে পারত। যার সঙ্গে আমি লড়াই করছি সে অন্য লোক। যে-দানবটাকে আমি ভয় পাই সে নয়। এর হাতদুটো যেন নরম রবার, জেলির মতো, অসাড় হয়ে ঝুলছে—কী করে ঠিক বোঝাব জানি না। ও আমাকে এমনভাবে ঠেলা দিল যেন গায়ে এতটুকু জোর নেই। আর আমি ওকে সত্যি-সত্যিই পালটা ধাক্কায় পেছনে ঠেলে দিতে পারলাম। লোকটা কোনও শব্দ করেনি। আমিও যে কেন সাহায্যের আশায় চেঁচিয়ে উঠিনি জানি না। অবশ্য সমুদ্রের প্রচণ্ড গর্জন ছাপিয়ে আমার চিৎকার কেউ শুনতেও পেত না। চুপচাপ চলতে লাগল আমাদের একগুঁয়ে লড়াই। আর জাহাজ টলতে লাগল এপাশ-ওপাশ। আমি পিছলে পড়ে গেলাম, কিন্তু কোনওরকমে সামলে নিতে পারলাম। কতক্ষণ ধরে আমাদের লড়াই চলছে জানিনা। পাঁচমিনিট, দশমিনিট, কিংবা আরও বেশি। একটা কথা মনে আছে : আমি একটুও হাল ছাড়িনি। আমাকে লড়তে হবে, সুতরাং নির্ভয়ে লড়ে চললাম। পরে মনে হয়েছিল, এভাবেই হয়তো দুটো মদ্দা হরিণ একটা হরিণীর জন্যে লড়াই করে। প্রকৃতি ওদের নির্দেশ দেয়, আর ওরা তা পালন করে। কিন্তু লড়াই যতই চলতে লাগল আমার দমও ততই ফুরিয়ে আসতে লাগল। আমার জামা ভিজে এক্‌সা। চোখে ফুলকি উড়ছে। না, ফুলকি নয়—সূর্যের কণা। আমি একেবারে দেহ-মন দিয়ে নিবিষ্ট—অন্য কোনও অনুভবের কোনও জায়গা নেই। হঠাৎই আবিষ্কার করলাম রেলিঙের ধারে এসে পড়েছি। তখন শয়তানটাকে পাকড়ে ধরে ছুড়ে ফেলে দিলাম জাহাজের বাইরে। লোকটাকে অস্বাভাবিক হালকা লাগল—যেন স্পঞ্জ বা ফোমের তৈরি। ওর যে শেষ পর্যন্ত কী হল, আতঙ্কে তা আর আমি দেখিনি।

'তারপর আমার পা অবশ হয়ে ভেঙে পড়ল। আমি পড়ে গেলাম ডেকে। ভোরের ধূসর আলো ফোটা পর্যন্ত ওইভাবেই পড়েছিলাম। আমার যে কেন নিউমোনিয়া হয়নি তা-ই এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমি ঠিক ঘুমিয়ে পড়িনি, আবার একেবারে জেগেও ছিলাম না। ভোরবেলা বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টিই বোধহয় আমাকে তাজা করে তুলেছিল। হামাগুড়ি দিয়ে কেবিনে ফিরে এলাম। গ্রিক আর ইটালিয়ান দুটো ষাঁড়ের মতো নাক ডাকাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে শুয়ে পড়লাম বিছানায়—শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। যখন জেগে উঠলাম, দেখি কেবিন খালি। ঘড়িতে বেলা একটা বাজে।'

'তুমি লড়াই করেছিলে কোনও প্রেতকায়ার সঙ্গে।' আমি বললাম।

'কী? জানতাম তুমি ওরকমই কিছু বলবে। সব কিছুরই একটা-না-একটা নাম দিয়ে দাও তুমি। কিন্তু বোসো, আমার গল্প এখনও শেষ হয়নি।'

'আর কী বাকি?'

'যখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম তখনও শরীর ভীষণ দুর্বল। পুরো ব্যাপারটা যে নিছক দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়, সেটা নিজেকে বিশ্বাস করানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে গেলাম ডাইনিং রুমে। তা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? তুমি যেমন এই গোটা কাফেটেরিয়াটাকে তুলতে পারবে না তেমনি আমার পক্ষেও ওই ওয়েটারের ভারি শরীরটা তোলা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, কোনওরকমে টেবিলে গিয়ে বসলাম।

pathagar.net

তখন লাঞ্চের সময়। এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই একজন ওয়েটার আমার কাছে এল—না, আমার সাতজন্মের শত্তুর নয়, অন্য লোক—বেঁটে, রোগাটে, হাসিখুশি। আমাকে মেনু কার্ডটা দিয়ে সে বিনীতভাবে জানতে চাইল, আমি কী চাই। আমার ভাঙা-ভাঙা ফরাসি ভাষায় খোঁজ নিতে চেষ্টা করলাম সেই ওয়েটারটা কোথায়। কিন্তু মনে হল লোকটা আমার কথা বুঝতে পারল না। তবে যাই হোক, সে উত্তর দিল স্প্যানিশ ভাষায়। তখন ইশারায় বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সব বেকার। শেষে মেনু কার্ডের কয়েকটা আইটেম দেখলাম। সঙ্গে-সঙ্গে সে খাবারগুলো নিয়ে এল। ওই জাহাজে সেই প্রথম ভদ্রস্থ খাওয়া জুটল। তারপর থেকে নিউইয়র্কে নোঙর ফেলা পর্যন্ত সে-ই আমার বাঁধা ওয়েটার ছিল। অন্য ওয়েটারটাকে আর দেখতে পাইনি—. যেন সত্যিই ওকে আমি সাগরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। এই হল আমার গোটা গল্প।'

'বড় অদ্ভুত গল্প।'

'এসবের মানে কী বলো তো? আমার ওপরে এত আক্রোশ ছিল কেন? আর প্রেতকায়া মানেই বা কী?'

গুপ্তবিদ্যার নানান বই পড়ে এসব বিষয় সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি শাইকিনকে তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। আমাদের শরীরের ভেতরে আর-একটা শরীর আছে। তার চেহারা হাত-পা সব আমাদের জড় দেহের মতোই, তবে সেটা আধ্যাত্মিক বস্তু দিয়ে তৈরি—আধিভৌতিক আর অলৌকিক জগতের মাঝামাঝি—এক অশরীরী সত্তা। ভৌত জগৎ বা শারীরবৃত্তীয় জগতের সূত্র ইত্যাদি যা আমরা জানি তার চেয়ে ওই সত্তার শক্তি অনেক বেশি। হর্ন-রিম চশমার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল শাইকিন। মুখের ভাবে তীব্র ভর্ৎসনা, আর সামান্য হাসির ছোঁয়া।

'প্রেতকায়া বলে কোনও কিছু নেই। আমি খালি পেটে বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিলাম—ওসব আমার কল্পনার লীলাখেলা।'

'তা হলে ডাইনিং রুমে লোকটাকে আর দেখতে পেলে না কেন?' আমি জিগ্যেস করলাম।

একটা সিগারেটের টুকরো তুলে নিয়ে শাইকিন দেশলাই খুঁজতে লাগল ঃ 'সময়ে-সময়ে ওয়েটারদের ডিউটি বদল হয়। ওঃ, অসুস্থ নার্ভ যে কতরকম খেলা দেখাতে পারে! তা ছাড়া মনে হয়, ক'সপ্তাহ পরে নিউইয়র্কে লোকটাকে আমি দেখেছি। একটা রেস্তোরাঁয় ফোন করার জন্যে ঢুকেছি, দেখি শ্রীমান বসে আছে—অবশ্য যদি সেটা প্রেতকায়া না হয়।'

কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে রইলাম। তারপর শাইকিন বলল, 'আমার ওপরে যে ওর কীসের রাগ ছিল কোনওদিনই আর জানতে পারব না।'

➤ *দ্য এনিমি*

প্রমাণ

হেনরি সিসিল

pathagar.net

সারাটা সন্ধে লন্ডনের সেই আত্মম্ভরী ছোটখাটো চেহারার উকিল ভদ্রলোক সমানে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন এবং তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে আমি প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি। উকিলদের আমি এমনিতেই পছন্দ করি না, তার ওপর এই ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্তিকর এক উদাহরণ। তাঁকে আরও বেশি অপছন্দ হওয়ার কারণ, উপস্থিত আর-সকলেই গভীর মনোযোগে তাঁর কথা শুনছে এবং বলতে গেলে কথাবার্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র তাঁর ওপরেই তুলে দিয়েছে।

লেকল্যান্ড হোটেলের পানশালায় আমরা বসে আছি। হোটেলটা খুব বড় না হলেও আমরা অতি প্রয়োজনীয় ছুটির দিনগুলো কাটাতে এই হোটেলটাকে বেছে নিয়েছি। অন্তত কয়েকটা দিন সারা দেশ ঘুরে এক নতুন প্রাকৃতিক গবেষণা সমিতি প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বিক্রির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সুতরাং, আন্তরিক প্রার্থনা করছিলাম যে, কোনও আকস্মিক ঘটনা এই ব্যস্ত খুদে উকিল ভদ্রলোকের সামনে হাজির হয়ে তাঁর অহঙ্কারকে খর্ব করুক, কিন্তু কার্যত কিছুই হল না। তাঁর কথার স্রোত অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলল।

এমন সময় দুজন আগন্তুক হঠাৎই ভেতরে এসে ঢুকল এবং সকলের মনোযোগ গেল সেদিকে। এই প্রথম ভীষণ স্বস্তি পেলাম। লোক দুটিকে দেখতে খুবই সাধারণ, কিন্তু ভেতরে ঢোকার সময় ওরা বেশ শব্দ করে ঢুকেছে এবং ওদের মুখ আমাদের কাছে অপরিচিত হওয়ায় ওদের প্রবেশ আমাদের আলোচনাকে সেই মুহূর্তে থামিয়ে দিয়েছে। ওরা সোজা এগিয়ে গেল পানশালার দীর্ঘ টেবিলের কাছে, তারপর এক-

এক বোতল বিয়ার নিয়ে নিঃশব্দে পান করতে লাগল। প্রথম বোতল শেষ হলে দ্বিতীয় বোতল এল। দ্বিতীয় বোতল শূন্য হওয়ার পর ওরা যেন একটু সহজ হল। অবশেষে ওদের একজন আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'আমরা গ্রিমস্টোন ক্র্যাগের চুড়ো পর্যন্ত এত কষ্ট করে উঠলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। পুরো সময়টা ফালতু বরবাদ হল।'

ওরা সাধারণ পর্বতারোহী হতে পারে না, কারণ, সেরকম কোনও আরোহী কোনও আরোহণকেই সময় নষ্ট বলে মনে করে না, তা সে বিশেষ কোনও দৃশ্য দেখতে পাক আর না-ই পাক। অতএব ব্যাপারটাকে আমাদের কেউই তেমন আমল দিল না। ভয় পেলাম যে, খুদে উকিল ভদ্রলোক হয়তো আবার তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করবেন। যাই হোক, দ্বিতীয় আগন্তুক এবার বলে উঠল, 'এত কষ্ট করে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বেয়ে ওঠা—পুরো সময়টা নষ্ট হল।'

পানশালার দীর্ঘ টেবিলের শেষ প্রান্ত থেকে একটি ছোটখাটো মানুষ উত্তর দিল, 'সময় নষ্ট কাকে বলে আপনারা জানেন না।'

সকলেই তাকাল বক্তার দিকে। লোকটিকে এতক্ষণ আমিও খেয়াল করিনি।

'সময় নষ্ট—,' সে আবার বলল, 'তা হলে আপনাদের সময় নষ্টের একটা কাহিনি শোনাই—তখন বুঝবেন, আপনাদের পাহাড়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্ত কী সুন্দরভাবেই না কেটেছে।'

কাহিনি শোনানোর আমন্ত্রণ বা উৎসাহের অপেক্ষা না করেই সে বলে চলল ঃ

pathagar.net

ঘটনাটা বেশ কয়েক বছর আগের, এবং ঘটেছিল এই এলাকাতেই। বহুদিন ধরে ফেরার এক অপরাধীকে ধরার জন্যে একজন ডিটেকটিভ তার পিছনে তাড়া করেছিল। যখন সে প্রায় তাকে ধরে ফেলেছে তখন লোকটা রাতের অন্ধকারে ঢুকে পড়ে পাহাড়ি এলাকায়। আকাশে চাঁদের আলো ছিল, এবং ডিটেকটিভও ছিল একরোখা, সুতরাং সেও অনুসরণে ক্ষান্ত দিল না। সৌভাগ্যবশত আকাশের পরদায় অপরাধীর ছায়া-শরীর সে দেখতে পেল এবং অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা বেয়ে উঠে চিৎকার করে লোকটাকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ডিটেকটিভের পা পিছলে গেল। পরিণামস্বরূপ ঈশ্বরের করুণাবশত নিজেকে সে আবিষ্কার করল পায়ের গোড়ালি ভাঙা কিংবা মচকানো অবস্থায় এক সরু পাহাড়ি কার্নিশে। তার ঠিক নীচেই কয়েকশো ফুট গভীর খাদ; আর ওপরে খাড়া পাহাড়। অনুসরণে তাড়াহুড়ো করার জন্যে তার এখন আপশোস হল। সে যখন ভাবছে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে কিনা তখন হঠাৎই সে শুনতে পেল অপরাধী তাকে চিৎকার করে ডাকছে।

'শুনছেন—,' অপরাধী লোকটা বলল, 'আমি একটা দড়ি নিয়ে আসছি।'

এক মুহূর্ত ডিটেকটিভ চুপ করে রইল, তারপর চিৎকার করে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি উইলিয়াম টার্নার?'

'হ্যাঁ।'

'সিডনি ব্লান্টকে খুনের অপরাধে তোমার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে।'

'থাকলেই বা—কী করবেন আপনি?' টার্নার প্রশ্ন করল।

'তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।' ডিটেকটিভ বলল।

'কই, মনে তো হচ্ছে না।' টার্নার বলল।

'শোনো—,' ডিটেকটিভ তখন বলল, 'এখান থেকে আমি নিশ্চয়ই বাঁচতে চাই, তবে আমাকে দড়ি দিয়ে টেনে তোলার আগে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি ঃ তুমি আমাকে টেনে তোলামাত্রই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব।'

'থামুন—' অপরাধী বলে উঠল। শুধুমাত্র খুনের ব্যাপারটুকু ছাড়া তার নীতিজ্ঞানও কিছু কম ছিল না। 'আমি দড়ি আনতে যাচ্ছি'—বলে সে চলে গেল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পর, ডিটেকটিভ যখন তার ফেরার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, অপরাধী ফিরে এল। সেই যে মাঝরাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে পরদিন সকালেও তা থামেনি এবং টার্নার চলে যাওয়ার পর একটি মানুষও ডিটেকটিভের নজরে পড়েনি।

টার্নার চিৎকার করে বলল, 'এখনও বেঁচে আছেন? না থাকলে শুধু-শুধু আমি সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'হ্যাঁ, বেঁচে আছি।' চিৎকার করে জবাব দিল ডিটেকটিভ।

টার্নার বলল, 'আমি এখানে একা—। তার কারণটা আপনি ভালোই জানেন—বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে।'

ডিটেকটিভ কারণটা বুঝল। কিন্তু একইসঙ্গে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, একটা লোক একা কী করে তাকে উদ্ধার করবে—তা সে দড়ি দিয়ে হলেও।

'একটু অপেক্ষা করুন, আমি নামছি—,' বলল টার্নার, এবং নামতে শুরু করল।

pathagar.net

'আপনাদের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে সেই অসুবিধে ও বিপদের বর্ণনা আর দেব না—,' লোকটি বলল, 'তবে এটুকু ধরে নিতে পারেন, আপনাদের কাছেও সে-কাজ এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিত। ঘটনাচক্রে টার্নার কিংবা ডিটেকটিভ, কেউই পর্বতারোহী ছিল না, এবং নিতান্তই আশ্চর্য বলতে হবে, টার্নার শেষ পর্যন্ত ডিটেকটিভের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল। যাই হোক, কিছুক্ষণ পর ডিটেকটিভের কাছাকাছি পৌঁছে সে তার দিকে দড়ি ছুড়ে দিল। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কতখানি তীব্র আর ভয়ঙ্কর ছিল ওদের নিরাপদে উঠে আসার প্রচেষ্টা। ওদের শরীরের এক-এক আউন্স শক্তি ও স্নায়ু তার পেছনে নিয়োজিত হল। অবশেষে, অনেক পরে, ওদের অমানুষিক পরিশ্রম পুরস্কৃত হল এবং নিরাপদ আশ্রয়ে ওরা উঠে এসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যন্ত্রণা ও অবসাদে ডিটেকটিভের প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা, কিন্তু শক্তি সঞ্চয় করে এটুকু সে বলতে পারল, "ধন্যবাদ। আমি

দুঃখিত...'' এবং এই কথা বলে টার্নারকে ধরাশায়ী করার উদ্দেশ্যে তার চোয়াল লক্ষ্য করে এক ঘুসি চালাল সে। ডিটেকটিভ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল, যদি সে এ-কাজ না করে তা হলে টার্নার তার কবল থেকে সহজেই পালিয়ে যাবে। সে তাকে গ্রেপ্তার করবে বলে আগেই সাবধান করে দিয়েছে, এবং একজন আদর্শ ডিটেকটিভের মতো নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে সে বদ্ধপরিকর। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিজ্ঞা পূরণের সাধ থাকলেও প্রয়োজনীয় শক্তি তার ছিল না; টার্নার তার ঘুসিটা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতেই ডিটেকটিভ টলে গেল একপাশে, এবং খাদ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। যেহেতু একই দড়িতে সে ও টার্নার বাঁধা ছিল, সেহেতু টার্নারকেও সে টেনে নিয়ে চলল নিজের সঙ্গে। কয়েকশো ফুট গভীর খাদে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মারা গেল।...আর আপনারা দু-ভদ্রলোক সময় নষ্টের কথা বলছেন!'

'অদ্ভুত কাহিনিই বটে—,' উকিলসাহেব আবার বলতে শুরু করলেন এবং সমস্ত মনোযোগ আবার কেন্দ্রীভূত হল তাঁর দিকে : 'কিন্তু আপনি কি বলতে চান এ-কাহিনি সত্যি?'

'পুরোপুরি সত্যি—' গম্ভীরভাবে জবাব দিল ছোট্ট মানুষটি।

উকিল ভদ্রলোক নাটকীয়ভাবে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মনে হয় আমি নিশ্চিতভাবে আপনাদের কাছে প্রমাণ করতে পারব যে, এই কাহিনি সত্যি হতে পারে না।' একটু থেমে তিনি ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। ছোট্ট মানুষটিকে লক্ষ করে বললেন, 'আপনার কাহিনি থেকে এ সিদ্ধান্ত করলে নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে, ওই দুর্ঘটনার কোনও সাক্ষী ছিল না?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'দুজনেই কি সঙ্গে-সঙ্গে মারা গিয়েছিল?'

'আজ্ঞে, ঠিক ধরেছেন।'

তখন উকিলসাহেব বললেন, 'কেউ তা হলে তাদের মরতে দেখেনি, এবং কাউকে এ-গল্প বলা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেহেতু এ-ঘটনা যে আপনার বর্ণনামতোই ঘটেছে তা আপনার পক্ষে হলফ করে বলা সম্ভব নয়।' একটু থামলেন তিনি। বিজয়ীর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন উপস্থিত দর্শকদের ওপরে।

তারপর তীব্র ব্যঙ্গভরে তিনি যোগ করলেন, 'অবশ্য—যদি না আপনি সেই দুজনের কারও প্রেতাত্মা হয়ে থাকেন—।'

'ঠিক ধরেছেন—' ছোট্ট মানুষটি বলল এবং সকলের চোখের সামনে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ড্রাকুলার অতিথি

ব্র্যাম স্টোকার

pathagar.net

আমাদের যাত্রা যখন শুরু হল তখন মিউনিখের সূর্য উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। আসন্ন গ্রীষ্মের খুশিতে বাতাস ভরপুর। রওনা হতে যাব এমনসময় যে-হোটেলে আমি ছিলাম, তার পরিচালক হের্ ডেলব্রুক গাড়ির কাছে এসে 'শুভ যাত্রা' কামনা করলেন। তারপর জুড়িগাড়ির দরজার হাতলে হাত রেখে কোচোয়ানকে বললেন, 'মনে থাকে যেন, রাত হওয়ার আগেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। আকাশ ঝকঝকে হলেও উত্তুরে বাতাসে কেমন একটা কাঁপুনি দিচ্ছে। হয়তো হঠাৎ করে ঝড় উঠবে। অবশ্য আমি ভালো করেই জানি, দেরি তুমি করবে না,' এবারে উনি একটু হেসে যোগ করলেন, 'কারণ, তুমি তো জানো, আজকের রাতটা কীসের রাত।'

জার্মান ভাষায় জোরালো স্বরে উত্তর দিল জোহান, 'হ্যাঁ স্যার, জানি।' এবং টুপিতে হাত ঠেকিয়ে চকিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

শহরের বাইরে এসেই ওকে থামতে ইশারা করে আমি বললাম, 'বলো দেখি, জোহান, আজ কীসের রাত?'

বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ও, 'ভাল্‌পার্গিসের রাত।' তারপর জার্মান-সিলভারের তৈরি বিশাল এক শালগম-সাইজের সেকেলে ঘড়ি দেখে ও গাড়ি ছুটিয়ে দিল সজোরে, যেন নষ্ট হওয়া সময়টুকু পূরণ করতে চায়। থেকে-থেকেই ঘোড়াগুলো মাথা ঝাঁকিয়ে সন্দেহজনকভাবে বাতাসের গন্ধ শুঁকতে লাগল। আর আমি ভয়ে-ভয়ে চারপাশে দেখতে লাগলাম। রাস্তাটা বেশ ভালোই নির্জন, কারণ আমরা তখন ছুটে চলেছি ঝোড়ো হাওয়ায় ধু-ধু হয়ে যাওয়া উঁচু মালভূমির ওপর দিয়ে।

যেতে-যেতে হঠাৎই একটা রাস্তা আমার নজরে পড়ল। দেখে মনে হল, সচরাচর সেটা ব্যবহার হয় না। একটা ছোট আঁকাবাঁকা উপত্যকার বুক চিরে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে গভীরে। কিন্তু তার আকর্ষণ এতই তীব্র যে, জোহানকে বিরক্ত করার ঝুঁকি নিয়েও ওকে ডেকে বললাম, ওই রাস্তা ধরে যেতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। ও হাজার রকম অজুহাত দেখাতে শুরু করল। কথা বলতে-বলতে ঘন-ঘন ক্রুশ আঁকতে লাগল বুকের ওপর। এতে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। সুতরাং ওকে নানারকম প্রশ্ন শুরু করলাম। ও আত্মরক্ষার কায়দায় উত্তর দিতে লাগল, এবং প্রতিবাদ জানাতে বারবার ঘড়ি দেখতে শুরু করল। অবশেষে আমি বললাম, 'শোনো, জোহান, আমি ওই রাস্তায় যেতে চাই। তোমার ইচ্ছে না থাকলে আমি তোমাকে আসতে জোর করব না; তবে শুধু এটুকু বলো, তুমি কেন যেতে চাও না—।

উত্তরে ও লাফিয়ে নেমে পড়ল নিজের ঘেরা জায়গা ছেড়ে। তারপর কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, যেন আমি না যাই। ওর জার্মান কথার মধ্যে বক্তব্যের মানে বোঝার মতো যথেষ্ট ইংরেজি মিশেছিল। মনে হল, সবসময়ই ও যেন কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে যাচ্ছে—সম্ভবত ভয় পেয়েই; কিন্তু প্রত্যেকবারই ও বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে শুধু বলছে, 'ভাল্‌পার্গিসের রাত।'

আমি ওর সঙ্গে তর্কে নামতে চাইলাম, কিন্তু কারও ভাষা না জানা থাকলে তার সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টাই বৃথা। ফলে আমিও গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। হঠাৎই ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল, বারবার শুঁকতে লাগল বাতাসের গন্ধ। এতে ও ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎই লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে প্রায় ফুটবিশেক এগিয়ে নিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করে জানতে চাইলাম, কেন ও এমনটা করল। উত্তরে ও আবার বুকে ক্রুশ আঁকল এবং কাছেই একটা ক্রুশের দিকে ইশারা করে প্রথমে জার্মান ভাষায়, পরে ইংরেজিতে বলল, 'এখানে সে শুয়ে আছে—নিজেকে যে মেরে ফেলেছে।'

কেউ আত্মহত্যা করলে তাকে চৌরাস্তার মোড়ে কবর দেওয়ার প্রাচীন রীতির কথা আমার মনে পড়ল: 'ও, আত্মহত্যা! আশ্চর্য বটে।'

দুজনে যখন কথা বলছি তখন হঠাৎই শুনতে পেলাম চিৎকার ও গর্জনের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত শব্দ। শব্দটা আসছে বহু দূর থেকে; কিন্তু ঘোড়াগুলো ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ল। ওদের শান্ত করতে জোহানের বেশ সময় লাগল। ফ্যাকাসে মুখে ও বলল, 'মনে হয় নেকড়ের গর্জন—অথচ এ সময়ে এদিকে কোনও নেকড়ে থাকে না।'

এ-কথা বলে ঘোড়াগুলোকে শান্ত করার চেষ্টায় ও যখন আদর করছে, আকাশে শুরু হল কালো মেঘের চঞ্চল আনাগোনা। সূর্যের আলো মুছে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আমাদের গা-ঘেঁষে ছুটে গেল পলকে। এই হাওয়ার ঝলক অনেকটা যেন এক বিপদ-সংকেত। কারণ সূর্য আবার দেখা দিল উজ্জ্বল হয়ে। হাতের আড়াল দিয়ে দিগন্তে চোখ রাখল জোহান, বলল, 'এই তুষার ঝড়...তার আসতে আর দেরি

pathagar.net

নেই।' তারপর ও আবার তাকাল নিজের ঘড়ির দিকে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরে উঠে বসল গাড়ির ঘেরা জায়গায়।

মনে কেমন একটা জেদি ভাব জেগে ওঠায় গাড়িতে না উঠে আমি বললাম, 'এ-রাস্তাটা যেখানে গেছে, সে-জায়গাটার কথা কিছু বলো দেখি—।'

আবার ও বুকে ক্রুশ আঁকল এবং বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল। তারপর উত্তর দিল, 'জায়গাটা খুব খারাপ।'

'কোন জায়গাটা?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওই গ্রামটা।'

'ও—ওদিকে তা হলে একটা গ্রাম আছে?'

'না, না। শ'-শ' বছর ধরে কেউ ওখানে থাকে না।'

আমার কৌতূহল আরও বেড়ে উঠল ঃ 'কিন্তু তুমি যে বললে, ওখানে একটা গ্রাম আছে।'

'এক সময়ে ছিল।'

'তো এখন কোথায়?'

এ-প্রশ্নে জোহান জার্মান ও ইংরেজি মিশিয়ে এক লম্বা গল্প ফেঁদে বসল। ফলে ওর কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু এটুকু আঁচ করলাম যে, বহু শতাব্দী আগে ওখানে অনেক মানুষ মারা গেছে এবং সেখানেই তাদের কবর দেওয়া হয়েছে; তারপরই মাটির নীচে শব্দ শোনা গেছে এবং কবর খুঁড়ে দেখা গেছে যে, মৃত স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই তরতাজা হয়ে বেঁচে আছে; তাদের ঠোঁট রক্তে লাল টুকটুকে। তখন সেখানে জীবিত যে-ক'জন ছিল তারা সকলেই নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যায় অন্যান্য জায়গায়—যেখানে জীবিত মানুষেরা বাস করে, আর মৃত মৃতই, অন্য...অন্য কিছু নয়। শেষ কথা ক'টা বলতে ও স্পষ্টতই বেশ ভয় পেল। ওর মুখ হয়ে গেল সাদা। দরদর করে ঘামছে। কাঁপতে-কাঁপতে চারপাশে দেখছে। যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা এখুনি আবির্ভূত হবে ওর চোখের সামনে। অবশেষে হতাশ যন্ত্রণায় ও চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভাল্‌পার্গিসের রাত।' এবং গাড়ির দিকে ইশারা করে আমাকে উঠে বসতে বলল।

আমার নীল রক্ত এতে যেন জেগে উঠল। এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললাম, 'তুমি ভয় পেয়েছ, জোহান—ভয় পেয়েছ। যাও, বাড়ি যাও; আমি একাই ফিরব। —ভাল্‌পার্গিসের রাতের জন্যে ইংরেজদের কোনও মাথা ব্যথা নেই।'

হতাশার ভঙ্গি করে জোহান ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল মিউনিখের দিকে। লাঠিতে ভর দিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম ওর যাওয়ার পথের দিকে। তারপর হালকা মনে সরু রাস্তাটা ধরে রওনা হলাম জোহানের না-পসন্দ্ উপত্যকার গভীরে। কিন্তু ওর আপত্তির বিন্দুমাত্রও কারণ আমার নজরে পড়ল না; মনে হয়, সময় অথবা দূরত্বের চিন্তা না করে আমি ঘণ্টাদুয়েক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি, এবং একটিও মানুষ কিংবা বাড়ি আমার চোখে পড়েনি। জায়গাটা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, ওটা

pathagar.net

জনমানবহীন নির্জন।

বিশ্রামের আশায় একটু বসলাম, তাকিয়ে দেখলাম চারপাশে। হঠাৎই খেয়াল হল, পথ চলা শুরু করার সময় যেরকম ঠান্ডা ছিল, এখন সেটা তার চেয়ে অনেক বেশি। দীর্ঘশ্বাসের এক অদ্ভুত শব্দ যেন আমাকে ঘিরে রয়েছে। তার সঙ্গে কখনও-সখনও অনেক ওপর থেকে ভেসে আসছে চাপা গর্জন। ওপরে তাকিয়ে নজরে পড়ল আকাশে বিশাল ঘন মেঘের দল উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে অস্থিরগতিতে ভেসে চলেছে। বাতাসে আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত। আমার কেমন যেন শীত করতে লাগল। ভাবলাম, এতক্ষণ হেঁটে আসার পরিশ্রমের পর এখন চুপচাপ বসে রয়েছি, তাই হয়তো শীত করছে। সুতরাং, আবার পথ চলা শুরু করলাম। সময়ের দিকে কোনও খেয়াল না রেখেই আমি পথ চলেছি। ফলে যখন ঘন হয়ে আসা গোধূলির আলো চারিদিকে জাঁকিয়ে বসল, তখনই আমার দুশ্চিন্তা শুরু হল ঃ কী করে পথ চিনে বাড়ি ফিরে যাব? দিনের উজ্জ্বল আলো তখন মিলিয়ে গেছে। বাতাস কনকনে ঠান্ডা। অনেক ওপরে ভেসে যাওয়া মেঘের মিছিল যেন দলে আরও ভারি হয়েছে। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে বহু দূর থেকে কিছু একটা ছুটে আসার শব্দ; আর সেটা ভেদ করে কিছুক্ষণ পরেই ভেসে আসছে এক রহস্যময় চিৎকার—এটাকেই আমার কোচোয়ান নেকড়ের চিৎকার বলেছিল।

তাকিয়ে আছি, হঠাৎই বাতাসে এক ঠান্ডা কাঁপুনি খেলে গেল, এবং শুরু হল তুষারপাত। পেরিয়ে আসা মাইলের পর মাইল গাছপালাহীন নির্জন পথের কথা আমার মনে পড়ল। সুতরাং আশ্রয়ের খোঁজে দ্রুত পায়ে সামনের জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। আকাশ ক্রমে আরও কালো হয়ে উঠল। বরফ পড়তে লাগল আরও ঘন হয়ে, আরও জোরে—অবশেষে এক সময় আমার সামনেও চারপাশের মাটি এক চকচকে সাদা গালিচা হয়ে উঠল। গালিচার শেষ প্রান্ত মিলিয়ে গেছে দূরের অস্পষ্ট কুয়াশায়। ক্রমে বাতাসের গতি বেড়ে উঠল। বেড়ে উঠল ঝোড়ো হাওয়া। তখন আমি বাধ্য হয়ে বাতাস ঠেলে ছুটতে শুরু করলাম। ক্ষণে-ক্ষণেই আকাশকে চিরে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ, আর সেই আলোয় নজরে পড়ল, আমার ঠিক সামনেই ঘন তুষারে ঢাকা ইউ ও সাইপ্রেস গাছের গায়ে-মাখামাখি জটলা।

অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সেই গাছপালার আশ্রয়ে। সেই অপেক্ষাকৃত নিঝুম জায়গায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম অনেক উঁচুতে ছুটে যাওয়া বাতাসের শনশন শব্দ। দেখতে-দেখতে ঝোড়ো অন্ধকার মিশে গেল রাতের অন্ধকারে। ক্রমে-ক্রমে মনে হল, ঝড় শান্ত হয়ে আসছে, এখন মধ্যে-মধ্যে শুধু শোনা যাচ্ছে দুরন্ত হাওয়ার ঝটকা। সেই মুহূর্তে নেকড়ের অপার্থিব চিৎকার আমার চারদিকে যেন হাজারো প্রতিধ্বনি তুলল।

কখনও-কখনও অলসভাবে ভেসে যাওয়া ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে বিক্ষিপ্ত চাঁদের আলো। সেই আলোয় দেখলাম, আমি সাইপ্রেস ও ইউ গাছের এক ঘন জটলার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। তুষারপাত থেমে যাওয়ায় আমি আশ্রয়

pathagar.net

ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং জায়গাটা আরও খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। মনে হল, যেসব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আমার চোখে পড়ছে তার মধ্যে একটা বাড়ি জীর্ণ হলেও এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং সেখানে হয়তো আমি কিছুক্ষণের জন্যে আশ্রয় পেতে পারি।

ঝোপঝাড়ের কিনারা ঘুরে এগিয়ে যেতেই আবিষ্কার করলাম একটা নিচু দেওয়াল বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে, এবং সেই দেওয়াল অনুসরণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেতরে ঢোকার সরু পথ খুঁজে পেলাম। এটুকু নজরে পড়ামাত্রই ভেসে যাওয়া মেঘ চাঁদকে আড়াল করে দিল; কিন্তু সামনেই আশ্রয়ের হাতছানি, অতএব আমি অন্ধের মতো হাতড়ে এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ এক নিস্তব্ধতার মুখোমুখি হয়ে আমি থমকে দাঁড়ালাম। ঝড় থেমে গেছে; এবং সম্ভবত নিঃশব্দ স্তব্ধ প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিবশে আমার হৃৎপিণ্ডও যেন তার স্পন্দন বন্ধ করেছে। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে; কারণ, হঠাৎই মেঘ চিরে এসে পড়ল চাঁদের আলো। আমাকে জানিয়ে দিল যে, আমি এক কবরখানায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার সামনেই যে-চৌকো স্তূপটা রয়েছে সেটা বিশাল এক সমাধি-প্রস্তর ঃ ওটার ওপরে ও চারপাশে ছড়িয়ে থাকা তুষারের মতোই শুভ্র তার রং। চাঁদের আলোর হাত ধরে ভেসে এল ঝড়ের এক ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস, এবং অসংখ্য কুকুর অথবা নেকড়ের মতো চাপা একটানা গর্জন করে সে যেন তার পুরোনো তোলপাড় আবার শুরু করল। এক অদ্ভুত আকর্ষণে আমি এগিয়ে চললাম মার্বেল পাথরের তৈরি সেই সমাধির দিকে। দেখতে হবে ওটা কার, এবং কেনই বা এইরকম একটা জায়গায় এইরকম একটা জিনিস একা-একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওটার চারপাশে ঘুরে অবশেষে ডরিস দেশিয় দরজার ঠিক ওপরে জার্মান ভাষায় লেখা কথাগুলো পড়তে পারলাম ঃ

স্টাইরিয়ার গ্রাৎস্-এর কাউন্টেস ডলিংগেন
প্রার্থিত মৃত্যুকে পেয়েছেন
১৮০১ সাল

সমাধি-প্রস্তরের ঠিক ওপরে নিরেট পাথরে যেন পুঁতে দেওয়া হয়েছে এক বিশাল লোহার গজাল কিংবা শূল। ওটার পিছন দিকে যেতেই নজরে পড়ল বড়-বড় রুশ হরফে খোদাই করা রয়েছে ঃ

মৃতেরা দ্রুত চলে

পুরো ব্যাপারটায় এমন একটা অপার্থিব গা-ছমছমে আমেজ ছিল যে, আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। যেন তখুনি অজ্ঞান হয়ে যাব। এই প্রথম মনে হল যে, জোহানের উপদেশ শুনলেই বোধহয় ভালো ছিল। হঠাৎই একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল; এই রহস্যময় পরিস্থিতিতে আকস্মিক আঘাতের মতোই সেটা ঝলসে উঠল ঃ আজকের রাত 'ভাল্‌পার্গিসের রাত।'

ভাল্‌পার্গিসের রাত। লক্ষ-লক্ষ লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী যে-রাতে শয়তান যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়—সমস্ত কবর খুলে যায়, মৃতেরা বেরিয়ে আসে বাইরে, চলে বেড়ায়। যে-রাতে জল, স্থল, অন্তরীক্ষের সমস্ত অশুভ জিনিস আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। আমার সমস্ত দর্শন, শেখা সমস্ত ধর্ম, সমস্ত সাহস এক জায়গায় জড়ো করলাম, যেন অন্ধ আতঙ্কে ভেঙে না পড়ি।

এবার এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ফুঁসে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। মাটি এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন হাজার-হাজার ঘোড়া দুদ্দাড় করে তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে; এইবার তুষার নয়, বিরাট আকারের সব শিলাপিণ্ড দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল এবং তার আঘাতে গাছের ডালপালা-পাতা সব খসে পড়তে লাগল। ফলে আমি ব্যস্ত পায়ে রওনা হলাম আশ্রয় দিতে পারে এমন এক এবং একমাত্র জায়গা লক্ষ্য করে ঃ সমাধি-প্রস্তরের গভীর ডরিসীয় দরজা। বিশাল ব্রোঞ্জের দরজার গায়ে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে মুষলধারে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পেলাম।

কিন্তু দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই ওটা সামান্য নড়ে উঠল এবং খুলে গেল ভিতরদিকে। এই নিষ্ঠুর ঝড়ের মুখে কোনও সমাধির আশ্রয়ও অনেক বেশি সুখের। কিন্তু যেই আমি ভেতরে ঢুকতে যাব, ঠিক তক্ষুনি অসংখ্য রেখায় আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠে সারা আকাশে আলোর রোশনাই জ্বালিয়ে দিল। সেই মুহূর্তে সমাধির অন্ধকারে চোখ ফিরিয়ে স্পষ্ট দেখলাম, একটা শবাধারে ঘুমিয়ে আছে ভারি গাল ও টুকটুকে লাল ঠোঁট এক সুন্দরী মহিলা—আমি যেমন বেঁচে আছি, এ-দৃশ্য তেমনই সত্যি। বজ্রপাতের শব্দটা আকাশে ভেঙে পড়তেই যেন এক দানবের হাত আমাকে চেপে ধরে বাইরের বিক্ষুব্ধ ঝড়ের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল। সমস্ত ঘটনাটা এত আকস্মিকভাবে ঘটল যে, মানসিক ও শারীরিক আঘাত পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই টের পেলাম অসংখ্য শিলাপিণ্ড তোড়ে আছড়ে পড়ছে আমার ওপরে। একইসঙ্গে এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন করা অনুভূতি যেন আমাকে বলে দিল, আমি একা নই। এবার চোখ ফেরালাম সমাধির দিকে। সেই মুহূর্তেই দেখা গেল চোখ-ধাঁধানো এক আলোর ঝলকানি। সেটা আঘাত করল সমাধির ওপরে গাঁথা লোহার শূলের ওপর, তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মার্বেল পাথর চুরমার করে আগুনের তাণ্ডব ধরিয়ে যেন সরাসরি ঢুকে গেল মাটিতে। এক যন্ত্রণাময় মুহূর্তের জন্যে উঠে দাঁড়াল সেই মহিলা। আগুনের শিখা তাকে জড়িয়ে লকলক করে জ্বলছে, এবং তার মৃত্যু-যন্ত্রণার আর্ত চিৎকার বজ্রপাতের শব্দে ডুবে গেল। শেষ যা শুনতে পেলাম, তা হল এইসব ভয়ঙ্কর শব্দরোলের মিশ্রণে জন্ম নেওয়া এক বিচিত্র শব্দ। কারণ, ততক্ষণে সেই দৈত্যের হাত আবার আমাকে বজ্রমুষ্ঠিতে আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। শেষ যে-দৃশ্য মনে আছে তা হল, অস্পষ্ট সাদা এক চলমান স্তূপ—যেন চারপাশের সমস্ত সমাধি তাদের আচ্ছাদিত মৃতদেহের প্রেতাত্মাগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে, এবং তারা দুরন্ত শিলাবৃষ্টির সাদা ধোঁয়াশা ভেদ করে আমাকে ক্রমশ ঘিরে ধরছে।

pathagar.net

ধীরে-ধীরে অস্পষ্টভাবে চেতনা ফিরে আসতে লাগল। তারপর এক গভীর ক্লান্তির অনুভূতি টের পেলাম। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কিছুই মনে করতে পারলাম না; তারপর আস্তে-আস্তে চেতনা ফিরে এল। আমার পা দুটোয় যেন অসহ্য অস্থির যন্ত্রণা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ওদের এক চুল নড়াতে পারছি না। পা দুটো যেন অসাড় হয়ে গেছে। আমার ঘাড়ে এক বরফশীতল স্পর্শ, আর মেরুদণ্ড, কান, সব যেন আমার পায়ের মতোই মৃত, অথচ তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির; কিন্তু আমার বুকে এক অদ্ভুত উষ্ণ স্পর্শ তৃপ্তির স্বাদ এনে দিচ্ছে। এ যেন এক দুঃস্বপ্ন—সঠিক বলতে গেলে, এক বাস্তব দুঃস্বপ্ন, কারণ, আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে উঠছে।

এক অগাধ স্তব্ধতা আমাকে ঘিরে ধরল। যেন সারাটা পৃথিবী ঘুমে অচেতন কিংবা মৃত—শুধু থেকে-থেকে শোনা যাচ্ছে, আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও জন্তুর চাপা হাঁপানির শব্দ। গলায় টের পেলাম এক উষ্ণ কর্কশ স্পর্শ। তারপর ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি হলাম। আমার হৃৎপিণ্ড যেন বরফে জমে গেল। রক্তের জোয়ার ছুটে গেল মস্তিষ্কের শিরায়-শিরায়। একটা বিশাল জন্তু আমার শরীরের ওপর বসে আমার গলা চাটছে। চোখের ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে দেখলাম, আমার মুখের সামনেই এক প্রকাণ্ড নেকড়ের দুটো জ্বলন্ত চোখ। হাঁ-করা লাল মুখে ধারালো সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে, আর ওটার গরম ঝাঁজালো নিশ্বাস আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি।

আরও কিছু সময়ের জন্যে আমার স্মৃতিশক্তি অচল হল। তারপর শুনতে পেলাম একটা চাপা গর্জন। পরক্ষণেই এক চিৎকার—একবার, দুবার, বারবার। তারপর যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসা সমবেত কণ্ঠে শুনতে পেলাম, 'হ্যালো! হ্যালো!' অতি সাবধানে মাথা তুলে শব্দ লক্ষ্য করে তাকালাম। সমাধিক্ষেত্র আমার দৃষ্টি আড়াল করল। নেকড়েটা তখনও অদ্ভুতভাবে চিৎকার করছে, এবং একটা লাল আভা সাইপ্রেস কুঞ্জে চলে-ফিরে বেড়াতে লাগল—যেন শব্দটাকে অনুসরণ করছে। কণ্ঠস্বরগুলো আরও কাছে আসতেই নেকড়েটার গর্জন আরও দ্রুত, আরও জোরালো হয়ে উঠল। সাড়া দিতে বা নড়াচড়া করতে আমি ভয় পেলাম। তারপর ঘিরে থাকা গাছের আড়াল থেকে শোনা গেল একদল ঘোড়সওয়ারের ঘোড়া ছুটিয়ে আসার শব্দ—তাদের হাতে জ্বলন্ত টর্চ। নেকড়েটা আমার বুক ছেড়ে উঠে পড়ল, রওনা হল সমাধিস্থলের দিকে। একজন ঘোড়সওয়ারকে (টুপি ও লম্বা কোট দেখে ওদের সৈনিক বলেই মনে হল) দেখলাম বন্দুক তুলে তাক করছে। অন্য একজন তার কনুইয়ের তলায় ঠেলা মারল, গুলিটা শিস দিয়ে আমার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে নিশ্চয়ই আমাকে নেকড়ে বলে ভুল করেছে। চুপিসাড়ে পালিয়ে যাওয়া জন্তুটাকে আর-একজন দেখতে পেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল গুলির শব্দ। তারপর দু-চার কদমেই ঘোড়সওয়ারের দল কাছে এসে গেল—কেউ এল আমার কাছে, আর কেউ গেল বরফে সাজানো সাইপ্রেস গাছের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নেকড়েটাকে অনুসরণ করতে।

ওরা কাছে আসতেই আমি নড়াচড়া করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু শক্তি খুঁজে পেলাম না। অথচ আমার চারপাশে যা-যা হচ্ছে তার সবই দেখতে পাচ্ছি, শুনতে

পাচ্ছি। দু-তিনজন সৈনিক ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল আমার পাশে। একজন আমার মাথা তুলে ধরল, আমার বুকে হাত রাখল।

'ভালো খবর, কমরেড!' সে চিৎকার করে উঠল, 'ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন।'

তারপর কিছুটা ব্র্যান্ডি আমার গলায় ঢেলে দেওয়া হল ; শরীরে যেন শক্তি ফিরে এল। এবার চোখ পুরোপুরি মেলতে পারলাম; তাকালাম চারদিকে। গাছের সমারোহে আলো ও ছায়া চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। শুনতে পেলাম, লোকজন চিৎকার করে পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে। ভয়ার্ত চিৎকারে বিস্ময় প্রকাশ করতে-করতে ওরা ক্রমে এক জায়গায় জড়ো হল; ভূতে পাওয়া মানুষের মতো অন্যান্যরা কবরখানার গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এল; টর্চের আলো ঝলসে উঠতে লাগল ক্ষণে-ক্ষণে। দূরের লোকজন সবাই যখন কাছে চলে এল তখন আমাকে ঘিরে থাকা লোকেরা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করল, 'কী হল, ওটাকে পাওয়া গেল?'

উত্তর পাওয়া গেল ঝটিতি, 'না! না। শিগগির চল—জলদি! এ-জায়গায় থাকা ঠিক নয়—বিশেষ করে আজকের রাতে!'

'ওটা কী ছিল?' একাধিক সুরে ধ্বনিত হল এই প্রশ্ন। উত্তর পাওয়া গেল বিভিন্ন এবং অস্পষ্ট—যেন সবাই এক বিশেষ আবেগে কথা বলতে চাইছে, অথচ কী এক আতঙ্কে নিজের জিভের রাশ টেনে ধরছে।

'ওটা—ওটা—একটা—' দিশেহারা চিন্তা নিয়ে তোতলা স্বরে বলতে চাইল একজন।

'একটা নেকড়ে—অথচ নেকড়েও ঠিক নয়!' শিউরে উঠে বলল আর-একজন।

'পবিত্র গুলি ছাড়া ওটাকে কিছু করা সম্ভব নয়,' স্বাভাবিক সুরে মন্তব্য করল তৃতীয় কোনও ব্যক্তি।

'এ-রাতে যেমন বেরিয়েছি, তেমনি উচিত শিক্ষা হয়েছে। আমাদের হাজার মার্ক আমরা সত্যি খেটে উপায় করেছি।' চতুর্থ জনের মুখ ফুটে বেরিয়ে এল।

'ভাঙা মার্বেল পাথরের ওপরে রক্ত ছিল,' আর-একজন বলল, 'সেটা তো আর বজ্রপাত থেকে আসেনি। আর এই ভদ্রলোক—এঁর আর কোনও ভয় নেই তো? গলাটা একবার দেখ! দেখ, কমরেড, নেকড়েটা এই ভদ্রলোকের গায়ের ওপরে শুয়ে এঁর রক্ত গরম রেখেছে।'

অফিসারটি আমার গলার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, 'ভদ্রলোকের আর কোনও ভয় নেই; চামড়ায় কোনও ক্ষত হয়নি। এসবের মানে কী? নেকড়েটার চিৎকার না শুনলে আমরা ওঁকে খুঁজেই পেতাম না।'

'নেকড়েটার কী হল?' আমার মাথাটা যে তুলে ধরেছিল সে জিগ্যেস করল।

'ওটা নিজের আস্তানায় ফিরে গেছে,' লম্বাটে বিবর্ণ মুখে লোকটি উত্তর দিল, আতঙ্কে সে কাঁপছে ঃ 'এখানে অনেক কবর রয়েছে, তারই একটায় হয়তো ওটা থাকে।

pathagar.net

এসো, কমরেড—জলদি চলো—এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে আমরা চলে যাই।'

অফিসারটি আমাকে বসানোর ভঙ্গিতে তুলে ধরল। আদেশের সুরে কী যেন বলল। তখন কয়েকজন মিলে আমাকে বসিয়ে দিল ঘোড়ার পিঠে। সে লাফিয়ে উঠে বসল আমার পেছনে, আমাকে জড়িয়ে ধরল দু-হাতে। তারপর সবাইকে এগোতে নির্দেশ দিল। অতএব সাইপ্রেস গাছের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা সামরিক শৃঙ্খলায় দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম।

আমার জিভ তখনও বিদ্রোহ করায় আমি চুপ করে থাকতে বাধ্য হলাম। নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; কারণ, পরের যে-ঘটনা মনে আছে তা হল : আমি দাঁড়িয়ে আছি। দুপাশে দুজন সৈনিক আমাকে ধরে রেখেছে। চারিদিকে প্রায় উজ্জ্বল দিনের আলো, আর উত্তর দিকে সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয়েছে এক লাল রেখা ঃ আনকোরা তুষারের ওপর যেন রক্ত ঢেলে তৈরি এক পায়ে চলার পথ। অফিসার তখন অন্যান্যদের বলছে যে, তারা যা দেখেছে তা যেন কাউকে না বলে—শুধু যেন বলে যে, একজন অজ্ঞাতপরিচয় ইংরেজকে পাওয়া গেছে—আর একটা বিরাট কুকুর তাকে পাহারা দিচ্ছিল।

'কুকুর! ওটা তো কুকুর ছিল না,' সবচেয়ে ভয় পাওয়া মানুষটা বাধা দিয়ে বলল, 'নেকড়ে দেখলে আমার চিনতে ভুল হয় না।'

তরুণ অফিসার শান্ত স্বরে জবাব দিল, 'আমি বলছি কুকুর।'

'কুকুর!' ব্যঙ্গভরে পুনরাবৃত্তি করল অন্যজন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সূর্যের তেজের সঙ্গে-সঙ্গে তার সাহসও বাড়ছে, তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'ভদ্রলোকের গলাটা দেখুন। ওটা কি কোনও কুকুরের কাজ, স্যার?'

সহজাত প্রবৃত্তিবশে আমি হাত দিলাম গলায়। সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। দেখার জন্যে ওরা আমাকে ঘিরে ধরল, কেউ-কেউ তাদের জিন থেকে ঝুঁকে পড়ল। আর তখনও আবার শোনা গেল তরুণ অফিসারের কণ্ঠস্বর ঃ 'আমি যা বললাম—কুকুর। এ ছাড়া অন্যকিছু বলতে গেলে সবাই আমাদের কথায় হাসবে।'

এরপর আর-একজন অশ্বারোহী সৈনিকের ঘোড়ায় আমাকে তুলে দেওয়া হল এবং আমরা মিউনিখের শহরতলি অঞ্চলে ঢুকে পড়লাম। সেখানে হঠাৎই একটা জুড়িগাড়ি দেখতে পেয়ে আমাকে সেটাতে তুলে দেওয়া হল। গাড়ি ছুটে চলল আমার হোটেলের দিকে। তরুণ অফিসারটি আমার সঙ্গী হল, আর একজন সৈনিক ঘোড়ায় চড়ে আমাদের অনুসরণ করল। বাকিরা ফিরে গেল তাদের ব্যারাকে।

আমরা পৌঁছতেই হের্ ডেলব্রুক এত তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন যে, স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি মনে-মনে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। অফিসারটি আমাকে অভিবাদন করে যখন বিদায় নিতে চলেছে, তখন আমি তাকে এবং তার সাহসী কমরেডদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। সে খুব সহজ গলায় উত্তর দিল যে, সে ভীষণ খুশি হয়েছে, এবং অনুসন্ধানকারী দলকে তুষ্ট করার জন্যে হের্ ডেলব্রুক আগেই সব ব্যবস্থা করেছেন। এই হেঁয়ালি-ভরা কথায় হোটেল পরিচালক

pathagar.net

হাসলেন, এবং অফিসারটি কাজের ওজর দেখিয়ে বিদায় নিল।

'কিন্তু হের্ ডেলব্রুক,' আমি জানতে চাইলাম, 'সৈন্যদলের লোকেরা আমাকে কী করে, আর কেনই বা খুঁজতে গেল?'

নিজের কাজের জন্যে যেন লজ্জায় কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। তারপর উত্তর দিলেন, 'আমার ভাগ্য ভালো যে, আমার দলের সেনাপতির কাছ থেকে ছুটি পেয়েছি এবং অনুসন্ধানের জন্যে স্বেচ্ছাসৈনিকের দল চাইতে পেরেছি।'

'কিন্তু কী করে জানলেন যে, আমি পথ হারিয়েছি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কোচোয়ান তার ভাঙাচোরা গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছিল। ঘোড়াগুলো পালিয়ে যাওয়ার পর তার গাড়ি উলটে যায়।'

'কিন্তু শুধু এই কারণেই তো সেনাবাহিনীর অনুসন্ধানী দল পাঠানো যায় না।'

'না, না!' তিনি উত্তর দিলেন, 'আসলে কোচোয়ান আসার আগেই আপনি যাঁর অতিথি সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে এই খবরটা আমি পাই,' বলে পকেট থেকে একটা তার এগিয়ে দিলেন। আমি পড়লাম ঃ

বিয়াত্রিজ,

আমার অতিথি সম্পর্কে সাবধান—তাঁর নিরাপত্তা আমার কাছে অমূল্য। তাঁর যদি সামান্য কিছুও হয়, বা তিনি হারিয়ে যান, তা হলে তাকে খুঁজে বের করে নিরাপত্তা অটুট রাখতে চেষ্টার ত্রুটি রাখবেন না। ভদ্রলোক ইংরেজ, ফলে ভ্রমণবিলাসী। তুষার, নেকড়ে ও অন্ধকার রাত প্রায়ই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যদি তাঁর বিপদের সামান্যতম আভাসও পান একটা মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। আপনার উৎসাহ ও প্রচেষ্টার যথাযথ উত্তর আমার ঐশ্বর্য দেবে।

—ড্রাকুলা

pathagar.net

তারটা হাতে নিয়ে মনে হল ঘরটা আমার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। তৎপর হোটেল পরিচালক যদি আমাকে ধরে না ফেলতেন, তা হলে হয়তো আমি পড়েই যেতাম। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই কেমন একটা অদ্ভুত জিনিস রয়েছে। সেটা এতই অপার্থিব যে, কল্পনা করা দুঃসাধ্য। আমি যেন বিপরীত শক্তির হাতে এক খেলনা হয়ে গিয়েছিলাম —এই চিন্তার আভাসটুকুই আমাকে অসাড় ও পঙ্গু করে দিল। নিঃসন্দেহে আমি এক রহস্যময় নিরাপত্তার আশ্রয়ে ছিলাম। এক দূর দেশ থেকে ঠিক সঙ্কটজনক মুহূর্তে এসেছে এক তারবার্তা, তুষারঘুম ও নেকড়ের দাঁত থেকে বাঁচিয়ে আমাকে বিপদমুক্ত করেছে।

ওভারকোট

এ. ই. ডি. স্মিথ

pathagar.net

আমি জানি, অফিসের অন্যান্য সব কর্মী আমাকে পাগল ভাবে। তা তো ভাববেই, কারণ, ঘটনাচক্রে আমি পড়াশোনা ভালোবাসি, গন্ডগোল অপছন্দ করি, কতকগুলো শূন্যগর্ভ সঙ্গীসাথীর চেয়ে নিজের সঙ্গ বেশি পছন্দ করি, এবং সর্বোপরি চোখে আমার পুরু লেন্সের চশমা। সুতরাং এ ধরনের একজন মানুষ যে নিকৃষ্টতর বিচার-বুদ্ধির শিকার হবে এ আর আশ্চর্য কী! সাধারণত তাদের মতামত ও মন্তব্যকে আমি অবজ্ঞার চোখে দেখি—তাই দেখা উচিত, কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে আমার ক্রমশ মনে হচ্ছে, হয়তো ওদের কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'পাগল' হয়তো আমি না হতে পারি, তবে আমি যে একটি প্রথম শ্রেণির গর্দভ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা যদি না হতাম, তা হলে দুনিয়ার আর সবার মতো সুন্দর আরামে ছুটির দিনগুলো কাটিয়ে দিতাম; একা-একা মূর্খের মতো সাইকেল নিয়ে ফ্রান্সের অজানা অংশে পাড়ি দিতাম না।

বৃষ্টিতে ভিজে নেয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পথ হারিয়ে বসে আছি; অজানা দেশে এক অজানা আগন্তুক; ফাটা টায়ার সমেত মালবোঝাই এক সাইকেল নিয়ে হতাশভাবে এগিয়ে চলেছি; আমার গর্দভ-সুলভ সিদ্ধান্তের এই হল পরিণতি। ঝড়ের কবলে যখন পড়ি তখন আমি লোকালয় থেকে অনেক দূরে এক কাঁচা রাস্তায়; আর তারপর মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে দু-ঘণ্টা পথ চলেছি। পথে কোনও জীবিত প্রাণীর দেখা পাইনি, বা কোনও জনবসতিও চোখে পড়েনি।

অবশেষে, একটা মোড় ঘুরেই দেখি আমার ঠিক সামনেই একটা মাঝারি

মাপের বাড়ির চিমনি ও ছাদের খাঁজ কাটা পাঁচিল। নির্জন বাড়িটা রাস্তা থেকে কিছুটা পেছিয়ে একরাশ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে, এবং কেন জানি না, দূর থেকেও ওটা কাউকে কাছে আসতে তেমন হাতছানি দেয় না। কিন্তু তবুও নির্জন কোনও প্রান্তরে এ-দৃশ্য আশা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং, সামান্য আদর-আপ্যায়ন ও সাময়িক আশ্রয়ের লোভে তাড়াতাড়ি সেদিকে পা চালালাম। প্রায় দুশো গজ চলার পর এসে দাঁড়ালাম বাড়িটার সদর দরজার কাছে। সেখানে পৌঁছে ভয়ঙ্কর রকম হতাশ হলাম; কারণ, দরজার ওপারে দারোয়ানের ঘরের মাথায় কোনও চাল নেই, ভাঙাচোরা সদর দরজার পাল্লা দুটো একটা কবজায় ঝুলছে, এবং দরজা থেকে যে-পথটা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে সেটা আগাছায় ভরা ঃ সব মিলিয়ে স্পষ্ট বুঝলাম, এখানে কেউ থাকে না।

মনকে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, বর্তমান অবস্থায় একটা পরিত্যক্ত বাড়িকেও আশ্রয় হিসেবে অবহেলা করা উচিত নয়। মোটামুটি একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে আমার জামাকাপড়গুলো নিংড়ে নেওয়া যাবে এবং ত্রিভঙ্গ সাইকেলটাও হয়তো সারিয়ে তোলা যাবে। সুতরাং, আর ভাবনা-চিন্তা না করে সাইকেল ঠেলে এগিয়ে চললাম আগাছা ভরা পথ ধরে; পৌঁছলাম বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নীচে। কাছে এসে বুঝলাম, এটা একটা পুরোনো জমিদার-বাড়ি। বুনো লতা আর আগাছার দল বহু আগেই রাজত্ব বিস্তার করেছে। সদর দরজার ঠিক ওপরে পাথরে খোদাই করা জমিদারদের বংশমর্যাদার নিদর্শনখচিত একটা পোশাক। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বাড়ির মালিক একজন কেউকেটা ছিলেন। এ ছাড়া দরজার দুপাশে বেদির ওপরে বসানো মরচে পড়া কিছু অস্ত্র-শস্ত্র ঃ সম্ভবত, সুদূর অতীতে বাড়ির গৃহস্বামী অংশ গ্রহণ করেছেন এমন কোনও যুদ্ধের নিদর্শন। বেশিরভাগ জানলাই কাঠের তক্তায় ঢাকা। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বহুকাল ধরেই এ বাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সদর দরজাটা খুলতে চেষ্টা করলাম। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, দরজাটা খোলা। আমার কাঁধের এক ধাক্কায় বিরক্তভাবে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে ওটার পাল্লা খুলে গেল। বিশাল হলঘরে পা রাখতেই পচা কাঠ, গালিচা এবং ঝুলন্ত স্যাঁতসেঁতে ছাতার বাসি দুর্গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারল। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে চারপাশে তাকালাম। কোনও প্রাচীন পরিত্যক্ত বাড়িতে ঢুকলে সাধারণত যে-আতঙ্ক মনে নাড়া দেয় তার ঢেউ খেলে গেল বুকের ভেতরে। আমার সামনেই এক চওড়া সিঁড়ি, তার মাথায় ছোপ-ধরা লম্বা কাচের জানলা। ধুলো, ময়লা ও মাকড়সার জালে তার শার্সি এখন প্রায় অস্বচ্ছ।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। উঠেই সামনেই যে-দরজাটা পেলাম সেটা এক ঝটকায় খুলতেই চোখে পড়ল সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো একটা বড় ঘর। এককালে এটাই হয়তো এ-বাড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘর ছিল, কিন্তু দীর্ঘকালের অযত্ন ও উপেক্ষায় তার অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। সুসজ্জিত ফিতের মতো কার্নিশের ছোট-ছোট টুকরো এখানে-ওখানে ঝুলছে। ঘরের এক কোণে সিমেন্টসমেত ছাদ খসে পড়েছে মেঝেতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সব আসবাবপত্র সবুজ ছাতায় ঢেকে গেছে; পরদা ও

জামাকাপড় জীর্ণ অবস্থায় ঝুলছে; এবং ঘরের দরজা থেকে তাপচুল্লি পর্যন্ত যে-সুন্দর প্রাচীন পার্শি গালিচা পাতা রয়েছে তার অর্ধেকটা ফাঙ্গাসে ঢাকা।

তাপচুল্লিটা দেখে একটা মতলব মাথায় এল। যদি কিছু জ্বালানির সন্ধান পাই তা হলে চুল্লিতে আগুন জ্বালানো যেতে পারে, গরম পানীয় তৈরি করতে পারি নিজের জন্যে, এবং আমার ভিজে জামাকাপড়ও শুকিয়ে ফেলা যাবে।

বাড়ির আশেপাশে সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই যথেষ্ট পরিমাণ শুকনো ডালপালা পাওয়া গেল। তারই একটা বান্ডিল কোটের তলায় ঢুকিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এলাম। দ্রুত পায়ে উঠে চললাম সিঁড়ি বেয়ে, কিন্তু বড় ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে কেন জানি না থমকে দাঁড়ালাম। যেন আমার পা দুটো হঠাৎই নিজের খেয়ালে আমাকে ঘরের ভেতরে আর বয়ে নিয়ে যেতে চাইছে না—যেন বাইরে থেকে কোনও কিছু আমাকে ফিরে যেতে বলছে।

শুকনো ডালপালাগুলো পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলাম। এবং মুহূর্ত কয়েক দ্বিধাগ্রস্তভাবে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইলাম। জায়গাটার পরিবেশে বিপদের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় প্রতিটি জিনিস যে-অবস্থায় দেখে গেছিলাম আপাতদৃষ্টিতে সেগুলো এখন একই অবস্থায় আছে; কিন্তু তবুও একটা অদ্ভুত অস্বস্তি আমার মনকে ঘিরে ধরল ঃ আমার অনুপস্থিতিতে অশুভ কোনও কিছু এ-ঘরে ঢুকেছে এবং পরে আবার বেরিয়ে গেছে।

আমি ভিতু নই। অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসও করি না; কিন্তু তা সত্ত্বেও, এক মুহূর্ত পরেই লজ্জাজনকভাবে আবিষ্কার করলাম, আমি ডালপালাগুলো তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে চলেছি। সত্যি বলতে কি, আমার এ অদ্ভুত আচরণের কারণ ভয় নয়—বরং এক অস্বস্তিকর সাবধানী অনুভূতি। কেন যেন মনে হল, যদি আমি সদর দরজার কাছাকাছি থাকি, এবং একতলায় কোনও ঘরে আগুন জ্বালি, তা হলে হয়তো অনেকটা স্বস্তি পাব। কারণ, যদি কোনও—ইয়ে, অদ্ভুত কিছু ঘটে—জানি, এ হয়তো উদ্ভট কল্পনা —আর আমাকে হঠাৎই পালাতে হয়, তা হলে তাতে অনেক সুবিধে হবে।

সদর দরজা দিয়ে ছিটকে আসা আলোকে মুখোমুখি রেখে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয়বার নামার সময় আচমকা এমন একটা ব্যাপার আমার নজরে পড়ল যে, চকিতে থমকে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির মাঝবরাবর পুরু ধুলোর ওপর সদ্য তৈরি হওয়া এক ভাঙা-ভাঙা চওড়া দাগ; যেন কেউ একটা খালি বস্তা বা ওই জাতীয় কিছু সিঁড়ির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে!

সিঁড়ির নীচে নেমে দাগটাকে অনুসরণ করে চললাম। দেখলাম, দাগটা গিয়ে শেষ হয়েছে বিপরীতদিকের দেওয়ালে হুকে ঝোলানো পোকায় কাটা একটা পুরোনো কোটের নীচে। তারপরই লক্ষ করলাম, একইরকম দাগ হলঘরের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কতকগুলো দাগ শেষ হয়েছে দুপাশের দরজার কাছে গিয়ে; অন্যগুলো সিঁড়িকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে চলে গেছে; কিন্তু সবগুলো দাগই যেন শুরু হয়েছে কোট ঝোলানোর হুকগুলোর ঠিক নীচে থেকে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল ঃ

ঘরে আমার ছাড়া অন্য কারও পায়ের ছাপের চিহ্নমাত্র নেই।

নতুন অস্বস্তি আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। বাড়িটা দেখে প্রথমে পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি খুব সম্প্রতি কেউ বা কোনও কিছু এখানে ছিল। এই পুরোনো কোটের কাছ থেকে শুরু করে এসব অদ্ভুত দাগ টেনেছে কে? সে কি কোনও প্রাণী, না অন্য কোনও কিছু? নাকি কোনও ভবঘুরে উন্মাদ মহিলা, যার পায়ের ছাপ তারই ঝুলন্ত পোশাকে মুছে গেছে?

পুরোনো কোটটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম। জিনিসটা একটা প্রাচীন ধাঁচের মিলিটারি ওভারকোট। দু-একটা বিবর্ণ রুপোর বোতাম এখনও তাতে লাগানো রয়েছে, এবং জিনিসটা প্রচুর ব্যবহার হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু-আঙুলে ধরে কোটটাকে ঘোরালাম। দেখলাম, বাঁ-কাঁধের ঠিক নীচেই পেনির মাপের একটা গোল ফুটো। ফুটোর ধারগুলো পুড়ে গেছে, এবং তার চারপাশে কাপড়ে একটা কালচে ছোপ—যেন কেউ খুব কাছ থেকে পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে। ফুটোটা যদি পিস্তলের গুলিতেই হয়ে থাকে তা হলে কোনও এক সময়ে এই পুরোনো কোটটা একজন মৃত মানুষের গায়ে ছিল।

জিনিসটার প্রতি কেমন এক অদ্ভুত ঘৃণার ভাব জেগে উঠল ঃ শিউরে উঠে হাত সরিয়ে নিলাম আমি। হয়তো আমার কল্পনা হতে পারে, তবু মনে হল, ছাতা ও পচা কাপড়ের গন্ধ ছাড়া আরও একটা গন্ধ কোটের গা থেকে বেরিয়ে আসছে ঃ সে-গন্ধ পচা মাংস ও হাড়ের...কোনও বিকৃত পশুদেহের হালকা গন্ধ, তবে নির্ভুল—বাতাসে ভর করে স্পষ্ট ভেসে আসছে নাকে; আর তার সঙ্গে অনেক অস্পষ্ট হলেও কম বাস্তব নয় একটা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুভূতি যে, এক কলঙ্কময় ঘোর অন্ধকার অতীত থেকে এক অদ্ভুত তেজ ছড়িয়ে পড়ছে বাড়িটার রহস্যময় পরিবেশে।

অনেক চেষ্টায় নিজেকে শক্ত করলাম। আসলে এখানে ভয় পাওয়ার মতো কী-ই বা আছে। মানুষ-লুঠেরাকে আমার ভয় নেই, কারণ আমার পেছন পকেট রয়েছে একটা ছোট অথচ কাজ চালানোর মতো অটোমেটিক; আর, ভূতের কথায় বলতে পারি, যদি সত্যিই তাদের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তারা সাধারণত দিনের বেলায় চরে বেড়ায় না। জায়গাটা গা-ছমছমে সন্দেহ নেই—কিন্তু তাই বলে উদ্ভট কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে গরম পানীয় মুখে না তুলে বা সাইকেলটা না সারিয়ে বাইরের ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়ার কোনও মানে হয় না।

সুতরাং সবচেয়ে কাছের দরজাটা খুলে ফেলে ঢুকে পড়লাম একটা ছোট ঘরে। ঘরটা দেখে পড়ার ঘর বলেই মনে হল। ঘরের তাপচুল্লিটা ঠিক বিপরীতদিকের দেওয়ালে বসানো। প্রাচীন চুল্লিটা শেষবার জ্বালানো কাঠের ছাইয়ে ঠাসা। চুল্লি খোঁচানোর লোহার শিকটা তুলে নিলাম—কমলালেবুর মতো হাতল লাগানো এক কিম্ভূতকিমাকার প্রাচীন জিনিস—সমস্ত ছাই খুঁচিয়ে ফেলে দিয়ে শুকনো ডালপালাগুলো বয়-স্কাউটের নিয়মমাফিক কায়দায় সাজিয়ে দিলাম। কিন্তু কাঠগুলো ছিল স্যাঁতসেঁতে, ভেজা; সুতরাং দেশলাইয়ের অর্ধেক কাঠি খরচ করে ফেলার পরও ধিকিধিকি আগুনের বেশি পাওয়া গেল না; আর একইসঙ্গে এক উলটো হাওয়া চিমনি দিয়ে নেমে এসে

ধোঁয়ায় ভরতি করে দিল ঘরটা। অবশেষে মরিয়া হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফুঁ দিয়ে চললাম চুল্লিতে—যদি আগুনের শিখা দেখা দেয়। ক্লান্তিকর কাজের মাঝখানে হলঘরের দিক থেকে একটা চলার শব্দে চমকে উঠলাম—একটা ছোট্ট ধপ শব্দ—যেন কেউ পোশাক ছুড়ে ফেলেছে মাটিতে।

বিদ্যুৎঝলকের মতো উঠে দাঁড়ালাম, প্রতিটি স্নায়ু টান-টান করে কান পেতে রইলাম। আর কোনও শব্দ কানে এল না। আমি অটোমেটিক হাতে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চললাম দরজার দিকে। হলঘরে কিছু নেই; বাইরের একটানা বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না। কিন্তু পুরোনো ওভারকোটটার ঠিক নীচে মেঝের একটা জায়গা থেকে ভেসে উঠছে ধুলোর ছোট-ছোট ঘূর্ণির মেঘ, যেন এইমাত্র সেখানে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়েছে।

হুঁ বুঝেছি! নির্ঘাত কোনও ইঁদুর—আপনমনেই বললাম, এবং ফিরে গেলাম নিজের কাজে। আবার শুরু হল ধিকিধিকি আগুনে ফুঁ দেওয়া, চুল্লিতে শিক দিয়ে খোঁচা দেওয়া, ঘন-ঘন দেশলাই জ্বালানো। তারই মাঝখানে আবার ভেসে এল অদ্ভুত শব্দটা—খুব একটা জোরে নয়, তবে স্পষ্ট এবং অভ্রান্ত।

আবার গেলাম হলঘরে; সেই একই জায়গা থেকে ভেসে ওঠা ধুলোর মেঘ ছাড়া এবারও কিছু নজরে পড়ল না। কিন্তু আসন্ন বিপদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়-সংকেত ক্রমে সোচ্চার হয়ে উঠছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, এই নির্জন প্রাচীন হলঘরে আমি আর একা নই—কোনও অশুভ অদৃশ্য শক্তি সেখানে ওত পেতে রয়েছে, পরিবেশকে কলঙ্কিত করছে নিজের অপবিত্রতায়।

কোনও লাভ নেই—নিজের মনেই বললাম, আমি ভিতু বোকা হতে পারি, কিন্তু এসব আর সহ্য হচ্ছে না। সময় ভালো থাকতে-থাকতে লটবহর নিয়ে কেটে পড়াই মঙ্গল।

এই কথা ভেবে ঘরে ফিরে এলাম, আড়চোখের নজর তখন দরজার দিকে। তাড়াহুড়ো করে সব জিনিসপত্র পিঠ-ব্যাগে গুছিয়ে নিলাম। ব্যাগের শেষ ফিতেটা যখন বাঁধছি ঠিক তখন হলঘর থেকে ভেসে এল একটা অশুভ বিদ্রুপের হাসি। তারপরই শুনতে পেলাম কারও চুপিসাড়ে চলাফেরার শব্দ। চকিতে পিস্তল বের করে নিলাম, দরজার দিকে মুখ করে ঘরের ঠিক মাঝখানে যেমন দাঁড়িয়ে ছিলাম তেমনই দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার রক্ত হিম হয়ে আসছে। দরজার কবজার ফাঁক দিয়ে একটা ছায়াকে সরে যেতে দেখলাম। দরজাটা সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল, তারপর ধীরে-ধীরে খুলে যেতে লাগল। অবশেষে দেখা দিল, সেই মিলিটারি ওভারকোটটা।

ওটা টান-টান হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে; ভারসাম্য খুঁজে না পেয়ে যেন সামান্য দুলছে। কলার আর কাঁধ দুটো এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যেন কোনও অদৃশ্য ব্যক্তি ওটা গায়ে পরে রয়েছে। এই ছাতা-ধরা পুরোনো কোটটাই যে একটু আগেও ঘরে দেওয়ালের হুকে ঝুলছিল তা কে বিশ্বাস করবে!

প্রায় একযুগব্যাপী একটা মুহূর্ত আমি পাথরের মতো কোটটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম। ওটা এখন দরজার চৌকাঠে থমকে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুর মতো করাল এক

pathagar.net

সম্মোহন আমাকে আমূল গেঁথে রেখেছে ঘরের মেঝেতে, আমার সারা শরীরকে করে দিয়েছে পক্ষাঘাতে পঙ্গু এবং আমার নিয়ন্ত্রণহীন অসাড় আঙুল থেকে পিস্তলটা ফেলে দিয়েছে পায়ের কাছে। অথচ আশ্চর্য, আমার চিন্তা-ভাবনা-বুদ্ধি তখনও লোপ পায়নি। জমাট আতঙ্কের সঙ্গে অনুভব করছি একটা উদগ্র বমি-বমি ভাব। জানি, আমি আজ চূড়ান্ত অশুভের মুখোমুখি হয়েছি—নরকের এই দূতের গন্ধ পর্যন্ত আমাকে দূষিত করে তুলবে—আর যদি সে আমাকে স্পর্শ করে তা হলে শুধু যে আমার শরীরই ধ্বংস হবে তা নয়, আমার আত্মাও চিরবন্দি হবে নরকে।

আর এখন ওটা এগিয়ে আসছে ঘরের ভেতরে—ওটার হেলেদুলে চলার ভঙ্গি ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, খালি হাতদুটো বীভৎসভাবে দুপাশে ঝুলছে, নীচের প্রান্তটা খসখস করে মেঝের ধুলোয় দাগ কেটে এগিয়ে আসছে, ধীরে-ধীরে কমে আসছে আমাদের দূরত্ব। প্রতিটি মুহূর্তে আমার দু-চোখ কোটর ঠেলে আরও বাইরে বেরিয়ে আসছে।

নিজের অজান্তে আমার পা দুটো আমাকে পিছিয়ে নিয়ে চলল। আমি কুঁকড়ে গেলাম আতঙ্কে। একসময় আমার পিঠে তাপচুল্লির কঠিন স্পর্শ অনুভব করলাম। আর পেছোনোর জায়গা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভয়ঙ্কর অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে কোটটা আমার দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসতে লাগল...খালি হাত দুটো এবার শূন্যে উঠছে, কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে আসছে আমার গলা লক্ষ্য করে, আর এক মুহূর্ত পরে কোটের হাতা দুটো আমাকে স্পর্শ করবে, এবং তখন আমার মানসিক ভারসাম্য ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাবে। আমার জ্বলন্ত মস্তিষ্কে যেভাবেই হোক সুসঙ্গত বুদ্ধি এল—যা আমি বহুকাল আগে পড়েছি, কিংবা শুনেছি...অশুভ শক্তির...বিরুদ্ধে...পবিত্র চিহ্নের... ক্ষমতা। মরিয়া হয়ে শরীরের অবশিষ্ট শেষবিন্দু দিয়ে একটা অসাড় আঙুল সামনে বাড়িয়ে ধরলাম, শূন্যে আঁকলাম পবিত্র ক্রুশের চিহ্ন এবং সেই মুহূর্তে আমার অন্য হাতটা পেছনের দেওয়ালে উন্মাদের মতো হাতড়াতে লাগল। অবশেষে ঠান্ডা, শক্ত, গোলাকৃতি কোনও বস্তুর স্পর্শ পেলাম। জিনিসটা চুল্লি খোঁচানোর সেই পুরোনো ভারি লোহার শিকের হাতল।

লোহার শীতল স্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে শরীরের হারানো শক্তি ফিরে পেলাম। বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় লোহার ভারি শিকটা ঘুরিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলাম আমার সামনে দাঁড়ানো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের আতঙ্ককে। আর কী আশ্চর্য! সঙ্গে-সঙ্গে জিনিসটা হাত-পা মুড়ে পড়ে গেল মেঝেতে, হয়ে গেল একটা পুরোনো কোট—তার বেশি কিছু নয়—একটা স্তূপের মতো পড়ে রইল আমার পায়ের কাছে। কিন্তু তবুও শপথ করে বলতে পারি যে, যেই মুহূর্তে আমি ওই নারকীয় আতঙ্কটাকে এক লাফে অতিক্রম করে ঘর থেকে ছুটে পালালাম, তখনই চোখের [illegible]ণ দিয়ে নজরে পড়ল, ওটা নিজেকে ঠিকঠাক করে আবার আগের চেহারায় উঠে [illegible]াচ্ছে, যেন তখুনি আমার পেছনে তাড়া করে আসবে।

*

শাপগ্রস্ত বাড়িটার বাইরে এসেই প্রাণপণে ছুটে চললাম। অর্ধ-অচেতন অবস্থায় কোনওরকমে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁর দরজায় এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত আর কিছুই আমার মনে নেই।

'ভগবানের দোহাই! একটু মদ নিয়ে আসুন!' টলতে-টলতে ভেতরে ঢুকে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

মদ এল। আমি তাতে চুমুক দিলাম। আমাকে ঘিরে অবাক কিছু জনতার ভিড়। ভাঙা-ভাঙা ফরাসিতে ওদের সবকিছু বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তবুও ওরা অবাক চোখে আমাকে দেখতে লাগল। অনেক পরে রেস্তোরাঁর মালিকের মুখ দেখে অনুমান করলাম, আমার কথা উনি বুঝতে পেরেছেন।

'হায় ভগবান—!' রুদ্ধশ্বাসে তিনি বলে উঠলেন! 'এও কি সম্ভব যে মঁসিয়ে ওই জায়গায় গিয়েছিলেন! শিগগির জুলিয়েত! মঁসিয়ের জন্যে আর-এক বোতল মদ নিয়ে এসো।'

পরে রেস্তোরাঁর মালিকের কাছ থেকে গল্পটা মোটামুটি শুনলাম। বলতে তাঁর ইচ্ছে ছিল না, তবে অনেক চাপাচাপির পর রাজি হলেন।

ওই পোড়া বাড়িটায় নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কোন এককালে বাস করতেন —অর্ধ উন্মাদ ভদ্রলোকের শরীরে আফ্রিকানদের রক্ত ছিল। রেস্তোরাঁর মালিকের কথায় বোঝা গেল, ভদ্রলোক অত্যন্ত বদমেজাজি ছিলেন। 'তিনি যে ভীষণ বদমাইশ লোক ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই, মঁসিয়ে—' রেস্তোরাঁর মালিক বলে চললেন, 'নিজের বউকে তিনি খুন করেন, এবং হাতের কাছে যাকেই পেতেন তাকেই অকথ্য অত্যাচার করতেন—এমনকী, লোকে বলে, নিজের মেয়েদেরও তিনি রেহাই দেননি। শেষে তাদেরই একজন ভদ্রলোককে পেছন থেকে গুলি করে মেরে ফেলে। সেই থেকে ওই পুরোনো জমিদার-বাড়িটার খুব বদনাম। আপনি দশলাখ ফ্রাঁ দিলেও এ-গ্রামের কেউ ওই বাড়ির ধারে কাছে ঘেঁষবে না।'

প্রথমেই তো বলেছি, অফিসের সবাই আমাকে একটু-আধটু পাগল ভাবে; তাই তাদের কাউকেই এ-গল্প বলিনি। কিন্তু এর প্রতিটি বর্ণ সত্যি।

আমার নতুন সাইকেল ও বেড়াতে যাওয়ার সমস্ত লটবহর হয়তো এখনও ওই শাপগ্রস্ত বাড়ির হলঘরে যেমন রেখে এসেছিলাম তেমনই পড়ে আছে। আপনাদের কেউ যদি সেগুলো নিয়ে আসতে সাহস করেন তা হলে আমার পক্ষ থেকে উপহার মনে করে ওগুলো রাখতে পারেন।

➤ *দ্য কোট*

রহস্যময়ী

www.pathagar.net

উইলিয়াম স্যানসম

pathagar.net

একবার একজন যুবক রোমে বেড়াতে এসেছিল। সেটাই তার প্রথম আসা। গ্রাম থেকে এলেও তার বয়েস এমন কিছু কম নয় বা এত সরল সে নয় যে ভাববে এই বিশাল সুন্দর রাজধানী তার সামনে বহু নতুন বিচিত্র প্রতিশ্রুতি সাজিয়ে দেবে। এর মধ্যেই সে জেনে ফেলেছে জীবন প্রধানত প্রপঞ্চময়, সুন্দর-সুন্দর অনেক কিছু ঘটার সুযোগ সেখানে থাকলেও সমপরিমাণ হতাশা এসে ক্ষতিপূরণ করে দেয়; আর, সে এও জানে, এর চেয়েও খারাপ চরিত্র জীবনের আছে—অর্থাৎ, ভালো-মন্দ কোনও কিছুই না ঘটার সম্ভাবনা। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত কোনও বড় শহরে এ-ঘটনাই স্বাভাবিক।

এসব ভাবতে-ভাবতে সে দাঁড়িয়ে থাকে স্প্যানিশ সিঁড়ির ধাপে, সামনে ছড়ানো দিগন্তছোঁয়া দৃশ্যকে খুঁটিয়ে দ্যাখে। শুনতে পায় সান্ধ্য যানবাহনের উপচে পড়া গুঞ্জন। রোমের স্বর্ণগোধূলির বুকে জ্বলে ওঠে অসংখ্য আলো। চকচকে গাড়িগুলো ফোয়ারার পাশ দিয়ে ব্যস্তভাবে পিছলে যায়। মোড় নেয় উজ্জ্বল 'ভায়া কন্‌দত্তি'র দিকে, লাল নিয়ন-সঙ্কেতের আলো হাতছানি দিয়ে অন্ধকারের বুকে বিঁধে যায়, বাসের হলদে জানলাগুলোয় 'কোথাও-যাওয়ার-জন্যে-ব্যস্ত' মুখের ঠাসাঠাসি—শহরের প্রত্যেকেই যেন এই সন্ধ্যাকে পুরোপুরি উসুল করে নিতে চায়। সে মুগ্ধ হয়ে দ্যাখে। একমাত্র তারই কিছু করার নেই।

এই শহরে শুধু সে-ই যেন একা অপ্রত্যাশিত ঘটনার খোঁজ করে বেড়াতে এসেছে। কিন্তু খোঁজ করলেই তো আর সেরকম ঘটনা সামনে আসে না—বরং দূরেই

সরে থাকে। এখন কোনও ঘটনারই প্রতিশ্রুতি নেই। সুতরাং, যুবকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে ফিরে চলল, সুন্দর গির্জাটিকে পাশ কাটিয়ে খোয়া বাঁধানো পাহাড়ি পথ ধরে রওনা হল তার হোটেলের দিকে। সরু রাস্তায় মদের দোকান ও খাবারের দোকানে ভিড় ও ব্যস্ততা ক্রমে বেড়ে চলে। কিন্তু যুবক খোঁজে নির্জনতা। রোমের গোধূলির স্বর্ণসজ্জা সে একাই দু-চোখ ভরে দেখতে চায়। সুতরাং সে অপেক্ষাকৃত নির্জন প্রাচীন রাস্তা বেছে নেয়, ঘরে ফিরে চলে নিঃসঙ্গ হয়ে।

এইরকমই একটা রাস্তায়, দু-সারি হলদে জীর্ণ বাড়ির মধ্যেকার ফুটপাতবিহীন সরু গলিতে, যুবক লক্ষ করল, সে আর একা নয়। গলির অপরপ্রান্ত থেকে পাহাড়ি পথ ধরে তারই দিকে নেমে আসছে জনৈক ভদ্রমহিলা।

মহিলা আরও কাছে আসতেই যুবক দেখল, তার পোশাক-পরিচ্ছদে রুচির পরিচয় রয়েছে, চলার ভঙ্গিতে নরম লাতিন দীপ্তি, প্রতিটি পদক্ষেপ সম্মান আদায় করে নেয়। মুখে তার ওড়না, কিন্তু সে সুন্দরী নয় এ অলীক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়াও অসম্ভব। নিজেকে তার সঙ্গে একা পেয়ে, তার এত কাছে এসে, এবং তাকে এই ঘটনাবিহীন সন্ধ্যার অপ্রত্যাশিত রহস্যের প্রতীক ভেবে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা যুবককে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। নিজেকে ভীষণ নীচ, ক্ষুদ্র, পতিত, করুণার পাত্র বলে মনে হল তার। ফলে সে কাঁধ এলিয়ে দিয়ে চোখ নামাল—তবে মহিলার দিকে চোরা-চাউনিতে একপলক তাকানোর আগে নয়।

যুবক যা দেখল তাতে সে হতভম্ব হয়ে থমকাল, অপলক বিস্ময়ে চেয়ে রইল মহিলার মুখের দিকে। না, ভুল তার হয়নি। মহিলা নীরবে হাসছে। তা ছাড়া—তার আচরণেও ক্ষণিকের দ্বিধা ফুটে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ যুবকের মনে হল : 'বেশ্যা?' উঁহু, তা নয়—এ হাসি ঠিক সে ধরনের নয়, অবশ্য তাতে ভালোবাসার ইঙ্গিত যে নেই তাও বলা যায় না। আর তখনই তাকে অবাক করে দিয়ে মহিলা বলে উঠল, 'জানি, আপনাকে ঠিক এভাবে—এভাবে বলা উচিত নয়—কিন্তু আজকের সন্ধেটা এত চমৎকার—আর আপনি তো একা, আমারই মতো...।'

মহিলা অপূর্ব সুন্দরী। যুবক কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। কিন্তু ক্রমশ বেড়ে-ওঠা এক আনন্দ তাকে হাসতে শক্তি দিল। সুতরাং মহিলা বলে চলল, স্বরে এখনও দ্বিধা, অথচ অনুরোধের সুর সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

'আমি ভাবলাম...হয়তো...আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যেতে পারি...,' অবশেষে যুবক সংবিত ফিরে পেল।

'আমার কাছে এর চেয়ে খুশির কথা আর কী হতে পারে। এখান থেকে ভেনিস তো মাত্র এক মিনিটের পথ।'

মহিলা আবার হাসল।

'আমার বাড়ি আরও কাছে—এখানেই...।'

রাস্তা ধরে নীরবে কয়েক পা এগিয়ে গেল ওরা, যুবকের পার হয়ে আসা

pathagar.net

একটা গলির মুখে এসে থামল। মহিলা সেদিকে ইঙ্গিত করল। ওরা আবার চলতে শুরু করল। ছোট-ছোট বাড়ির সারি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এসে ওদের পথ চলা শেষ হল। শেষ বাড়িটার পরেই রাস্তা থেকে খানিকটা পিছিয়ে একটা বাগানের পাঁচিল, আর বাগানের শেষে দাঁড়িয়ে আছে একটা সুন্দর বিশাল প্রাসাদ। মহিলার সুন্দর ত্বকের স্বচ্ছ বিবর্ণতা, ধূসর উজ্জ্বল চোখে, ঘন কালো ভুরু এবং সপ্রভ কালো চুলের অন্তরঙ্গ মিশ্রণে তার মুখমণ্ডলে জন্ম নিয়েছে এক আশ্চর্য বিবর্ণ দ্যুতি। চাবি ঘুরিয়ে বাগানের দরজা খুলল সে।

মখমলের পোশাকে এক ভৃত্য তাদের অভ্যর্থনা জানাল। এক বিশাল অপূর্ব আরাম-কক্ষে সুন্দর কাচের ঝাড়লণ্ঠনের নীচে, সামনের ফোয়ারার খেলা ও ভিজে সবুজ লনকে সাক্ষী রেখে ওদের হাতে তুলে দেওয়া হল সফেন সুরার পাত্র। ওরা কথা বলতে লাগল। উষ্ণ রোমের রাতে বরফে সম্পৃক্ত সুরা ওদের মধ্যে এনে দিল খুশির উত্তাপ। কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণেই যুবকটি কৌতূহলী চোখে মহিলাকে দেখতে লাগল।

মহিলার চাউনি, চোখ ও ঠোঁটের সূক্ষ্ম নড়াচড়ায় এমন এক অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত, যার অর্থ অনেক। যুবক বুঝল, তাকে সতর্ক হতে হবে। অনেক পরে তার মনে হল, মহিলাকে ধন্যবাদ জানানোই সবচেয়ে ভালো হবে—এতে সঞ্চিত যত ঋণ থেকে সে মুক্ত হবে, কিন্তু মহিলা সেই মুহূর্তে বাধা দিল : প্রথমে একটু হেসে, পরে বিষাদভরা এক দৃষ্টি মেলে। যেন কোনওরকম অস্বস্তিকে প্রশ্রয় না দিতে অনুনয় করে বলছে; মহিলা জানে, এ-অনুরোধ অস্বাভাবিক; এই পরিস্থিতিতে যুবক হয়তো অন্য কোনও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যকে সন্দেহ করতে পারে; কিন্তু সরল সত্যটুকু থেকেই যায় যে, মহিলা একা, এবং এই যুবকের কোনও কিছু কিংবা রাস্তায় গোধূলির সেই মুহূর্তটুকু তাকে অনিবার্যভাবে যুবকের দিকে আকর্ষণ করেছে। নিজেকে সে আর সামলে রাখতে পারেনি।

নিখুঁত সাক্ষাতের এক সম্ভাবনা—সেই স্বপ্নকে সহজে সে ধ্বংস করতে পারে না—মনস্থির করল যুবক। তার উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণের সীমা অতিক্রম করল। মহিলাকে সে বিশ্বাস করল। আর তারপরই ঘটনাক্রমে গড়িয়ে চলল নিখুঁতভাবে। মহিলার আমন্ত্রণে যুবক নৈশভোজে যোগ দিল। ভৃত্যেরা নিয়ে এল সুস্বাদু সব খাদ্যসামগ্রী; মাছ, পাখির মাংস, নরম ফল। লনের ঠান্ডা আমেজে ওরা সোফায় বসল। এল তরল পানীয়। ভৃত্যেরা অবসর নিল। সারা বাড়িতে নেমে এল এক নৈঃশব্দ। ওরা পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করল।

একটু পরেই নীরবে যুবকের হাত ধরে মহিলা তাকে নিয়ে চলল ঘর ছেড়ে। কী গভীর নীরবতা ঘিরে ধরেছে ওদের দুজনকে! যুবকের হৃৎপিণ্ডের শব্দ ভয়ঙ্করভাবে বেজে চলল—কেউ হয়তো শুনে ফেলবে, সে ভাবল, যে-হলঘরের মার্বেল পাথরের মেঝে ওরা এখন অতিক্রম করে চলেছে তারই দেওয়ালে হয়তো ঘুরে বেড়াবে সেই

শব্দের প্রতিধ্বনি, তারপর তার হাত বেয়ে সে অনুভূতি হয়তো পৌঁছে যাবে মহিলার কাছেও। কিন্তু শুধুমাত্র নিশ্চিত ইঙ্গিত থেকেই এ উত্তেজনার জন্ম। নিশ্চিত ইঙ্গিত, কারণ এই মুহূর্তে, এই চমৎকার সন্ধ্যায় আর কিছুই ওলটপালট হতে পারে না। কথা এখন বাহুল্য মাত্র। ওরা দুজনে প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে একসঙ্গে উঠতে লাগল।

মহিলার শয়নকক্ষে, মশারির রেশম পটভূমিতে তার দীর্ঘ পোশাক পরিহিত আবছায়া ছবিতে ভালোবাসা উজাড় করে দেয় যুবক, যে-ভালোবাসা চিরন্তন, সর্বদা নিখুঁত, তাদের এই সুন্দর সাক্ষাতের মতোই স্বপ্নময়।

তার ভালোবাসার প্রতিদানে অস্ফুট স্বরে কথা বলে উঠল মহিলা। কোনও কিছুই এখন ভুল হওয়ার নয়, তাদের মাঝে কোনও প্রতিবন্ধক কখনও আসবে না। যুবকের হয়ে বিছানার চাদর আলতো হাতে সরিয়ে দিল সে।

অবশেষে মহিলার পাশে যখন সে শয্যাগ্রহণ করেছে, তার হাত নামিয়ে এনেছে তার হাতে—তখন হঠাৎই অস্বস্তি বোধ করল যুবক।

কিছু একটা গোলমাল কোথাও হয়েছে। একটা ত্রুটি স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। কান পেতে শুনল যুবক, অনুভব করতে চেষ্টা করল—তারপরই দেখল ভুলটা তারই। বিছানার সন্নিহিত আলোগুলো আবছা, ঘোমটোপে ঢাকা—কিন্তু সে এতই অসতর্ক যে, ঘরের ছাদের ঠিক মাঝখানে ঝুলন্ত উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক ঝাড়লণ্ঠনটা তার নজর এড়িয়ে গেছে। তার মনে পড়ল, আলোর সুইচটা দরজার ঠিক পাশেই। এক মুহূর্ত সে ইতস্তত করল। মহিলা চোখ তুলে তাকাল—দেখল ঝাড়লণ্ঠনের দিকে যুবকের পলক-দৃষ্টি। বুঝল কারণ।

মহিলার চোখ ঝিকিয়ে উঠল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'ওগো,' শান্ত হও—উঠো না এখন...।'

তারপর মহিলা নিজের হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত ক্রমে বড় হতে লাগল, লম্বা হয়ে চলল তার বাহু, মশারির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, ঘরের সুদীর্ঘ গালিচা পার হল, প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে ছায়ায় আবৃত করল দীর্ঘ শয়নকক্ষ, এবং অবশেষে তার প্রকাণ্ড আঙুল পৌঁছল দরজার কাছে। একটা 'খট' শব্দ করে আলোর সুইচটা নিভিয়ে দিল সে।

➤ *এ উওম্যান সেলডম ফাউন্ড*

pathagar.net

ক্যাকটাস

গেলর্ড স্যাবাটিনি

pathagar.net

অবশেষে তাঁকে খুঁজে পেলাম। উষ্ণ গ্রিন হাউসের এক কোণে বসেছিল ছোটখাটো মানুষটা। মাথার চুল ধবধবে সাদা, শরীরে রক্তশূন্যতার ছায়া।

'মিস্টার ব্লুম?' আমি প্রশ্ন করলাম। একটা সুন্দর ক্যাকটাসে জল দিতে এতই মগ্ন ছিলেন যে, আমার উপস্থিতি টের পাননি। সুতরাং আমার কণ্ঠস্বর তাঁকে ভীষণভাবে চমকে দিল, কিছুটা জল চলকে পড়ল তাঁর জুতোর ওপর।

'আমি...আমি,' তাঁর কণ্ঠস্বরকে যতিচিহ্নিত করেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারি শব্দ। বিস্ফারিত চকচকে চোখে ঝটিতি দুপাশে তাকালেন তিনি; উত্তেজিত দৃষ্টিতে কিছু একটা খোঁজার লক্ষণ। হঠাৎই অস্বাভাবিক ক্ষিপ্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বিকট-দর্শন ছুরি তুলে নিলেন, সাধারণত দক্ষিণ আমেরিকায় গভীর জঙ্গল কেটে পথ করতে যে ধরনের ছুরি ব্যবহার হয়ে থাকে।

অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, ছুরিটা মরিয়া ভঙ্গিতে উঁচিয়ে ধরা মাথার ওপর; মুখমণ্ডলে নিশ্চিত পরাজয়কে অস্বীকার করা একরোখা যোদ্ধার ছবি। যে-যোদ্ধা লড়াই করে মরতে চায়। স্বভাবগত প্রতিক্রিয়াবশে আমি কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। অবাক হলাম বৃদ্ধের এই ভয়ার্ত উন্মাদ আচরণে।

'সাবধান!' তিনি চিৎকার করে উঠলেন। শঙ্কা এবং তীক্ষ্ণতা মেশানো সেই কণ্ঠস্বর গ্রিনহাউসের কাচের দেওয়ালে কেঁপে-কেঁপে প্রতিধ্বনি তুলল : 'এক পা-ও এগোবেন না! এ আমি কিছুতেই আপনাকে দেব না!'

সেই মুহূর্তে বুঝলাম, আমাকে সাধারণ চোর-ডাকাত সন্দেহে তিনি বিশাল ক্যাকটাসটাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন।

'মিস্টার ব্লুম,' আমি বললাম, 'শান্ত হোন। আমি আপনার গাছ চুরি করতে আসিনি। আমি ''গার্ডেনিং প্রাইড'' কাগজের সাংবাদিক : আপনার ইন্টারভিউ নিতে এসেছি।'

কয়েক মুহূর্ত তিনি ইতস্তত করলেন, তারপর ছুরিটা সশব্দে ফেলে দিলেন মেঝেতে। হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন সুন্দর ক্যাকটাসটার কাছে। লক্ষ করলাম, তাঁর দু-চোখে জল। তিনি কাঁদছেন।

কাছে এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখলাম আমি।

'মিস্টার ব্লুম,' শান্ত স্বরে বললাম, 'নিজের সুখ-দুঃখের কথা কাউকে বললে মন অনেক হালকা হয়।' বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম এক বৃদ্ধের ভাঙাচোরা কান্না।

এক অদ্ভুত আকর্ষণে এরপর আমার নজর গেল গাছটার দিকে। এত বছর উদ্যানপালনবিদ্যার সংস্পর্শে থেকেও এমন অদ্ভুত সুন্দর গাছ কখনও আমার চোখে পড়েনি। গাছটার উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। মূল কাণ্ড থেকে দুটো শাখা হাতের মতো দুপাশে বেরিয়ে এসেছে; আর তার ফুলের শরীরে যেন খেলে গেছে রামধনুর বিশৃঙ্খল তরঙ্গ। তার সৌন্দর্য বর্ণনার চেষ্টা ধৃষ্টতারই নামান্তর। সব মিলিয়ে সে-সৌন্দর্যের চরিত্র হয়তো অপার্থিব। কিন্তু এত সত্ত্বেও কেন যেন মনে হল, এর ভেতরে কোথায় একটা অসঙ্গতি লুকিয়ে রয়েছে।

'সে-কাহিনি কাউকে না বলতে পারলে আমি পাগল—পাগল হয়ে যাব,' ভাঙা নিচুস্বরে বললেন তিনি। তারপর মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে ঃ 'আমার বয়েস কত বলুন তো?'

এ-প্রশ্নে চমকে উঠলাম। বর্তমান আলোচনায় এ-প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেলাম না। তাঁকে দেখে প্রায় সত্তর বছর বলে মনে হল। সম্প্রতি তিনি হয়তো ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সুতরাং তাঁর আসল বয়েস হয়তো পঁয়ষট্টি। প্রশ্নটার তাৎপর্য না বুঝে সামান্য রসিতকা করতে ছাড়লাম না। বললাম, তাঁকে দেখে বছর-ষাটেকের বেশি মনে হয় না।

'ষাট?' তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর দু-চোখে টুকরো যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ঃ 'ষাট? আমাকে দেখে ষাট বছর বয়েস মনে হচ্ছে—জানেন, আমার বয়েস মাত্র পঁয়ত্রিশ?'

এক শীতল অনুভূতি আমাকে গ্রাস করল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।' অগোছালো স্বরে বললাম, 'আপনাকে আঘাত দেওয়ার কোনও ইচ্ছে...।'

চোখের জল ছাপিয়ে এই প্রথম তিনি হাসলেন এবং তাঁর বয়েস কয়েক বছর কমে গেল।

'জানি আমাকে দেখে বৃদ্ধ মনে হয়,' তিনি বললেন, 'কারণ, অনেক দুশ্চিন্তার ঝড় আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।' তিনি আমার দিকে আর-একবার তাকালেন এবং আমি তাঁর কথায় হাসব-কি-হাসব না ঠিক করতে পারলাম না।

pathagar.net

তিনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ঘুরে তাকালেন ক্যাকটাসটার দিকে, তার হৃষ্টপুষ্ট একটা শাখায় ভালোবাসাভরা হাত রাখলেন। মনে হল খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছেন। দেখলাম, ওঁর ঠোঁট নড়ছে এবং অস্ফুট কিছু শব্দও আমার কানে এল, কিন্তু স্পষ্ট করে কোনও কথা বুঝতে পারলাম না। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি চোখ রাখলেন আমার চোখে।

'আমরা আপনাকে একটা গল্প শোনাব ঠিক করেছি মিস্টার...।'

'কার্টিস,' আমি জানালাম, 'জেম্‌স কার্টিস।'

'মিস্টার কার্টিস, আশা করি আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কারণ, এমন একটা গল্প আমি শোনাব যা সারা পৃথিবীকে শোনানোর দায়িত্ব আপনার। এ-গল্পের প্রতিটি শব্দ বাস্তব সত্যি। কিন্তু এর ঘটনা এতই অবিশ্বাস্য যে, অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করাতে আপনাকে ভীষণ অসুবিধেয় পড়তে হবে।' তিনি আবার তাকালেন ক্যাকটাসটার দিকে, তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে শীতল শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'বসুন মিস্টার কার্টিস, আপনাকে আজ অসম্ভব আতঙ্কের এক সত্যকাহিনি শোনাব, যার কোনও দ্বিতীয় তুলনা নেই।'

বরফ মেশানো নারকোল-দুধের গেলাস সাজানো একটা টেবিলকে মাঝখানে রেখে দুটো লোহার চেয়ারে আমরা মুখোমুখি বসলাম। কৃত্রিমময় বৃক্ষলতার সমারোহে তাদের বিশাল সবুজ পাতা, তাদের আর্দ্র আবহাওয়ায় ঘামে ভেজা শরীর যেন আঙুল উঁচিয়ে আমাকে দেখাতে লাগল, যেন এই পরিবেশে আমার অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছিত। আবহাওয়ার উষ্ণতা সত্ত্বেও অনুভব করলাম, কেন জানি না আমি কাঁপতে শুরু করেছি।

'সমান্তরাল জগতে আপনি বিশ্বাস করেন, মিস্টার কার্টিস?' আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বলে চললেন, 'অতীতের সেই সময়গুলোর কথা শুধু একবার ভেবে দেখুন। তখন আমরা পৌঁছেছি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে। দ্বিমুখী রাস্তায়। কোন পথে যাব? বাঁ-দিকে, না ডানদিকে? সেই মাহেন্দ্রক্ষণে পৃথিবীর ভাগ্য পুরোপুরি বদলে যেতে পারত।

'জার্মানরা যদি যুদ্ধে জিতত, তা হলে কী হত? যদি ওয়াটারলুর যুদ্ধে জিততেন নেপোলিয়ান? যদি কলম্বাস খুঁজে না পেত আমেরিকা? যদি ইংরেজরা কোনওদিনই না আসত ভারতে? যদি দশ কোটি বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক বিশাল সরীসৃপেরা বেঁচে থাকত আজও? যদি আপনি আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে না আসতেন?' তিনি থামলেন, হয়তো বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সময় দিলেন আমাকে, কিন্তু আমি বুঝে উঠলাম সামান্যই : 'আমার বিশ্বাস, এই সমস্ত ঘটনাগুলো ক্রমান্বয়ে ঘটে গেছে আমাদের সমান্তরাল জগতে এবং এখনও ঘটে চলেছে। সম্পূর্ণ অন্য তলে অবস্থিত আমাদের ঘিরে থাকা অলৌকিক জগতের মতো; আর কখনও-কখনও হঠাৎ সে-জগতে প্রবেশের দরজা আমাদের কাছে খুলে যায়। সেই দরজা খোলে খেয়ালখুশি মতো এবং তখন দুই ভিন্ন জগতের প্রাণীরা সেই খোলা দরজা দিয়ে অন্য জগতে পা রাখতে পারে। সীমারেখার আবর্ত পেরিয়ে তারা পৌঁছে যায় দ্বিতীয় জগতে। তখন কী হবে, মিস্টার কার্টিস,' তিনি আমার চোখে তাকালেন এবং এই প্রথম লক্ষ করলাম

তাঁর চোখের রং সবুজ।

টাইটা ঢিলে করে ঘাড়ে হাত বোলালাম। পিঠে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যাওয়া ঘামের সূক্ষ্ম স্রোত অনুভব করলাম।

তিনি বলে চললেন, 'আর যদি আমরা সরাসরি পেছিয়ে যাই পৃথিবীর প্রত্যুষে, তা হলে কী হয়, মিস্টার কার্টিস? প্রাণ সৃষ্টির সেই সূচনায় প্রাণ বলতে ছিল এককোশী কিছু প্রাণী এবং উদ্ভিদ—তারা সবে নড়তে-চড়তে শিখছে। অ্যামিবা, আমাদের বহু পরিচিত এককোশী, আজ থেকে লক্ষ-লক্ষ বছর পরেও ঠিক একইভাবে বেঁচে রয়েছে। এখনও একইভাবে সে জীবাণুসদৃশ শিকারকে গ্রাস করে তার প্রাণশক্তি শুষে নেয়। আর সাঁতারু উদ্ভিদ ক্ল্যামিডোমোনাস সম্পর্কে আপনি কী বলবেন? এখনও সে শিকার গ্রাস করে চলেছে, যেমন করে আসছে যুগ-যুগ ধরে। অবশ্য এ-কথা সত্যি, এরা খুবই ছোট মাপের প্রাণী, কিন্তু তা বলে নিজের সমান আকারের প্রাণীদের কাছে এরা কম ভয়ঙ্কর নয়।

'আপনি গাছপালা নিয়ে চর্চা করেন যখন, তখন নিশ্চয়ই কলস-উদ্ভিদের নাম শুনে থাকবেন। এই মাংসাশী গাছ সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে বসে থাকে, তারপর গ্রাস করে পোকামাকড় মাছিকে। এর পাপড়িগুলো আমাদেরই চোয়ালের মতো বন্ধ হয়ে যায়, বন্দি করে শিকারকে।

'গভীর সমুদ্রের অতলে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের আচার-আচরণ সম্পূর্ণ উদ্ভিদের মতো। আবার এমন অনেক গাছপালা রয়েছে যাদের বাইরে থেকে দেখে প্রাণী বলেই মনে হয়।' তিনি থামলেন এবং হাতের একটা ভঙ্গি করে প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাইলেন। 'কিন্তু এসবের গুরুত্ব কেবল আপনার আমার মতো লোকের কাছেই, মিস্টার কার্টিস, যেহেতু আমরা গাছপালা নিয়ে চর্চা করি। কিন্তু সাধারণ পৃথিবী তাদের নিয়ে বিন্দুমাত্রও চিন্তিত নয়। কারণ, তারা জানে, এসব উদ্ভিদের আকার হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তারা অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রাণী—অত্যন্ত এই গ্রহের মাপকাঠি অনুযায়ী।'

তিনি আমার সামনে ঝুঁকে এলেন। সামনের টেবিলে ছড়ানো দু-হাতের চাপ দিয়ে বললেন, 'ধরুন যদি এমন কোনও সমান্তরাল জগত থাকে, যেখানে প্রাণীদের অনেক পেছনে ফেলে উদ্ভিদরা বিবর্তনের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছেছে? যদি সেখানকার প্রাণীরা, মানুষকে ধরেই আমি বলছি, বুদ্ধির ক্রমবিকাশের প্রতিযোগিতায় উদ্ভিদের কাছে পরাস্ত হয়ে বহু পেছনে পড়ে গিয়ে থাকে? এরকম একটা জগৎ কল্পনা করতে পারেন, মিস্টার কার্টিস?'

ঘরের গাছগুলো আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের বিশাল সবুজ পাতা যেন চাপা বিদ্বেষে তিরতির করে কাঁপছে; শুনছে ব্লুমের কথা; অপেক্ষা করছে আমার উত্তরের।

'আপনি কী বলছেন, মিস্টার ব্লুম? এ কি কখনও সম্ভব!' আমার কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে উঠল। গলা যেন শুকিয়ে আসছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে বুলিয়ে নিলাম।

pathagar.net

চেয়ারে হেলান দিয়ে জোরালো গলায় হেসে উঠলেন তিনি। হাসতে লাগলেন। একটা অস্পষ্ট খসখস শব্দে ভরে গেল ঘরটা, যেন ঘামে ভেজা চারাগাছগুলোও সে-হাসিতে যোগ দিয়েছে।

'অসম্ভব বলছেন? কিন্তু আপনার চোখ দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ইতিমধ্যেই আপনি এর অর্ধেক বিশ্বাস করে বসে আছেন; এমনকী আমার গল্পটা পর্যন্ত আপনাকে আমি এখনও বলিনি!' তিনি থামলেন, হাসি মিলিয়ে গিয়ে তাঁর মুখের ভাব গম্ভীর হল এবং একটা বিবর্ণ যন্ত্রণার মেঘ ছায়া ফেলল তাঁর ক্লান্ত ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে ঃ 'বিশ্বাস করুন, আমার গল্পটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর সত্যি আমার জানা নেই। এ শুধু আমার চোখে দেখা কাহিনি নয়, আমাকে নিয়ে কাহিনি—আমিও এ-কাহিনির এক হতভাগ্য অংশীদার।'

তিনি গল্পটা আমাকে শোনালেন।

দু-বছর আগে আমি ছিলাম তেত্রিশের অবিবাহিত এক প্রাণখোলা যুবক। জন্মের সময়েই আমার মা মারা যান এবং তাঁর বিশ বছর পরে বাবাও। আমার বাবা মোটামুটি বড়লোক ছিলেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে আমারই হাতে আসে। সুতরাং খাওয়া-পরার ভাবনা না থাকায় আমি বেশিরভাগ সময় পড়াশোনার পেছনে খরচ করতে লাগলাম। নিছক পড়ার আনন্দেই আমার পড়তে ভালো লাগত। পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য মস্তিষ্কের জঠরে জমিয়ে রাখাই হয়ে উঠল আমার একমাত্র নেশা। গাছপালা আমি ভালোবাসি। সত্যি কথা বলতে কী, মানুষের চেয়ে ওদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে। কিন্তু এসব কথা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

দু-বছর আগে একদিন কালাহারি মরুভূমির বুক চিরে ছুটে চলেছিল আমার ল্যান্ডরোভার জিপ। এক দুষ্প্রাপ্য জাতের ক্যাকটাসের খোঁজে আমি তখন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। লোকমুখে খবর পেয়েছিলাম, কালাহারি মরুভূমিতে কখনও-সখনও ওই ধরনের ক্যাকটাসের দেখা মেলে। সুতরাং বিন্দুমাত্রও দেরি না করে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছি সম্ভাব্য নিশানায়। আচ্ছন্ন সম্মোহিতের মতো।

মাথার ওপরে নিষ্ঠুর জ্বলন্ত সূর্য। আমার ঘামে ভেজা হাত ল্যান্ডরোভারের গিয়ার, স্টিয়ারিং নিয়ে ব্যস্ত; উঁচু-নিচু পথে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। নিচু গিয়ারে চলা ইঞ্জিনের শব্দ যেন চিতাবাঘের ক্ষুব্ধ গর্জন, একশো কুড়ি ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতায় বিস্তৃত মরুভূমি যেন স্বচ্ছ তরঙ্গের পরদার নীচে ধকধক করে জ্বলছে। মাথার ওপরে একটা এবং পায়ের নীচে একরাশ সূর্য নিয়ে আমি একরোখাভাবে ছুটে চলেছি।

এক সমতলভূমিতে পৌঁছে সবে গাড়ির গতি সামান্য বাড়িয়েছি, বজ্রপাতের মতো একটা প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ শব্দে পরিবেশ থরথর করে কেঁপে উঠল। গোটা পৃথিবী যেন চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল এবং ভীষণ সংঘাতে ঠিক বিপরীতভাবে আবার স্পষ্ট হয়ে ফিরে এল। গাড়ি থামিয়ে অবাক চোখে চারপাশে

pathagar.net

দেখতে লাগলাম। সবকিছু যেন বদলে গেছে। রংগুলো পালটে গেছে বর্ণালির বিপরীত প্রান্তের রঙে। হলেদ বালির রং এখন নীল আকাশে উজ্জ্বল হলদে রঙের ছড়াছড়ি। আমার গায়ের রঙে কেমন অদ্ভুত এক সবুজ আভা। উষ্ণতা নেমে গিয়ে এখন প্রায় সত্তর ডিগ্রির কাছাকাছি এবং চোখ তুলে তাকাতেই সত্রাসে দেখলাম—মাথার ওপরে সূর্যের রং উজ্জ্বল পান্না-সবুজ।

গাড়ি ছেড়ে টলতে-টলতে নীল বালিতে পা ফেলে এগিয়ে চললাম। বালিয়াড়ির খাড়াই বেয়ে পৌঁছলাম কতকগুলো গোলাপি পাথরের কাছে। অতলান্ত আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছে, আমার শরীর কাঁপছে। জানি না কী দেখতে চলেছি। বেশ কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তায় আতঙ্কে পাথরের আড়াল থেকে মুখ তুলতে পারলাম না। ব্যাপারটা অনেকটা যেন সেইরকম দুঃস্বপ্নের মতো, যখন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মস্তিষ্কের ডাকে সাড়া দেয় না; ঠোঁটে দাঁত চেপে ফোঁটা-ফোঁটা করে সাহস সঞ্চয় করলাম।

মাথাটা যথাসম্ভব নিচু রেখে পাথরের আড়াল ছেড়ে উঁকি মারলাম এবং সেই চরম দুঃস্বপ্ন-দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে একটা অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে। আমার সামনে এক বিস্তৃত নীল রঙের মাঠ। সেই মাঠে নিখুঁত পরিচ্ছন্ন সারিতে ছ'ফুট অন্তর-অন্তর দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো কাঠের খুঁটি। প্রতিটি খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে সম্পূর্ণ নগ্ন একটি মানুষ! প্রচণ্ড চিৎকারকে বন্ধ করতে নিজের হাত প্রাণপণে কামড়ে ধরলাম। জিভে পেলাম নোনতা স্বাদ।

ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে-মুখে কোনও যন্ত্রণার ছাপ নেই। এবার সারির দূর প্রান্তে কারও চলাফেরার প্রতি নজর পড়ল। সে-দৃশ্যের তাৎপর্য প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, কিন্তু পরক্ষণেই উত্তপ্ত বাতাসের ঝাপটার মতো কঠিন সত্যটা আমার মনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার হৃৎপিণ্ড যেন স্পঞ্জের টুকরো—সেটাকে কেউ যেন আরও টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে নিচ্ছে। আমি আবার দেখলাম সারি বাঁধা অসহায় মানুষগুলোর দিকে। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল, ছটফট করে উঠল নিঃশব্দ প্রতিবাদে। চোখ বন্ধ করলাম, কিন্তু তখনও সেই ভয়াবহ আতঙ্ক আমার মস্তিষ্কে আঁচড় কেটে চলেছে। অবশেষে আবার চোখ খুললাম—তাকালাম স্পষ্ট দৃষ্টিতে।

সামনেই ওটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বারো ফুট লম্বা টলোমলো একটা বিশাল জিনিস। তার গোড়াটা প্রায় সাতফুট ব্যাসের, সেখান থেকে সামান্য সরু হয়ে গেছে ডগার নিকে। ডগা থেকে শুঁড়ের মতো অসংখ্য বাহু চারপাশে ছড়িয়ে সাপের মতো সরসর করে কাঁপছে। জিনিসটার সঙ্গে এক ধরনের সামুদ্রিক ফুলের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। প্রতিটি শুঁড় প্রান্তের দিকে ক্রমশ চ্যাপটা হয়ে গেছে পাতার মতো। দেখে মনে হল, সেগুলো হাতের মতোই কাজ করতে সক্ষম। জিনিসটার রং ঘোলাটে লাল, এবং তার সমস্ত শরীরে কালো চাকা-চাকা দাগ—অনেকটা আঁচিলের মতো। বুঝলাম, যেন কেউ আমাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল, এই অপার্থিব বীভৎস জিনিসটা একটা উদ্ভিদ!

ঠিক কী যে ঘটছে সেটা প্রথমে ঠাহর করতে পারলাম না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার মস্তিষ্কই আমাকে সে-ভয়ঙ্কর বাস্তব উপলব্ধি করতে দেয়নি। দ্বিতীয়বার তাকিয়েই বুঝলাম জিনিসটা কী করছে—এবং আমার মন আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

pathagar.net

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সামনে থেকে আমার মস্তিষ্ক প্রচণ্ড ত্রাসে খুলি চৌচির করে পালিয়ে যেতে চাইল।

নারকীয় গাছটা সারি ধরে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। দেখলাম, বাঁধন খুলে একজন পুরুষকে ওটা তুলে নিল। ক্ষুধার পাতাগুলো হতভাগা লোকটির হাত-পা-মাথা বিদ্যুৎঝলকের মতো বিচ্ছিন্ন করল। যেন কোনও পাতাবাহার গাছকে কাঁচি দিয়ে ছাঁটা হচ্ছে। তারপর সেই অবশিষ্ট দেহটা তুলে ধরা হল উঁচু করে। গাছটার ওপরের অংশ খুলে গিয়ে প্রকাশিত হল এক বিশাল অন্ধকার মুখগহ্বর—সেই বিচ্ছিন্ন শরীর থেকে চলকে বেরোনো রক্ত প্রচণ্ড মনোযোগে গাছটা পান করতে লাগল। একইসঙ্গে আনন্দে খুশিতে গাছটার গোটা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। দেহটার শেষ রক্তের ফোঁটা যখন শেষ হল, তখন সেটা ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল গলিত শবদেহের এক স্তূপে, এবং সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা এগিয়ে চলল পরের মানুষটার দিকে। বরফের হৃৎপিণ্ড নিয়ে দ্বিতীয়বার একই দৃশ্যের সাক্ষী হলাম!

ভালোভাবে মাথা তুলতেই দেখলাম, গোটা জায়গাটায় অসংখ্য মানুষ খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বন্দিদের মধ্যে পুরুষ ছাড়া স্ত্রীলোকও রয়েছে। এবং তাদের মাঝে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে কুড়িটারও বেশি রক্তপিপাসু ভয়ঙ্কর উদ্ভিদ। সেই মৃত্যু উপত্যকায় বন্দির সংখ্যা হয়তো হাজারেরও বেশি, কিন্তু তাদের একজনকেও বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে দেখলাম না। এমনকী সঙ্গীদের নৃশংস পরিণতি দেখেও তারা কেমন নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, তারা যেন ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করছে।

স্নায়ু-ছেঁড়া কয়েক ঘণ্টা প্রতীক্ষায় কেটে গেল। নারকীয় অনুষ্ঠানের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদের তৃষ্ণার যেন আর শেষ নেই। আমার মন ততক্ষণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। আতঙ্ক অনুভবের শেষ সীমায় পৌঁছেছি মনে করে চেয়ে রইলাম সামনের দৃশ্যের দিকে। তাকিয়ে আছি—দেখছি তাদের ধীর টলোমলো চলাফেরা, তৃষ্ণা নিবারণের নৃশংস পদ্ধতি, হঠাৎই একটা ছোট পাথরের আড়ালে একটা চাপা আলোড়ন আমার নজরে পড়ল।

কতকগুলো শয়তান গাছ নিজেদের মধ্যে হিংস্রভাবে লড়াই শুরু করেছে। হঠাৎই ওরা ছিটকে বেরিয়ে এল, এবং প্রায় দশটা গাছ ছুটে চলল পড়ে থাকা মানুষের বিচ্ছিন্ন মাথাগুলোর দিকে। যেন কোনও দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে : সবচেয়ে বেশি মাথা কে সংগ্রহ করতে পারে। তারপর ওরা ইতস্ততভাবে ছুটে বেড়াতে লাগল, মাথাগুলো ছুড়ে দিতে লাগল শূন্যে, আর অসংখ্য শুঁড় দিয়ে সেগুলো আবার লুফে নিতে লাগল। যেন কোনও উন্মাদ জগতে বাচ্চারা বল নিয়ে খেলা করছে। তাদের হাঁটাচলার ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারলাম না; শুধু মনে হল, ওরা যেন মসৃণভাবে হাওয়ায় ভর করে এগিয়ে চলেছে।

উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সংকেতে ঘাড়ের কাছে কেমন শিরশির করে উঠল। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিদ্যুৎবেগে ঘুরে বসলাম, এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। ওই সময়ে উঠে না দাঁড়ালে আমার ঘাড় লক্ষ্য করে নেমে আসা চূড়ান্ত আঘাতটা আমি মাথা নামিয়ে এড়াতে পারতাম না।

আসন্ন আঘাতের জন্যে প্রস্তুত থাকলেও আসন্ন দৃশ্যের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আক্রমণকারী একজন মানুষ। উলঙ্গ দেহ, ছুঁচলো দাঁত, বড়-বড় চুল, পাশবিক দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। তার হাতে একটা নল। সে ইঙ্গিতে আমাকে বোঝাতে লাগল যে, নলটা সে আমার শরীরে ঢুকিয়ে রক্ত পান করতে চায়। বিচিত্র চিঁচিঁ শব্দ করে সে ধীরে-ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, হাতের হতচ্ছাড়া নলটা সামনে বাড়ানো। তার মুখের ভাবে কেমন এক অদ্ভুত বিহ্বল অভিব্যক্তি। তাকে রক্ত পানে বাধা দেওয়ার কারণ সে যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। রাগের বদলে সেই অবিশ্বাস-বিস্ময়ের ছাপটুকুই তার মুখে ফুটে উঠেছে। নিষ্ফল ছোবলের ভঙ্গিতে সে এগিয়ে আসতে লাগল, থামল না। অবশেষে একটা পাথর তুলে নিয়ে লোকটাকে লক্ষ করে ছুড়ে মারলাম।

পাথরের আঘাত এড়ানোর কোনও চেষ্টাই সে করল না—বিপদের মুহূর্তে এমন ভয়ঙ্কর নির্বিকার আচরণ আমি কখনও দেখিনি। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, এবং একটা বিশ্রী শব্দ করে পাথরটা সরাসরি আঘাত করল তার মুখে। গোড়াকাটা কলাগাছের মতো সশব্দে পড়ে গেল লোকটা।

দাঁড়িয়ে আছি। বিদ্রোহী পাকস্থলীকে একান্ত চেষ্টায় সংযত রাখার চেষ্টা করছি, অকুস্থলে এসে উপস্থিত হল একজন পুরুষ ও একটি মেয়ে—দুজনের হাতেই একটা করে নল। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলাম, কিন্তু ওরা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না, সোজা এগিয়ে গেল তাদের সঙ্গীর পড়ে থাকা দেহের দিকে। তার পাঁজরে দু-দিক থেকে দুটো নল বসিয়ে দিল দুজনে, উবু হয়ে বসে নলের অন্য প্রান্তে ঠোঁট লাগিয়ে চুষতে শুরু করল। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বুঝলাম, যে-কোনও মুহূর্তে আমার শরীর অবশ হয়ে আসতে পারে। এ-নারকীয় দৃশ্য আমি কতক্ষণ সহ্য করব? ছুটে পালিয়ে যেতে চাইলাম, ইচ্ছে হল বমি করতে, কিন্তু অপলক চোখে তাকিয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

মেয়েটা নল থেকে মুখ তুলে একপলক আমার দিকে তাকাল—শূন্য নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। তারপর ও প্রথম লোকটার পড়ে থাকা নলটা তুলে নিল। সেটা উঁচিয়ে ধরে আমাকে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে ইশারা করল।

আমাকে হাত তুলে ইশারা করতে গিয়ে সঙ্গীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মেয়েটা। এবং আমি সাবধান করার আগেই ওর সঙ্গী মৃতদেহ থেকে নিজের নলটা বের করে নিয়ে মেয়েটির শরীরের গভীরে, ডান স্তনের ঠিক নীচে বসিয়ে দিয়েছে।

হাতের নলটা ফেলে দিয়ে অস্ফুটভাবে বারকয়েক কাশল মেয়েটা। মুখ ফিরিয়ে দেখল, ওর সঙ্গী তার বিশ্রী ঠোঁট নলের অপর প্রান্তে নামিয়ে টানছে। ততক্ষণে নল বেয়ে রক্ত বইতে শুরু করেছে। বুকে সবচেয়ে কাঁপন ধরাল মেয়েটার অভিব্যক্তি ঃ ওর মুখে আবেগ অভিব্যক্তির লেশমাত্র নেই।

প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম। একটা বড়সড় পাথর তুলে নিয়ে লোকটার মাথায় নামিয়ে আনতে যাব, একটা অদ্ভুত তীব্র শিসের শব্দে ফিরে তাকালাম। বারোটারও বেশি দুঃস্বপ্নের উদ্ভিদ আমাকে ঘিরে ফেলেছে। পাথরটা সর্বশক্তি দিয়ে

ওদের মাঝে ছুড়ে দিলাম। নিতান্তই নিষ্ফল চেষ্টা। হিলহিলে শুঁড় নিয়ে ওরা এগিয়ে আসতে লাগল, একইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে সেই তীব্র শিসের শব্দ। লোকটা আর মেয়েটাকে ওরা ঘিরে ধরল। ন্যাকড়ার পুতুলের মতো তুলে নিল দুজনকে। তারপর আমাকে অসংখ্য শুঁড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। আমার হাতদুটো বজ্রবাঁধুনিতে বন্দি হল। আমি তখন অসহায়।

প্রচণ্ড ভয়ের সঙ্গে দেখলাম, একটা গাছ লোকটির লম্বা চুল ধরে তাকে শূন্যে তুলল। তারপর অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় একটা ধারালো পাতা গভীরভাবে বসিয়ে দিল তার ঘাড়ের পাশে। লোকটা নিশ্চলভাবে শূন্যে ঝুলতে থাকল, আর সেই শয়তান গাছটা তার গলার চারদিকে করাতের মতো পুচিয়ে-পুচিয়ে কেটে চলল।

দেখলাম, অন্য একটা শুঁড় লোকটার পা দুটো জড়িয়ে ধরে টানতে লাগল। সুতরাং এও দেখলাম, লোকটার মাথাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং একইসঙ্গে তার গলার নলি, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড এবং যকৃৎ ঝুলন্ত রক্তাক্ত অবস্থায় বেরিয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

জেগে উঠে নিজেকে নগ্ন এবং খুঁটিতে বন্দি অবস্থায় আবিষ্কার করলাম।

চারপাশে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। তিন ফুট দূরের খুঁটিতে বাঁধা একটি মেয়ে ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

অল্প হেসে ও বলল, 'কী সুন্দর জায়গা, না?'

আগেই লক্ষ করেছি, এ-জায়গাটা আগের চেয়ে অনেক ছোট। এখানে মাত্র জনা তিরিশেক বন্দি রয়েছে। কিন্তু আমার সমস্ত মনোযোগ একাগ্রভাবে নিবদ্ধ মেয়েটার দিকে। ও কথা বলছে, এবং সে-কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি!

'তুমি কথা বলতে পারো!' আমার মুখ দিয়ে শব্দগুলো বেরিয়ে গেল।

'নিশ্চয়ই।' ও আবার হাসল ঃ 'তোমাকে আমার ভালো লাগছে। ওরা ঠিক করেছে আমাদের জোড় খাওয়াবে। শুনে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।'

'জোড় খাওয়াবে?'

'হ্যাঁ। আমাদের একসঙ্গে শোয়াবে, জোড় খাওয়াবে। তোমার জ্ঞানবুদ্ধি নিশ্চয়ই বেশি—তাই এ-জায়গায় তোমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। এটাই সবচেয়ে সেরা জায়গা।'

ও নিজের চারপাশে একবার দেখল, তারপর বলল, 'আমাদের তিরিশজনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান পাওয়ার আশায় বারবার মিলিয়ে-মিশিয়ে জোড় খাওয়ানো হয়েছে। আমাদের দেখতে খুব সুন্দর, তাই না?' ও গর্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল : 'আমরা বড় মাঠের ছন্নছাড়া কিংবা খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো বুনো মানুষগুলোর মতো নই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও ঃ 'এখানে আমার ভীষণ ভালো লাগে,' ও হাসল ঃ 'আমরা দেখতে এত সুন্দর!'

এক মুহূর্তের জন্যে আমার দু-চোখ স্থির হয়ে রইল মেয়েটির মুখে, শরীরে। আমার দেখা মেয়েদের মধ্যে এই মেয়েটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দরী।

ওর লম্বা ঢেউ খেলানো কালো চুলের বন্যা নেমে এসেছে সরু কোমর পর্যন্ত। ডিম্বাকৃতি কমনীয় মুখ, টানা-টানা দু-চোখের রং কালো। ওর শরীর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না। এবং দ্বিতীয়বার যখন ওর দিকে চোখ রাখলাম, অনুভব করলাম,

pathagar.net

আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি। নিজের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দু-চোখ ভরে ওকে দেখতে লাগলাম ঃ আমার দৃষ্টি ওর স্বর্গীয় সৌন্দর্যে খেলে বেড়াতে লাগল।

পেছন থেকে একটা হিসহিস শব্দ হঠাৎ কানে এল। নতুন কোনও আতঙ্কের জন্যে নিজেকে তৈরি করে অতি কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম। দেখলাম, সেই ভয়ঙ্কর গাছগুলোর একটা খুঁটির সারি ধরে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। এ-দৃশ্য আমার কাছে পরিচিত। কিন্তু অপরিচিত হিসহিস শব্দের উৎসটা প্রথমে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। অবশেষে অনুভব করলাম, একটা সুন্দর উত্তেজক সেন্ট ওই গাছটা আমাদের গায়ে স্প্রে করছে। হিসহিস শব্দটা স্প্রে করারই শব্দ। ঠিক বুঝলাম না, সেন্টটা কৃত্রিমভাবে তৈরি, না প্রাকৃতিক নিয়মমাফিক উদ্ভিদটার শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে। গাছটা খুঁটির সারি ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, আর হিসহিস শব্দে তার মাথার গহ্বরটা একবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। এবং একইসঙ্গে সেই নেশা-ধরানো সুগন্ধী আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সে-অনুভূতির কোনও তুলনা নেই। তাকালাম পাশের মেয়েটির দিকে—ও আমার, সম্পূর্ণ আমার। আমি সশব্দে হেসে উঠলাম। মেয়েটাও আমার দিকে চেয়ে হাসল, দুষ্টু-মদির হাসি। ওর ভেনাস-শরীরটাকে খুঁটির গায়ে ওপরে নীচে ঘষতে লাগল। ওর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হল গভীর প্রশ্বাসে, সুগন্ধী আঘ্রাণের প্রয়াসে। লক্ষ করলাম, ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে ওর বুক দুটো সুষম ছন্দে উঠছে নামছে। বন্দি অবস্থায় যতখানি সম্ভব ঝুঁকে পড়লাম ওর দিকে, আমার রক্তে তখন দাপাদাপি করছে ডোরাকাটা বাঘ।

ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছি, কীসের একটা হালকা ছোঁয়া আমার মুখে লেগেই হারিয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে তাকালাম ঃ সরাসরি চোখ পড়ল সেই লোকটার হিংস্র বন্য মুখের দিকে। সেই লোকটা, যে খোলা জায়গায় নল-হাতে মেয়েটার সঙ্গী ছিল।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে হাসিমুখে মাথা নাড়তে-নাড়তে চলে গেল। অবাক-বিস্ময়ে তার অপসৃয়মাণ শরীরের দিকে চেয়ে রইলাম। একটা গাছ তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—অথবা ঠিকভাবে বলতে গেলে, তার অবশিষ্টাংশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটার যতটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি, তা হল একটা ভিজে চুঁইয়ে পড়া ব্যাগ থেকে বেরিয়ে থাকা তার মাথাটা। তার গলার নলী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং যকৃৎ রয়েছে সেই ব্যাগের ভেতর। ব্যাগটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে গাছটার বাঁ-কাঁধে—যদি অবশ্য তাকে কাঁধ বলা যায়। সেই অবস্থায় লোকটা একটানাভাবে আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল, মাথা নাড়তে লাগল। আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি গুলিয়ে উঠল। কারণ বুঝলাম, যেভাবেই হোক লোকটা এখনও বেঁচে রয়েছে!

উদ্ভিদ-রাক্ষসটা খানিকটা এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল একইরকম আর-একটা ভেজা ব্যাগ তার অন্য কাঁধ থেকে ঝুলছে। সেটা থেকে উঁকি মারছে সেই মেয়েটির মাথা। ও যেন আমাকে চিনতে পারল, আমাকে লক্ষ করে চোখ নাচাল। বুঝতে পারলাম, নিতান্ত সাজ-সজ্জার প্রয়োজনেই গাছটা এই পৈশাচিক মাথা দুটো নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাণপণে চোখ বন্ধ করে সর্বশক্তি দিয়ে খুঁটিতে মাথা ঠুকে চললাম, চেষ্টা

করলাম এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য মন থেকে মুছে ফেলতে।

'উ—উঃ!' শুনতে পেলাম সামনের ভেনাসের দীর্ঘশ্বাস : 'উঃ কী চমৎকার। এত ভালো কখনও লাগেনি।'

চোখ খুললাম, তাকালাম ওর দিকে। খুঁটির গায়ে শরীরের ভার রেখে আধবোজা চোখে ও আমার দিকে চেয়ে হাসল। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ওর ভুরুতে ঘামের ছোট-ছোট ফোঁটা ভোরের শিশিরের মতো চকচক করছে।

'উঃ' ও হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'এত ভালো কোনওদিন লাগেনি। এ নিশ্চয়ই তোমার জন্যে হয়েছে।' ও আমাকে লক্ষ করে হাসল। উষ্ণ হাসি।

'তুমি টের পাওনি?' ও প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' উত্তর দিলাম। যদিও ঠিক বুঝলাম না ও কী বলতে চাইছে।

'আমাদের মিলনের আর বেশি দেরি নেই।' ও বলল, 'আমি জানি আমার খুব ভালো লাগবে।'

'এভাবে আমাদের কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

প্রথমে বোধহয় আমার কথা শুনতে পেল না। দেখলাম ও চোখ বন্ধ করেছে; ওর মুখের অভিব্যক্তি এবং শরীরের প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল ও কী ভাবছে। বুঝলাম, আমি ওর প্রেমে পড়েছি, এবং সম্ভব হলে ওকে এ দুঃস্বপ্ন থেকে আমি রক্ষা করতে চাই।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'এভাবে কতক্ষণ আমাদের এখানে থাকতে হবে?'

ও চোখ খুলে তাকাল।

'কতক্ষণ? তার মানে?'

'তার মানে কতক্ষণ? কখন এসে ওরা আমাদের বাঁধন খুলবে?'

'বাঁধন খুলবে? ওরা কখনও আমাদের বাঁধন খোলে না। এরকম খারাপ কথা বললে তোমাকে আমি আর ভালোবাসব না। এ-খুঁটি ছাড়া আমি তো আর খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো বুনো মানুষ নই!'

'কিছু মনে কোরো না,' আমি বললাম, 'আমি জানতাম না।'

'তুমি ভারি অদ্ভুত,' আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'সবাইয়ের চেয়ে আলাদা।' ও স্থিরচোখে চেয়ে রইল আমার চোখে।

অবশেষে ও বলল, 'খুব শিগগিরই ওরা তোমার বাঁধন খুলে দেবে।'

'খুলে দেবে? কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

'আমার সঙ্গে এক খুঁটিতে তোমাকে বেঁধে দেওয়ার জন্যে, বোকা কোথাকার!' ও হাসল।

'ও—' মুখে রক্তের ঝলক অনুভব করে বলে উঠলাম।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর আমি ঠিক করলাম একটু নতুন পথে এগিয়ে দেখি।

'তুমি কি চাও তোমার খুঁটির সঙ্গে আমাকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখা হোক?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'উ-হু, তা সম্ভব নয়।' ও উত্তর দিল, 'কিন্তু হলে ভালোই লাগত।'

pathagar.net

আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আর সময় পেলাম না।

'খাবার এসেছে!' সারি থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'খাবার!'

ঘাড় ফেরালাম কণ্ঠস্বরের উৎস সন্ধানে। আমরা তিরিশজন তাকিয়ে রইলাম একই দিকে। দুটো গাছ সারি ধরে হেঁটে আসছে। তাদের হাতে একটা বড় ব্যাগ। ব্যাগ থেকে একটা নল বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পালা করে নলটা তুলে দেওয়া হল উপোসী বন্দিদের মুখে। তারা উন্মাদ উত্তেজনায় নলটা চুষতে লাগল। একজনের পালা শেষ হতেই নলটা ছিনিয়ে নিয়ে পরের জনকে দেওয়া হচ্ছে।

অনুভব করলাম, আমি নিজেও ভীষণ ক্ষুধার্ত। অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, অন্যান্যদের মতো আমিও খিদের জ্বালায় বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করছি। অপেক্ষা করছি আমার পালা আসার জন্যে। গাছ দুটো আরও কাছে আসতেই ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেলাম। যেটাকে আমি দূর থেকে ব্যাগ মনে করেছি, সেটা আসলে একটা মানুষের দেহ—শক্ত বাঁধনে বলের আকারে বাঁধা। ওরা এতক্ষণ তারই রক্ত পান করেছে।

এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকিয়ে ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু আমার চেয়ে ওঁদের শক্তি অনেক বেশি। ওরা নলটাকে জোর করে গুঁজে দিল আমার মুখে। আমি রক্ত পান করতে বাধ্য হলাম। মেটালাম বুক ভরা তৃষ্ণা—হায় ভগবান! তারপর ওরা এগিয়ে গেল আমার ভালোবাসার মেয়ের কাছে। কিন্তু তখন আমি আবার তৃষ্ণায় পাগল হয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করেছি। দেখলাম, ও নলে মুখ লাগিয়ে ভীষণ তৃপ্তিতে চুষে চলেছে।

সন্ধে নেমে এল নিঃসাড়ে। আমার বাঁধন যে অনেক ঢিলে হয়ে গেছে সেটা বুঝতে আমার আরও কিছু সময় লাগল। হাত নাড়তে চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ, সত্যিই বাঁধন অনেক ঢিলে ঠেকছে। পাগলের মতো বাঁধন খুলতে শুরু করলাম। তখন বুঝলাম, আসলে কী ঘটেছে। খাওয়ার সময় বাধা দিতে গিয়ে ধস্তাধস্তি হয়েছে। তাতে একটা গাছের ধারালো পাতা আমার বাঁধনের কয়েক জায়গায় কেটে বসেছিল।

'সোনা, শুনছ—' ফিসফিস করে ওকে ডাকলাম, 'এই শুনছ, আমার বাঁধন খুলে গেছে।'

ও তাকাল আমার দিকে, ওর চোখ গোল-গোল হয়ে উঠল।

'কী করছ তুমি? খবরদার, ওরকম কাজ কোরো না। আমি বলে দেব! চেঁচিয়ে বলে দেব!'

ও চিৎকার করতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে আমার বাঁধন খোলা হয়ে গেছে। এক লাফে ওর সামনে হাজির হয়ে ওর মুখের ওপর হাত চেপে ধরলাম। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ও জুঝতে লাগল। তখন আমি হাত সরিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলাম ওর ঠোঁটে। ওঃ, সেই সুখের স্মৃতি! সেই মুহূর্তে আমরা এক নীরব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলাম। ও আমাকে আর বাধা দিল না। ওর বাঁধন খুলে আমরা দুজনে পালাতে শুরু করলাম। অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চললাম বাঁচার আশ্বাসে।

অবশেষে পাথর বালিয়াড়ির খাড়াই পেরিয়ে এলাম। অবিশ্বাস্য মনে হলেও চোখে পড়ল সামনেই নীল চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে রোভার। শক্ত হাতে ওর হাত ধরে লাফিয়ে, হোঁচট খেয়ে, খাড়াই বেয়ে নামতে শুরু করলাম। তারপর এক

সময় উঠে বসলাম গাড়িতে। উন্মাদের মতো ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করছি, কানে এল বুক কাঁপানো শিসের শব্দ। মনে হল, গাড়ির ব্যাটারি বুঝি অকেজো হয়ে গেছে। শিসের শব্দটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে!

শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়লাম। এক প্রচণ্ড ঝটকা দিয়ে চাকার আর্তনাদ তুলে গাড়িটা ছুটতে শুরু করল। হঠাৎ শুনতে পেলাম বজ্রপাতের তীব্র ভয়ঙ্কর শব্দ। সবকিছু যেন ঝাপসা হয়ে গেল, তারপর ভীষণ সংঘাতের পর ঠিক বিপরীতভাবে স্পষ্ট হয়ে আবার ফিরে এল চোখের সামনে। চোখ পড়ল চাঁদের হলদে আলোর দিকে। শেষ পর্যন্ত আমরা ফিরে এসেছি। আর আমাদের ভয় নেই।

'হ্যাঁ, মিস্টার কার্টিস, এক আতঙ্কের আবর্তের মধ্যে দিয়ে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম এক সমান্তরাল জগতে। আর তার চেয়েও বড় কথা, আমি আবার ফিরে এসেছি।'

আমি তাকালাম সাদা-চুল বৃদ্ধের দিকে।

'মিস্টার ব্লুম, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কাহিনি আমি কখনও শুনিনি।' আমি বললাম, 'কিন্তু তবুও আপনার একটা সান্ত্বনা আছে। আপনার সেই সুন্দরী বউয়ের কী হল?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, 'ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই, মিস্টার কার্টিস, কারণ, ওই অভিজ্ঞতাই আমাকে উপহার দিয়েছে এই অকালবার্ধক্য। যাকগে, আমার কাহিনি তো শুনলেন—এ থেকে আপনি হয়তো অনেক পয়সাও পাবেন, কিন্তু আমার পারিশ্রমিকের কী ব্যবস্থা করবেন?'

'পারিশ্রমিক, মিস্টার ব্লুম?'

'পারিশ্রমিক, মিস্টার কার্টিস।'

'ও, হ্যাঁ—আমার কাগজ আপনাকে ভালোই টাকা দেবে, আপনি নিশ্চিত থাকুন...।'

'না, টাকা নয়, টাকা কে চাইছে?'

'তা হলে কী?'

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন! একটা নল হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

'আমার বউ খিদেয় ছটফট করছে, মিস্টার কার্টিস। আমার এই ভাঙা শরীরে বেশি রক্ত আর নেই। দিনের-পর-দিন কীভাবে আমি পারব?' তিনি নলটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে : 'পারিশ্রমিক হিসেবে শুধু একটু রক্ত দিন, মিস্টার কার্টিস। আমার সোনামণির জন্যে একটুখানি রক্ত দিন।'

'না!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। লাফিয়ে উঠে এক ধাক্কা মারলাম ওকে। আমার উন্মাদ আঘাতে তাঁর শীর্ণকায় পলকা শরীর ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

ভদ্রলোক সম্ভবত পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন, এবং এই গল্পটা তাঁর উন্মাদ মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মরুভূমির সূর্যের তাপে তাঁর চিন্তা-ভাবনার

সমতা সেদিন ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

তিনি উঠে বসলেন। শুকনো জীর্ণ শরীরটা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললেন চোখ-ধাঁধানো ফুলের পসরা সাজিয়ে বসে থাকা ক্যাকটাসটার দিকে। রুদ্ধ কান্নায় বৃদ্ধের দেহ কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

'ও আমাকে দেবে না বলছে, সোনা, একটা ফোঁটাও দেবে না। কেন, আমার এই গাছটা কি এক বিন্দু রক্ত পাওয়ারও যোগ্য নয়?' গাছটাকে জড়িয়ে ধরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ওটার গায়ে মাথা রেখে চোখ বুজলেন।

সত্রাসে লক্ষ করলাম, গাছটার ডাল দুটো নড়ে উঠল, ধীরে-ধীরে জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

কী করছি বুঝে ওঠার আগেই আমি এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠেছি, এবং মেঝে থেকে বিকট-দর্শন ছুরিটা তুলে নিয়ে নৃশংসভাবে সুন্দর ক্যাকটাসটাকে আঘাত করতে শুরু করেছি।

এক প্রচণ্ড যন্ত্রণার চিৎকার শোনা গেল : আহত কোনও স্ত্রীলোকের আর্তচিৎকার। বৃদ্ধ ছিটকে পড়লেন একপাশে। আতঙ্ক-বিস্ময়ে দেখলাম, সেই অদ্ভুত গাছটা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। শুধু শোনা যাচ্ছে আর্তচিৎকার ও কাতরানির শব্দ। আরও দেখলাম, গাছটার অসংখ্য কাটা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। লাল রক্ত।

অবাস্তব ঝাপসা দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনাটা এখনও আমার মনে পড়ছে। সাপের মতো হিলহিল করা রক্তাক্ত ক্যাকটাস; ওটার চারপাশে যন্ত্রণায় টলোমলো পায়ে ঘুরে বেড়ানো বৃদ্ধ; বুকে হাত চেপে তিনি যেন শ্বাসকষ্টে ছটফট করছেন। এরপর ঠিক কী ঘটেছে তা আমার কাছে অস্পষ্ট, ঝাপসা। যেন কোনও বিকৃত পরকলায় প্রতিসৃত হয়ে সে-দৃশ্য আমার চোখে ছায়া ফেলেছে। যেন এক দুরন্ত কুয়াশা কোনও রহস্যের পরদায় তাকে ঘিরে রেখেছে।

মনে পড়ছে, ছুরিটা আমার হাত থেকে খসে পড়েছিল। বৃদ্ধের মৃতদেহটা শুয়ে ছিল চিৎ হয়ে। তাঁর একটা হাত বুকের ওপরে খামচে ধরা, অন্য হাতটা নিষ্ফল চেষ্টায় মৃত্যুমুখী গাছটার দিকে বাড়ানো। আমি সভয়ে পিছিয়ে এসেছি। আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে কেমন টলে উঠেছিল।

মনে আছে, এক ছুটে হোঁচট খেতে-খেতে আমি সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, উঠে বসেছি গাড়িতে। আমার উন্মাদ-চিৎকার এক মুহূর্তের জন্যেও থামেনি এবং রাস্তা ধরে গাড়িও ছুটিয়েছি ভূতগ্রস্তের মতো। মনে আছে, বজ্রপাতের মতো ভয়ঙ্কর এক তীব্র শব্দ আমার কানে এসেছে; দেখেছি, গোটা পৃথিবীটা চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল এবং ভীষণ সংঘাতে ঠিক বিপরীতভাবে আবার স্পষ্ট হয়ে ফিরে এল।

এবং এখন, এই মুহূর্তে, আমি চোখ তুলে তাকিয়ে আছি একটা পান্না-সবুজ সূর্যের দিকে, আর আমার কানে ভেসে আসছে এক অদ্ভুত তীব্র শিসের শব্দ।

আঁধার রাতের আগন্তুক

www.pathagar.net

উইলিয়াম হোপ হজসন

pathagar.net

নক্ষত্রবিহীন এক অন্ধকার রাত। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভাসছে আমাদের জাহাজ। জাহাজের বর্তমান অবস্থান সঠিক বলতে পারব না, কারণ, ক্লান্ত রুদ্ধশ্বাস একটি সপ্তাহ ধরে এক হালকা কুয়াশার আড়ালে সূর্যদেব লুকিয়ে রয়েছেন। এই কুয়াশা কখনও ভেসে বেড়াচ্ছে মাথার ওপরে মাস্তুলটাকে ঘিরে, কখনও বা নীচে নেমে এসে চারিদিকে বিস্তৃত সমুদ্রকে আড়াল করছে।

বাতাস নেই। সুতরাং হাল ঘোরানোর হাতলটা স্থির রেখে ডেকের ওপর আমি একাই দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের নাবিক-দল বলতে মাত্র তিনজন—দুজন পুরুষ ও একটি কিশোর। তারা নিজেদের কেবিনে ঘুমে অচেতন, আর উইল—আমার বন্ধু এবং এই জলযানের ক্যাপ্টেন—জাহাজের বাঁ-দিকে পেছনের অংশে তার ছোট কেবিনের বাংকে শুয়ে।

হঠাৎ চারপাশের ঘন অন্ধকার ভেদ করে ভেসে এল এক চিৎকার, 'এই যে—জাহাজে কেউ আছেন?'

চিৎকারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, আমি বিস্ময়ে সেই মুহূর্তে কোনও জবাব দিতে পারলাম না।

আবার শোনা গেল সেই চিৎকার—অদ্ভুত কর্কশ এক অমানুষিক কণ্ঠস্বর, জাহাজের বাঁ-দিকে অন্ধকার সমুদ্রের কোথাও থেকে ভেসে এল : 'জাহাজে কেউ আছেন?'

'এই যে!' বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আমি চিৎকার করে বললাম, 'কে আপনি?

কী চান?'

'ভয় পাবেন না,' অদ্ভুত কণ্ঠস্বর উত্তর দিল, আমার কথায় কিছুটা আশঙ্কা ও দ্বিধার সুর লক্ষ করেই হয়তো বলল, 'আমি নিতান্তই একজন বৃদ্ধ—মানুষ।'

কথার মাঝখানের ছোট্ট বিরতিটা কানে বাজল, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে।

'তা হলে জাহাজের কাছে কেন আসছেন না?' কিছুটা রূঢ় স্বরেই জানতে চাইলাম, কেননা আমার আশঙ্কা ও দ্বিধা নিয়ে তার ইঙ্গিত আমার ভালো লাগেনি।

'না—না, তা হয় না। সেটা ঠিক ভালো হবে না। আমি...' কণ্ঠস্বর মাঝপথেই থেমে গেল, আর তারপর সব চুপ।

'তার মানে?' আমার বিস্ময় ক্রমে বাড়তে লাগল : 'কী ভালো হবে না? আপনি কোথায়?'

এক মুহূর্ত কান পেতে শুনলাম। কোনও উত্তর নেই। তারপর কেন জানি না, আকস্মিক অনিশ্চিত এক সন্দেহ জেগে উঠল আমার মনে। চকিতে হাত বাড়িয়ে একটা উজ্জ্বল লণ্ঠন তুলে নিলাম। একইসঙ্গে পা দিয়ে ডেকে আঘাত করে নীচের কেবিনে শোওয়া উইলকে জাগাতে চেষ্টা করলাম।

আবার ফিরে এলাম ডেকের কিনারায়। হলদে আলোর শঙ্কু ছড়িয়ে পড়ল রেলিংয়ের ওপারে নিস্তব্ধ বিশালতায়। সঙ্গে-সঙ্গে কানে এল একটা চাপা অস্ফুট চিৎকার, আর তারপরেই জলের ছলাত-ছলাত শব্দ, যেন কেউ আচমকা অন্ধকার সমুদ্রে বইঠা ডুবিয়েছে। তবু বলতে পারি না আমি স্পষ্ট কিছু দেখেছি; শুধু মনে হল, আলোর প্রথম ঝলক যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন জলের ওপরে কিছু একটা ছিল—এখন আর নেই।

'কী হল!' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এটা কোন ধরনের ঠাট্টা!'

কিন্তু রাতের অন্ধকারে শুধু ভেসে এল কোনও নৌকার বইঠা বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার অস্পষ্ট শব্দ।

আর তখনই ডেকের পাটাতন-দরজার দিক থেকে কানে এল উইলের কণ্ঠস্বর, 'কী হয়েছে, জর্জ?'

'এদিকে আয়, উইল!' আমি বললাম।

'কী হল!' আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে ও প্রশ্ন করল।

ওকে অদ্ভুত ঘটনাটা পুরোপুরি খুলে বললাম। উইল অনেক প্রশ্নই জিগ্যেস করল, তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুখের পাশে হাতের আড়াল দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'নৌকায় কে আছেন, শুনছেন!'

বহুদূর থেকে একটা ক্ষীণ উত্তর ভেসে এল, এবং আমার বন্ধু আবার ডেকে উঠল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আমরা শুনতে পেলাম বইঠার চাপা শব্দ। শব্দ শুনে উইল আবার ডাকল।

pathagar.net

এবারে উত্তর পেলাম।

'আগে আলোটা সরিয়ে নিন।'

'সরিয়ে নিতে বসে আছি,' আপনমনে বিড়বিড় করে বললাম। কিন্তু উইল আমাকে রহস্যময় কণ্ঠস্বরের অনুরোধ রাখতে বলল, এবং আলোটা আমি নীচে নামিয়ে রাখলাম।

'কাছে আসুন,' ও বলল।

উত্তরে বইঠার শব্দ হয়েই চলল। তারপর মোটামুটিভাবে ছ'বাঁও দূরে এসে সেই শব্দ আবার থেমে গেল।

'জাহাজের পাশে আসুন,' উইল উঁচু গলায় বলল, 'এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'কথা দিন যে, আপনারা আলো ফেলবেন না?'

'আলো ফেললে আপনার কী?' আমি ফেটে পড়লাম : 'আলোকে আপনার এত ভয় কেন?'

'কারণ...' বলতে শুরু করে মাঝপথে থেমে গেল কণ্ঠস্বর।

'কারণ কী?' তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলাম আমি।

উইল আমার কাঁধে হাত রাখল।

'এক মিনিট থাম,' চাপাস্বরে ও বলল, 'আমি দেখছি।' বলে রেলিংয়ের ওপর আরও ঝুঁকে পড়ল।

'দেখুন, মশাই,' উইল বলল, 'এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! আপনি কোত্থেকে এই প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে হুট করে আমাদের কাছে এসে উদয় হলেন? কী করে জানব বলুন আপনার মনে কী মতলব আছে? আপনি বলছেন, আপনি একা। সেটা না দেখলে কী করে বিশ্বাস করি, বলুন? আলোতে আপনার আপত্তিটা কীসের?'

ওর কথা শেষ হতেই আবার বইঠার ছপছপ শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল—এখন অনেক দূর থেকে, এবং স্বর অত্যন্ত করুণ ও চূড়ান্ত হতাশায় ভরা।

'আমি—আমি দুঃখিত! আপনাদের বিরক্ত করা আমার ঠিক হয়নি। শুধু আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত, তাই...আর ওরও ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। এখন শুধু ভেসে আসছে এলোমেলো বইঠার শব্দ।

'থামুন!' উইল চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি আপনাকে তাড়িয়ে দিতে চাইনি। ফিরে আসুন। আপনি যখন চাইছেন না তখন আমরা আলো লুকিয়ে রাখছি।'

উইল ফিরল আমার দিকে।

'ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত, তবে মনে হয় ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু নেই।'

ওর কথার সুরে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল এবং তার উত্তর দিলাম।

'না, তা নেই। মনে হয়, এই বেচারা লোকটা বোধহয় জাহাজডুবি হয়ে

pathagar.net

আশেপাশে কোথাও উঠেছে, এবং পাগল হয়ে গেছে।'

বইঠার শব্দ কাছে এগিয়ে এল।

'আলোটা লুকিয়ে রাখ,' বলল উইল। তারপর রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে কান পাতল।

আলোটা রেখে আমি ফিরে এলাম উইলের পাশে। গজ-বারো দূরে এসে থামল বইঠার শব্দ।

'এখনও কি আপনি কাছে আসবেন না?' মসৃণ স্বরে প্রশ্ন করল উইল, 'আলোটা আমরা সরিয়ে রেখেছি।'

'না—না, তা হয় না,' কণ্ঠস্বর উত্তর দিল, 'কাছে যাওয়ার সাহস আমার নেই। এমনকী আপনাদের থেকে যে খাবার চাইছি তার দাম দেওয়ার সাহসও আমার নেই।'

'সে ঠিক আছে,' উইল বলল, তারপর ইতস্তত করল ও।

'আপনারা খুব ভালো,' উচ্ছ্বাস জানাল রহস্যময় কণ্ঠস্বর : 'ভগবান আপনাদের এর পুরস্কার দেবেন—' তারপর আচমকা থেমে গেল।

'আর কার কথা যেন বলছিলেন?' হঠাৎ উইল বলে উঠল, 'তিনি কি...।'

'আমার প্রেমিকাকে আমি দ্বীপে একা রেখে এসেছি,' উত্তর এল।

'কোন দ্বীপে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'নাম জানি না,' উত্তর দিল কণ্ঠস্বর, 'ভগবানের কাছে...' বলতে শুরু করেও অপ্রত্যাশিতভাবে থেমে গেল।

'তাঁর জন্যে একটা নৌকো পাঠিয়ে দেওয়া যায় না?' এবারে উইল প্রশ্ন করল।

'না, না!' অস্বাভাবিক তীব্রভাবে বলে উঠল সেই কণ্ঠস্বর, 'ওঃ, ভগবান।' এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর আত্মগ্লানির সুরে বলল, 'নিতান্ত দায়ে পড়েই এসেছি—ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না।'

'আমিও আর-এক ভুলোমন জানোয়ার,' নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল উইল, 'আপনি যেই হোন, দয়া করে একমিনিট দাঁড়ান, আপনার খাবারের ব্যবস্থা করছি।' তারপর মিনিট-দুয়েকের মধ্যেই ও ফিরে এল, বিভিন্ন জিনিসে দুটো হাতই ভরতি। রেলিংয়ের কাছে এসে ও থামল।

'আপনি জাহাজের পাশে আসুন না।' ও বলল।

'না—না যাওয়াই ভালো।' কণ্ঠস্বর উত্তর দিল। তার বলার সুরে আমি এক সনির্বন্ধ আকুতি খুঁজে পেলাম, যেন ঐকান্তিক কোনও ইচ্ছেকে এই রহস্যময় ব্যক্তি দমন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তখনই হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মতো আমার খেয়াল হল বেচারি বৃদ্ধ মানুষটি এই ঘন অন্ধকারে যে-জিনিসগুলোর অভাবে কষ্ট পাচ্ছে সেগুলো এখনও উইলের হাতে ধরা রয়েছে। আর তা সত্ত্বেও কোনও অজানা আতঙ্কে আমাদের জাহাজের পাশে ছুটে এসে সেগুলো গ্রহণ করার অদম্য ইচ্ছেকে টুঁটি টিপে সে সংযত করছে। একইসঙ্গে উপলব্ধি করলাম, এই অদৃশ্য ব্যক্তি উন্মাদ নয়, বরং

pathagar.net

সে কোনও অসহ্য আতঙ্কের মুখোমুখি হয়েছে।

'এ-সব ছাড়, উইল।' আমি বললাম, মনে আমার বিভিন্ন আবেগ, তার মধ্যে সীমাহীন সহানুভূতির আধিপত্যই বেশি : 'একটা বাক্স নিয়ে আয়। জিনিসগুলো তাতে ভরে আমরা ভাসিয়ে দেব—যাতে উনি পেয়ে যান।'

তাই করলাম। বাক্সটা জলে ভাসিয়ে একটা লগি দিয়ে ঠেলে দিলাম অন্ধকারে, কণ্ঠস্বরের মালিকের অবস্থান লক্ষ্য করে। মিনিটখানেকের মধ্যেই অদৃশ্য ব্যক্তির কাছ থেকে একটা অস্ফুট চিৎকার শুনতে পেলাম এবং বুঝলাম বাক্সটা যথাস্থানে পৌঁছেছে।

একটুপরেই সে আমাদের শুভেচ্ছা কামনা করে বিদায় জানাল। তার ঠিক পরেই অন্ধকার ভেদ করে কানে এল বইঠার ছলাত-ছলাত শব্দ।

'বিদায় নিতে আর তর সইছে না।' একটু আহত সুরেই উইল মন্তব্য করল।

'দাঁড়া,' আমি উত্তর দিলাম, 'আমার ধারণা উনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। হয়তো খাবারগুলো তাঁর বিশেষ জরুরি দরকার ছিল।'

'নিজের এবং ওই মহিলার জন্যে,' বলল উইল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও আবার শুরু করল, 'যতদিন মাছ ধরছি এরকম অদ্ভুত ঘটনা আমার কাছে এই প্রথম।'

সময় বয়ে চলল। আমাদের চোখে এক ফোঁটা ঘুমের আমেজ নেই।

প্রায় চার ঘণ্টা পর নিস্তব্ধ সমুদ্রে আবার আমরা বইঠার শব্দ পেলাম।

'এই যে, শুনুন।' উইলের স্বরে একটা চাপা উত্তেজনার সুর।

'যা বলেছি ঠিক তাই! উনি আবার ফিরে আসছেন,' আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

বইঠার শব্দ ক্রমে কাছে এগিয়ে এল, এবং লক্ষ করলাম এবারের শব্দ বেশ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী। খাবারটার সত্যিই প্রয়োজন ছিল।

জাহাজ থেকে কিছুটা দূরে এসে বইঠার শব্দ থামল। অন্ধকার ভেদ করে সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল : 'শুনছেন?'

'কে, আপনি?' উইল প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আমি।' কণ্ঠস্বর উত্তর দিল, 'আপনাদের ছেড়ে হঠাৎই চলে গিয়েছিলাম; কিন্তু—কিন্তু বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমার খুব তাড়া ছিল।'

'আপনার প্রেমিকার জন্যে?'

'হ্যাঁ—ও এখন আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতা নিয়েই ও স্বর্গে যাবে—খুব শিগগিরই।'

উইল কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। আমি বিস্ময়ে নীরব। মনে এক অকারণ সহানুভূতির উচ্ছ্বাস।

কণ্ঠস্বর বলে চলল, 'আমরা—মানে, আমি আর আমার প্রিয়তমা, আপনাদের ও ঈশ্বরের উপকারের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। ভেবেছি আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ মাথায় নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। ঠিক করেছিলাম, এ-

pathagar.net

অভিশাপের আতঙ্কের কথা কাউকে কোনওদিন বলব না। কিন্তু ও বলেছে, আজকের রাতের ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের ভয়ঙ্কর কষ্টের কথা আপনাদের খুলে বলি এটা ওর একান্ত ইচ্ছে—স্বয়ং ভগবানেরও তাই ইচ্ছে। তাই আপনাদের বলব আমাদের অকল্পনীয় যন্ত্রণার কাহিনি। এ-কাহিনির শুরু সেদিন, যেদিন—যেদিন—।'

'যেদিন কী?' উইল হালকা স্বরে প্রশ্ন করল।

'যেদিন ''অ্যাল্‌বাট্রস''-এর সমুদ্র-সমাধি হয়।'

'ও, মাস-ছয়েক আগে যে-জাহাজটা নিউক্যাস্‌ল থেকে স্যানফ্রান্সিসকো রওনা হয়ে যায়?' আমার মুখ দিয়ে অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু উত্তর দিক থেকে কয়েক ডিগ্রি দূরে জাহাজটা এক ঝড়ের শিকার হয়, এবং তার মাস্তুল ভেঙে পড়ে। যখন ভোর হল তখন দেখা গেল জাহাজ ফুটো হয়ে গেছে; ফুটো দিয়ে তোড়ে জল ঢুকছে। চারিদিক ক্রমে থমথমে হয়ে এল, নাবিকরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছোট-ছোট নৌকো ভাসিয়ে রওনা হয়ে পড়ল। সেই ধ্বংসস্তূপে ফেলে গেল শুধু আমাদের—আমাকে আর আমার বাগদত্তা একটি নিষ্পাপ তরুণীকে।

'ওরা যখন চলে যায় তখন আমরা নীচে আমাদের জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম। অন্ধ আতঙ্ক ওদের নির্দয় নির্মম করে তুলেছিল। আমরা ডেকের ওপর এসে দেখি বহুদূরে দিগন্তরেখায় ওদের কালো-কালো ফুটকির মতো দেখাচ্ছে। তবু আমরা হতাশ হইনি। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে গড়ে তুললাম একটা ভেলা। ভেলায় প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস চাপালাম, আর নিলাম জাহাজের ভাঁড়ার থেকে সংগ্রহ করা কিছু বিস্কুট, সঙ্গে খাওয়ার জল। তারপর ভেলায় চড়ে রওনা হলাম নিরুদ্দেশের দিকে। আমাদের জাহাজ তখন অনেকটা তলিয়ে গেছে।

'বেশ কিছুক্ষণ পরে খেয়াল করলাম আমরা একটা স্রোতের মুখে পড়েছি। সেই স্রোত আমাদের জাহাজ থেকে কোনাকুনিভাবে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর—হাতের ঘড়ি দেখে বুঝলাম—জাহাজটা ডুবে গেলেও, দেখলাম, তার ভাঙা মাস্তুল তখনও সমুদ্রের ওপরে মাথা তুলে আছে। আর কয়েক ঘণ্টা পর তাও ডুবে গেল। ক্রমে সন্ধে হয়ে গেল। কুয়াশা আমাদের ঘিরে ধরল। এইভাবে রাত কাটল। পরদিন ভোর হতে দেখি কুয়াশা তখনও সরেনি, তবে আবহাওয়া অনেক শান্ত।

'অদ্ভুত এক ধোঁয়াশার ভেতর আমরা চার দিন ধরে ভেসে বেড়ালাম। অবশেষে, চারদিনের দিন সন্ধ্যায় দূর থেকে কানে এল ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস। ক্রমে সে-শব্দ তীব্র হল, তারপর মাঝরাতের কিছু পরে দুপাশ থেকেই শোনা গেল সেই শব্দ—আরও কাছে। ফুলে ওঠা জলের ওপরে ভেসে উঠল আমাদের ভেলা। তারপরে নামল নীচে। আবার ভেসে উঠল। এরকম কয়েকবার ওঠা-নামার পর আমরা শান্ত জলে এসে পড়লাম। ঢেউয়ের গুঞ্জন এখন আমাদের পেছনে।

'ভোর যখন হল তখন আবিষ্কার করলাম আমরা এক বিশাল সামুদ্রিক হ্রদে

pathagar.net

ভাসছি। হ্রদের দিকে ভালো করে তাকানোর সুযোগ পাইনি, কারণ, ঠিক সামনেই কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে চোখে পড়ল এক প্রকাণ্ড জাহাজের ইস্পাত-শরীর। আমরা দুজনে একসঙ্গে হাঁটুগেড়ে বসলাম, ধন্যবাদ জানালাম ঈশ্বরকে। কারণ, আমরা ভেবেছি আমাদের কষ্ট-দুর্দশার বুঝি শেষ হল। কিন্তু না, তখনও অনেক শিক্ষা আমাদের বাকি ছিল!

'ভেলাটা ক্রমে জাহাজের খুব কাছে গিয়ে পৌঁছল। আমরা সাহায্যের জন্যে তার যাত্রীদের উদ্দেশে চিৎকার করে ডাকলাম—যাতে তারা আমাদের জাহাজে তুলে নেয়। কিন্তু না, কেউই কোনও উত্তর দিল না। ততক্ষণে আমাদের ভেলা জাহাজের ধাতব খোল স্পর্শ করেছে। হঠাৎ দেখি, একটা দড়ি জাহাজের পাশ থেকে ঝুলছে। ওটা ধরে বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কারণ দেখলাম, দড়ির গায়ে ব্যাঙের ছাতার মতো এক অদ্ভুত ধূসর রঙের ফাঙ্গাস গজিয়ে রয়েছে, এবং ওই একই ফাঙ্গাস জাহাজের একটা পাশ ঘন ধূসর রঙে সম্পূর্ণ ছেয়ে রেখেছে।

'ওপরে পৌঁছে রেলিং ডিঙিয়ে জাহাজের ডেকে নামলাম। এখানে দেখলাম, ডেকের জায়গায়-জায়গায় ওই ধূসর ফাঙ্গাসের সমারোহ। তার কোনও-কোনওটা আবার সাপের মতো এঁকেবেঁকে ফুট-কয়েক উঁচুতে ফণা তুলে আছে। কিন্তু তখন আমি সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিইনি, কারণ আমার উদ্দেশ্য জাহাজের লোকদের ডেকে সাহায্য চাওয়া। অনেক চিৎকার করলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। আমি জাহাজের পেছন দিকে ছোট্ট উঁচু ডেকের কাছে গেলাম। তার নীচের দরজাটা খুলে উঁকি মারলাম। একটা বীভৎস পচা গন্ধ আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। বুঝতে দেরি হল না, ভেতরে কোনও জীবিত প্রাণী নেই। এক ঝটকায় দরজাটা বন্ধ করে দিলাম, কারণ, হঠাৎই মনে হল আমি ভীষণ একা।

'যেখান দিয়ে বেয়ে উঠেছিলাম সেই দিকের রেলিঙের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার—আমার মিষ্টিসোনা তখন চুপটি করে ভেলায় বসে আছে। আমাকে দেখে ও ডেকে জিগ্যেস করল জাহাজে কেউ আছে কিনা। আমি বললাম যে, দেখে মনে হচ্ছে এটাতে অনেক দিন ধরে কেউ নেই। ও যদি একটু অপেক্ষা করে তা হলে আমি খুঁজে দেখছি মই জাতীয় কোনও কিছু পাই কি না, যাতে ও ডেকে উঠে আসতে পারে। তারপর আমরা দুজনে মিলে গোটা জাহাজটা খুঁজে দেখতে পারব। একটু পরেই ডেকের অন্য প্রান্তে একটা দড়ির মই দেখতে পেলাম। ওটা নিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম নীচে। মিনিটখানেকের মধ্যেই ও উঠে এল আমার পাশে।

'প্রত্যেকটা কেবিন আর ঘর আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম, কিন্তু প্রাণের কোনও স্পন্দন পাওয়া গেল না। এখানে, ওখানে, কেবিনে যেখানেই গেলাম চোখে পড়ল সেই অদ্ভুত ফাঙ্গাসের ছোট-বড় ঝাড়। কিন্তু ও বলল, এসব পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে।

'অবশেষে আমরা জাহাজের পেছনের অংশে এলাম। দুজনে মিলে দুটো কেবিন

ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে বাসযোগ্য করে তুললাম। তারপর জাহাজে কোনও খাবার আছে কিনা খুঁজে দেখতে আমি বেরিয়ে পড়লাম। হ্যাঁ, খুঁজে পেলাম, এবং ঈশ্বরকে তাঁর মহানুভবতার জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। এ ছাড়াও পানীয় জলের পাম্পটা খুঁজে বের করলাম। ওটাকে অতিকষ্টে সারিয়ে তুললাম। পানীয় জলের সমস্যা মিটল বটে, তবে জলের স্বাদটা তেমন মধুর নয়।

'বেশ কয়েকদিন আমরা জাহাজে রইলাম—পাড়ে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই করলাম না। কেবিনদুটোকে বসবাসযোগ্য করে তুলতেই আমরা ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। তখনও জানি না ভবিষ্যৎ আমাদের জন্যে কোন অভিশাপ লুকিয়ে রেখেছে। প্রথম কাজ হিসেবে কেবিনের দেওয়ালে ও মেঝেতে জায়গায়-জায়গায় গজিয়ে ওঠা ফাঙ্গাসের আগাছাগুলো আমরা পরিষ্কার করে ফেলেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওগুলো আবার আগের আকারে ফিরে আসছে। এতে শুধু যে হতাশ হলাম তাই নয়, এক অস্পষ্ট অস্বস্তি আমাদের মনে দেখা দিল।

'কিন্তু তবুও আমরা হার মানিনি। আবার একই কাজে নেমে পড়লাম। ভাঁড়ার ঘরে একটা কার্বলিক অ্যাসিডের টিন পেয়েছিলাম। সুতরাং এবার যে শুধু ফাঙ্গাসগুলো চেঁছে তুলে ফেললাম তা নয়, সেই জায়গাগুলোয় কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে-না-ঘুরতে ওগুলো আবার সতেজ হয়ে বেড়ে উঠল এবং শুধু আগের জায়গাতেই নয়, অন্যান্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ল, যেন আমরা হাত দেওয়ার ফলেই ওগুলো থেকে অসংখ্য জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছে।

'সাতদিনের দিন সকালে ও ঘুম থেকে উঠেই চমকে উঠল। ওর বালিশে, মুখের খুব কাছে, একটা ছোট জায়গা জুড়ে গজিয়ে উঠেছে ওই ফাঙ্গাস। কোনওরকমে জামাকাপড় পরে নিয়েই ও ছুটে এল আমার কাছে। আমি তখন জাহাজের রান্নাঘরে প্রাতরাশ তৈরির ব্যবস্থা করছি।

'শিগগির দেখে যাও, জন,' ও এসে বলল। আমাকে টেনে নিয়ে গেল কেবিনে। ওর বালিশে ওই জিনিসটা দেখামাত্রই আমি শিউরে উঠলাম, এবং সেই মুহূর্তেই ঠিক করলাম জাহাজ ছেড়ে আমরা চলে যাব। দেখা যাক, ডাঙায় আমরা এর চেয়ে ভালোভাবে বাঁচতে পারি কি না।

'নিজেদের সামান্য যা কিছু ছিল তাড়াহুড়ো করে গুছিয়ে নিলাম। লক্ষ করলাম, ধূসর ফাঙ্গাস সেগুলোকেও রেহাই দেয়নি; কারণ ওর একটা শালের এক প্রান্তে ডুমো-ডুমো হয়ে গজিয়ে উঠেছে ওই ফাঙ্গাস। শালটা ছুড়ে দিলাম রেলিঙের বাইরে। ওকে কিছু জানালাম না।

'ভেলাটা তখনও জাহাজের গায়েই ভাসছিল, কিন্তু ওটা ঠিকমতো চালাতে অনেক অসুবিধে বলে জাহাজের ডেক থেকে একটা ছোট নৌকো জলে নামিয়ে দিলাম। নৌকো করে আমরা ডাঙার দিকে রওনা হলাম। ডাঙার কাছাকাছি আসতেই লক্ষ করলাম, সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস অকল্পনীয় ফাঙ্গাস ঢিবির আকারে বেড়ে উঠেছে; স্থির

pathagar.net

গাছের পাতা বাতাসে যেমন কেঁপে ওঠে সেগুলো তেমন থরথর করে কাঁপছে। এখানে-ওখানে সেগুলোর চেহারা বিশাল মোটা-মোটা আঙুলের মতো, আর কোথাও-কোথাও সমতলে মসৃণভাবে বিশ্বাসঘাতী রূপ নিয়ে ওরা ছড়িয়ে পড়েছে। আবার দু-এক জায়গায় ফাঙ্গাসগুলো বেড়ে উঠেছে বিকৃত বনসাইয়ের মতো—শরীরে ওদের অসংখ্য ভাঁজ আর আঁকিবুকি। থেকে-থেকে ওরা জঘন্যভাবে কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

'প্রথম দেখায় মনে হল, দ্বীপের কোনও অংশই বুঝি এই কালান্তক ফাঙ্গাসের আক্রমণ থেকে মুক্ত নয়; কিন্তু তীর ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই সে-ভুল ভাঙল। যে-ছোট জায়গাটা আমরা আবিষ্কার করলাম সেটা দেখে মনে হল সূক্ষ্ম সাদা বালিতে ঢাকা। সেখানেই আমরা নামলাম। না, জিনিসটা বালি নয়। তবে সেটা যে কী, বলতে পারি না। শুধু যেটুকু লক্ষ করেছি তা হল, এখানে ফাঙ্গাস জন্মাতে পারেনি। এই বালি জাতীয় জিনিসটা যেদিক দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে তার ঠিক দুপাশেই ভয়ঙ্কর ফাঙ্গাসের ঝাড়। এ ছাড়া গোটা দ্বীপেই ওই জঘন্য বীভৎস ধূসর আগাছার জঙ্গল। ফলে রক্তবীজের রাজত্বের বুক চিরে চলে গেছে সাদা রঙের সরু-সরু পথ।

'ফাঙ্গাসমুক্ত জায়গাটা পেয়ে যে কী আনন্দ হয়েছিল তা আপনাদের বোঝাতে পারব না। এখানেই আমাদের সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখলাম। তারপর কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে ফিরে গেলাম জাহাজে; অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে জাহাজের একটা পালও খুলে আনতে পারলাম এবং সেটা দিয়ে তৈরি করলাম দুটো ছোট-ছোট তাঁবু। চেহারায় তেমন সুদৃশ্য না হলেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাঁবু দুটোয় রেখে সেখানেই বসবাস শুরু করলাম। বলতে গেলে মোটামুটি চার-চারটে সপ্তাহ নির্বিঘ্নে সুখেই কাটল। সুখেই বলতে হবে—কারণ, আমরা দুজনে যে একসঙ্গে ছিলাম।

'প্রথম সংক্রমণ দেখা দিল ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে। শুধু একটা গোল ধূসর মাংসপিণ্ড। ঠিক যেন একটা আঁচিল। হায় ভগবান! ওটা দেখামাত্রই আতঙ্ক লাফিয়ে উঠল আমার বুকের গভীরে। দুজনে মিলে ওটা পরিষ্কার করে ফেললাম : প্রথমে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে—পরে জল দিয়ে। পরদিন সকালে ও হাতটা আমাকে আবার দেখাল। ধূসর আঁচিলের মতো জিনিসটা আবার গজিয়ে উঠেছে। ক্ষণেকের জন্যে আমরা নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর, নীরবেই, আবার ওটা পরিষ্কার করতে মনোযোগ দিলাম। কাজের মাঝখানে হঠাৎই ও বলে উঠল ঃ "তোমার গালের পাশে ওটা কী, সোনা?" ওর কণ্ঠস্বর দুশ্চিন্তায় তীক্ষ্ণ। জিনিসটা অনুভব করতে আপনাথেকেই আমার হাত চলে গেল গালে।

' "ওই তো! কানের কাছে, চুলের ঠিক নীচে। আর-একটু ওপরে।"

আঙুল দিয়ে জায়গাটা স্পর্শ করলাম, এবং বুঝতে আর কোনও অসুবিধে রইল না।

' "এসো, প্রথমে তোমার বুড়ো আঙুলটা ঠিক করি," আমি বললাম। ও রাজি

হল আমার কথায়। কারণ, ওর হাতের জিনিসটা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত আমাকে স্পর্শ করতে ওর ভয় হচ্ছিল। ওর হাত অ্যাসিড আর জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলার পর ও আমার গাল নিয়ে পড়ল। কাজ শেষ হলে দুজনে পাশাপাশি বসে বহু বিষয় নিয়ে গল্প করলাম; কারণ, সেই মুহূর্তে আকস্মিক রক্ত-হিম-করা বিভিন্ন দুশ্চিন্তা আমাদের জীবনে এসে হাজির হয়েছে। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর কোনও পরিণতির কথা ভেবে আমরা আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলাম। ভাবলাম, জিনিসপত্র আর খাওয়ার জল নৌকোয় তুলে আমরা আবার সমুদ্রে পাড়ি দেব; কিন্তু সে-উপায় আমাদের নেই; তার কারণও অনেক; তা ছাড়া, এর মধ্যেই আমরা—আমরা সংক্রামিত হয়ে পড়েছি। সুতরাং ঠিক করলাম, এই দ্বীপেই থাকব। ঈশ্বর আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুন। আমরা অপেক্ষা করব।

'এক মাস দু-মাস, তিন মাস কেটে গেল। ধূসর ফাঙ্গাসের ঝাড় শুধু যে আকারে বেড়ে চলেছে তা নয়, আমাদের দেহের অন্যান্য জায়গাতেও ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যে-নিঃসীম আতঙ্কের সঙ্গে আমাদের দৈনিক স্নায়ুর লড়াই চলেছে তাতে ফাঙ্গাসের এই অগ্রগতিকে আর যাই হোক ধীরে বলে মনে হয় না।

'কখনও-সখনও দরকারি জিনিসপত্রের খোঁজে চলে গেছি সেই জাহাজে। সেখানেও দেখি ফাঙ্গাসগুলো একঘেয়েভাবে বেড়ে চলেছে। ডেকের একটা গাছ প্রায় আমার মাথা ছাড়িয়ে গেছে।

'দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সমস্ত আশা আর ইচ্ছে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। এতদিনে বুঝতে বাকি নেই, এই অসুখ নিয়ে সুস্থ মানুষের মধ্যে আমরা ফিরে যেতে পারি না।

'নিজেদের প্রতিজ্ঞা ও ভবিতব্য জানার পর বুঝলাম, আমাদের খাবার ও জল বেশ বুঝে-শুনে খরচ করতে হবে। কারণ, তখনও আমরা ভেবেছি, এইভাবে হয়তো বহুদিন আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

'এই কথায় মনে পড়ছে, আমি আপনাদের বলেছি আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। বয়েসের হিসেবে কিন্তু নয়। তবে—তবে—।'

সে মাঝপথেই থেমে গেল; তারপর আচমকাই আবার বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, খাবারের রেশন তো শুরু করলাম, কিন্তু তখনও জানি না কতটুকু খাবারের সঞ্চয় আমাদের রয়েছে। আরও সপ্তাহখানেক পরে আবিষ্কার করলাম, যে-ক'টা রুটির টিন ছিল—যেগুলো আমি ভরতি আছে ভেবেছিলাম—তার সবক'টাই খালি। এ ছাড়া (দু-একটা তরিতরকারি, মাংসের টিন এবং টুকিটাকি কিছু ছিল) ভরসা করার মতো বিশেষ কিছুই নেই। ওই রুটির টিনগুলো ছিল আমাদের শেষ ভরসা।

'পরিস্থিতি জানার পর যেটুকু আমার পক্ষে করা সম্ভব তাই করলাম: সামুদ্রিক হ্রদটায় মাছ ধরতে শুরু করলাম। কিন্তু সে-চেষ্টা নিষ্ফল হল। এ-ঘটনায় যখন ক্রমশ

pathagar.net

মরিয়া হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎই মনে হল, খোলা সমুদ্রে মাছ ধরলে কেমন হয়?

'এবারে মাঝে-মধ্যে দু-একটা মাছ পেলাম। কিন্তু সে-সংখ্যা এতই অল্প যে, আমাদের ভয় দেখানো সর্বনাশা খিদের কাছে কিছুই নয়। একসময় মনে হল, আমাদের শরীরে ফাঙ্গাসের যে-সংক্রমণ শুরু হয়েছে তার থেকে কিছু হয়ে ওঠার আগে দুঃসহ খিদেই আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

'মনের এইরকম অবস্থা নিয়ে চতুর্থ মাসটা কেটে গেল। তারপর এক ভয়ঙ্কর আবিষ্কার করলাম। একদিন সকালবেলা, দুপুরের ঠিক আগে, জাহাজ থেকে খুঁজে-পেতে কিছু বিস্কুট নিয়ে এলাম। এসে দেখি, ও তাঁবুর দরজায় বসে কী যেন খাচ্ছে।

' "ওটা কী খাচ্ছ, সোনা?" পাড়ে নেমেই ওকে প্রশ্ন করলাম। আমার কণ্ঠস্বর শুনে ও যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। তারপর ধূর্তভাবে কী একটা ছুড়ে ফেলে দিল সামনের খোলা জায়গায়। জিনিসটা কাছেই পড়ল, এবং এক অনিশ্চিত সন্দেহ জেগে উঠল আমার মনে। এগিয়ে গিয়ে ওটা তুলে নিলাম। দেখলাম, জিনিসটা ধূসর ফাঙ্গাসের একটা টুকরো।

'ওটা হাতে নিয়ে কাছে এগিয়ে যেতেই ওর মুখে নেমে এল মৃতের পাণ্ডুর ছায়া। তারপর ওর মুখ হয়ে উঠল গোলাপের মতো টুকটুকে লাল।

'অদ্ভুত এক আতঙ্ক আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলল।

' "সোনা! সোনা আমার।" আমার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোল না। কিন্তু তাতেই ও ভেঙে পড়ল, চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ক্রমে ও শান্ত হলে ওর কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা শুনলাম : গতকালই নাকি ও একটু ফাঙ্গাস খেয়ে দেখেছে, এবং ওর ভালো লেগেছে। ওকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিলাম যে, যত খিদেই পাক না কেন, এই ফাঙ্গাস যেন ও স্পর্শ না করে। প্রতিজ্ঞার শেষে ও বলল, এই ফাঙ্গাস খাওয়ার ইচ্ছেটা ওর মনে দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎই এসেছিল, অথচ তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত খাওয়ার ইচ্ছে তো দূরে থাক, ওগুলো দেখলেই ওর ঘেন্না হচ্ছিল।

'এই নতুন আবিষ্কার আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া ছিল। অদ্ভুত এক অস্থিরতা অনুভব করে আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে ভেলার দিকে রওনা হলাম। সেই সাদা বালির মতো পদার্থে ঢাকা পথগুলো ফাঙ্গাসের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। এই পথ ধরে আগে একবার এসেছিলাম তবে বেশি দূর যাইনি। কিন্তু এবার, মনে জটিল ভাবনা থাকার ফলেই হয়তো, অনেকটা ভেতরে এগিয়ে গেলাম।

'হঠাৎ বাঁ-দিক থেকে এক বিচিত্র কর্কশ শব্দে সংবিৎ ফিরে পেলাম। চকিতে ঘুরে তাকিয়ে দেখি অদ্ভুত আকৃতির এক ফাঙ্গাসের ঝাড় আমার কনুইয়ের খুব কাছে নাড়াচড়া করছে। টলোমলোভাবে জিনিসটা দুলছে, যেন ওটার প্রাণ রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎই খেয়াল হল, ঝাড়টার আকৃতির সঙ্গে কোনও বিকৃতদেহ মানুষের মিল রয়েছে। মাথায় এই চিন্তাটা ঝলসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই কোনও কিছু

ছেঁড়ার এক বিশ্রী শব্দ কানে এল এবং দেখলাম, ফাঙ্গাসটার প্রশাখার মতো একটা বাহু ধূসর শরীর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। জিনিসটার মাথা আকারহীন একটা ধূসর বল; সেটাও ঝুঁকে আছে আমারই দিকে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, এবং নোংরা হাতটা আলতো করে ছুঁয়ে গেল আমার মুখ। আমি এক ভয়ার্ত চিৎকার করে কয়েক পা দৌড়ে পিছিয়ে এলাম। জিনিসটা আমার ঠোঁটের যে-জায়গাটা স্পর্শ করেছে সেখানে একটা মিষ্টি-মিষ্টি স্বাদ পেলাম। ঠোঁট চাটার সঙ্গে-সঙ্গেই অমানুষিক উদগ্র ইচ্ছে আমাকে পেয়ে বসল। ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ফাঙ্গাসের তাল আঁকড়ে ধরলাম। তারপর আরও, আরও—কিছুতেই আমার আর তৃপ্তি হয় না। গোগ্রাসে খাওয়ার মাঝখানে সকালের আবিষ্কারের কথাটা আমার আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে ঝাপটা মারল। এ যে একেবারে ঈশ্বর প্রেরিত! হাতের ফাঙ্গাসের টুকরোটা সঙ্গে-সঙ্গে ছুড়ে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর প্রচণ্ড ঘৃণা, ক্ষোভ এবং মনে অপরাধের বোঝা নিয়ে ফিরে চললাম তাঁবুর দিকে।

'আমাকে দেখামাত্রই ও সব বুঝতে পারল। কীভাবে বুঝল জানি না। হয়তো গভীর ভালোবাসা থেকে যে-ষষ্ঠেন্দ্রিয় জন্ম নেয় তার সাহায্যেই। ওর নীরব সহানুভূতি ও সমবেদনা আমাকে স্বীকারোক্তি করতে সাহায্য করল। আমি ওকে সব খুলে বললাম। বললাম আমার তাৎক্ষণিক দুর্বলতার কথা, তবে ওই অদ্ভুত জীবন্ত ফাঙ্গাসটার কথা গোপন করে গেলাম। ওর আতঙ্কের অমানুষিক বোঝা শুধু-শুধু আমি বাড়িয়ে তুলতে চাই না।

'কিন্তু, আমি—এক অসহনীয় তথ্য আমি জেনে ফেলেছি। ফলে এক অবিরাম ত্রাস বাসা বেঁধেছে আমার মস্তিষ্কে; কারণ আমি বুঝতে পারছি, যা আমি দেখেছি তা ওই সামুদ্রিক হ্রদে দাঁড়ানো জীর্ণ জাহাজের যাত্রীদের কোনও একজনের ভয়াবহ পরিণতি; আর সেই একই পরিণতি অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে।

'এরপর থেকে ওই জঘন্য খাদ্য আমরা অতিকষ্টে এড়িয়ে চললাম। অতিকষ্টে —কারণ, ওই খাবারের প্রতি অদম্য লোভ এখন মিশে গেছে আমাদের রক্তে। ভুলের শাস্তি আমরা পেয়েছি। দিনের-পর-দিন উদ্দাম গতিতে ফাঙ্গাসের পরগাছা আমাদের দেহ দুটোকে দখল করল। ওদের বংশবৃদ্ধি আমরা বাধা দিতে পারলাম না। সুতরাং—সুতরাং, ধীরে-ধীরে দুটো মানুষের দেহ পরিণত হতে লাগল—সে যাক, যত দিন যায় দুশ্চিন্তা তত কমে আসে। শুধু—শুধু জানি, একদিন আমরা ছিলাম পুরুষ ও নারী।

'আর দিনের পর দিন লোভের সঙ্গে আমাদের লড়াই এক ভয়ঙ্কর চেহারা নিচ্ছে। ওই কালান্তক ফাঙ্গাস মুখে দেওয়ার তীব্র কামনা আমরা বোধহয় আর রুখতে পারব না।

'এক সপ্তাহ আগে আমাদের শেষ বিস্কুটটা খেয়েছি, এবং সেই থেকে মাত্র তিনটে মাছ ধরেছি। আজ রাতে মাছ ধরতে এসে দেখি আপনাদের জাহাজ

pathagar.net

কুয়াশা ভেদ করে স্রোতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তখনই আমি আপনাদের ডেকেছি। বাকিটা তো আপনারা জানেন। পতিত দুই আত্মার প্রতি সহানুভূতি ও দয়া দেখানোর জন্যে ভগবান নিশ্চয়ই তাঁর অপার করুণা থেকে আপনাদের বঞ্চিত করবেন না—।'

জলে বইঠা ডোবানোর একটা শব্দ পেলাম, তারপর আবার। সেই কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল, শেষবারের মতো। হালকা কুয়াশা ভেদ করে ভেসে আসা ভৌতিক স্বরে শুধুই বিষণ্ণতা।

'ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। বিদায়।'

'বিদায়,' আমরা সমস্বরে উত্তর দিলাম। মনে আমাদের বিভিন্ন বিচিত্র আবেগের খেলা।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বুঝলাম, ভোর হয়ে এসেছে।

লুকিয়ে থাকা সূর্যের রশ্মির এক তীক্ষ্ণ বর্শা কুয়াশা ভেদ করে ছিটকে এসে সমুদ্রের ওপর পড়ল। চাপা আলোয় আলোকিত করে তুলল দূরে মিলিয়ে যাওয়া নৌকোটাকে। অস্পষ্টভাবে দেখলাম, দু-বইঠার মাঝে কী যেন একটা নড়ছে। মনে হল, একটা স্পঞ্জের ডেলা—বিশাল ধূসর এক স্পঞ্জের তাল...সেটা নড়ছে। বইঠা দুটো জল ঠেলে চলল। নৌকোর মতো ও দুটোর রঙও ধূসর। আমার চোখ নিষ্ফলভাবে খুঁজে চলল হাত ও বইঠার সংযোগস্থল। তারপর আমার দৃষ্টি পড়ল—মাথার দিকে। বইঠা দুটো পেছনে জল ঠেলে দেওয়ার তালে-তালে মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়ছে। তারপর বইঠা আবার জলে ডুবল, নৌকোটা বেরিয়ে গেল আলোর বৃত্তের বাইরে, এবং ওই জিনিসটা স্পঞ্জের বলের মতো মাথাটা নাড়তে-নাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশায়।

pathagar.net

➤ *ভয়েস ইন দ্য নাইট*

ঘুমপাড়ানি গান

মাইকেল হার্ডউইক ও মলি হার্ডউইক

pathagar.net

কর্নেল ইওয়ার্টের সবচেয়ে অপছন্দ ছিল জনতা যানবাহন। ঘোড়ার পিঠে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন, কারণ একসময় হার্ডিঞ্জের বাহিনীর সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলেন এবং সেসময়ে বেশ নামও কিনেছেন। বেসরকারি যানবাহনে তিনি স্বস্তি কম পেতেন, কিন্তু লন্ডনের যেসব বাসিন্দারা মোটর বা বাসে গাদাগাদি করে নিত্য যাতায়াত করেন, তাঁদের কথা ভাবলেই তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। মোট কথা, ওরকম ভাবে গাদাগাদি করে চলার চেয়ে মৃত্যু তাঁর কাছে শ্রেয় ছিল। কিন্তু আজকের এই দুর্দিনের যুগে চলার পথে আরাম বলে কিছু নেই, ফলে মাঝে-মধ্যে তাঁকে ট্রেনের ঝামেলাও পোহাতে হত। তবে সুখের কথা, এখন আর আগের মতো খোলা ঝড়ঝড়ে গাড়ির চল নেই, উঁচু-নিচু রেললাইনের ঝাঁকুনি, কয়লার দম বন্ধ করা কালো ধোঁয়া, সব বদলে গিয়ে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

কার্লাইল থেকে লন্ডন পর্যন্ত সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য তিনি টাইম-টেবিল খতিয়ে এমন একটা ট্রেন বেছে নিয়েছেন যাতে সচরাচর কেউ যাতায়াত করে না। এ-ট্রেনে অন্য গাড়ির চেয়ে সময় কিছুটা বেশি লাগে বটে, কিন্তু বেশ ফাঁকায়-ফাঁকায় যাওয়া যায়। কর্নেল ইওয়ার্ট যে সহযাত্রীদের খুব একটা পছন্দ করেন না তা নয়, আসলে ভিড়ে ঠাসাঠাসি করে যেতে তাঁর বিশ্রী লাগে।

কুলি যখন তাঁকে একটা খালি কামরায় তুলে দিল তখন তিনি বেশ স্বস্তি পেলেন। মালপত্র তাকের ওপর রেখে, কুলিকে খুশি করে, কামরার গার্ডের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে গুছিয়ে বসলেন কর্নেল। পাশেই রাখা সামরিক জীবনের

'স্মৃতিকথা'-র একটি নতুন খণ্ড, সঙ্গে না পড়া 'টাইম্‌স' এবং 'ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ'।

সামরিক চাকরির সময়ে দুটি গুণের জন্য কর্নেলের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল : যে-কোনও অবস্থার জন্য তিনি তৈরি থাকতে পারেন, আর তার ফলাফল মোটামুটিভাবে আগেভাগেই আঁচ করতে পারেন। কিন্তু এবারের ঘটনার সে-দুটো গুণই তাঁকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হল।

সিটি বাজিয়ে বিশাল ট্রেনটা যখন ধীরে-ধীরে কার্লাইল স্টেশন ছেড়ে রওনা হল তখনও তিনি কামরায় একা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি 'দ্য টাইম্‌স'-এর একটি পৃষ্ঠা বের করে নিলেন। এ-পৃষ্ঠার খবরে তাঁর কখনও বিশেষ আগ্রহ থাকে না। সুতরাং পৃষ্ঠাটিকে তিনি সযত্নে তাঁর মুখোমুখি সিটের গদির ওপরে বিছিয়ে দিলেন। তারপর পা টান করে তার ওপরে রাখলেন। অন্য যে-কোনও যাত্রীও একই কাজ করত। কারণ জুতোর কাদামাখা সিটে বসতে কেই-বা পছন্দ করে! আরামে পা ছড়িয়ে তিনি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় মনোযোগ দিলেন।

তখনই তাঁর মনে হল তাঁর জুতোজোড়াটা একেবারে নতুন। সেগুলো ছেড়ে রাখলেই তিনি বেশি আরাম পাবেন। সুতরাং জুতো এবং গায়ের পুরু কোটটা খুলে রেখে তিনি পড়ায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু কর্নেল এ-পথে নতুন যাত্রী, ফলে কয়েক মুহূর্ত পরেই তিনি মাথা তুলে ছুটে যাওয়া কাম্বারল্যান্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনের আনন্দে উপভোগ করতে লাগলেন। এক সময় 'দ্য টাইম্‌স' খসে পড়ল মেঝেতে, কারণ কর্নেল ইওয়ার্ট ঘুমে ঢলে পড়েছেন।

একটু পরেই তাঁর ঘুম ভাঙল। গলা শুকিয়ে কাঠ, ঘাড়ে কেমন একটা অস্বস্তি, ট্রেনে ঝিমুনি ভাঙলে যেমন হয়। অস্বস্তির রকমসকম দেখে কর্নেল সিদ্ধান্তে এলেন, একঘণ্টা কি তারও বেশিক্ষণের জন্য তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কাম্বারল্যান্ডের রুক্ষ সৌন্দর্যের বদলে এখন চোখে পড়ছে ল্যাঙ্কাশায়ার লেকল্যান্ডের প্রাকৃতিক রূপ।

কাগজটা তুলে নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লেন কর্নেল, এবং তখনই বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ করলেন, কামরায় তিনি আর একা নন। উলটোদিকের সিটের এক কোণে একজন মহিলা বসে রয়েছেন। নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলা পেনরিথ স্টেশনে উঠেছেন। আশ্চর্য! এতই গাঢ় ঘুমে তিনি অচেতন ছিলেন যে, ট্রেন কখন থেমেছে টের পাননি। টের পাননি মহিলার প্রবেশের শব্দও। যাক, দেখে অন্তত ভদ্রগোছের বলেই মনে হচ্ছে, ঝঞ্ঝাট করার মতো সহযাত্রী নয়। কেউ-কেউ আছে যারা ট্রেনে ওঠা ইস্তক নানান বদখত খাবার সাজিয়ে শুধু খেয়েই চলে, কেউ-বা হাওয়া কিংবা গুমোট নিয়ে অনুযোগ অভিযোগ করে, কেউ আবার একটানা বকরবকর করে যায়। এ ধরনের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা কর্নেলের ভালোরকমই হয়েছে। সে তুলনায় এই মহিলা বেশ চুপচাপ, সামনে কিছুটা ঝুঁকে বসে রয়েছেন। মহিলাদের পোশাকের কাট-ছাঁট বা ডিজাইন কর্নেল কখনও নজর করে দেখেন না, কিন্তু তবুও তাঁর মনে হল, তাঁর স্ত্রী যেসব পোশাক পরেন

pathagar.net

তার তুলনায় এই মহিলার পোশাক একটু ঢিলেঢালা পুরোনো ধাঁচের। মাথার ছোট টুপির কিনারা থেকে ঝুলে রয়েছে একটা ওড়না। সন্দেহ নেই, ওড়নার আড়ালে রয়েছে একটা অল্পবয়েসি মুখ, কারণ, চুলের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তার রং সতেজ বাদামি।

হঠাৎই কর্নেলের খেয়াল হল, একজন ভদ্রমহিলার সামনে যেমন থাকা উচিত তাঁর বেশবাস ঠিক সেরকম নেই, কারণ কোট এবং জুতোজোড়া তিনি খুলে রেখেছেন। মহিলার কাছে ক্ষমা চেয়ে রীতিমতো লজ্জা পেয়ে তাড়াহুড়ো করে তিনি একইসঙ্গে কোট এবং জুতো পরার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ক্ষমা করুন ম্যাডাম, নার্ভাসভাবে বললেন কর্নেল, আমার পোশাক—মানে, পোশাক ঠিক পরা ছিল না। আপনি যে এ-কামরায় উঠেছেন সেটা আমি টের পাইনি। নইলে বেশবাসের অবস্থা ঠিক, ইয়ে—এরকম হত না—।

কর্নেলের ক্ষমাপ্রার্থনা সম্ভবত বিফল হল, কারণ মহিলা কোনও কথা বললেন না। এমনকী তাঁর দিকে মুখও ফেরালেন না। একইভাবে সামনে ঝুঁকে বসে রইলেন।

মহিলার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় কর্নেল আবার বলে উঠলেন, অজান্তে যদি আমার অভদ্রতা প্রকাশ করে থাকি, ম্যাডাম, তার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।

কোনও উত্তর না দিয়ে মহিলাটি ধীরে-ধীরে হাত দোলাতে লাগলেন। মনে হল, কী একটা যেন তিনি কোলে নিয়ে বসে আছেন। শালের প্রান্ত দিয়ে সেটা ঢাকা রয়েছে। আর সেই মহিলা আপনমনে গুনগুন করে গাইছেন ঘুমপাড়ানি সুর। কর্নেল ইওয়ার্টের মনে পড়ে গেল তাঁর ছোটবেলার কথা। বুড়ি আয়া কর্নেল ও তাঁর বোনদের সুর করে ছড়া কেটে ঘুম পাড়াত। এ যেন সেই চেনা সুর। তা হলে কি মহিলার সঙ্গে একটা কোলের বাচ্চা রয়েছে? নাকি কোনও পোষা প্রাণী? বেড়ালছানা, কি কুকুরছানা হতে পারে। কিন্তু ওই পোষা প্রাণীটিকে বয়ে নেওয়ার মতো কোনও বাস্কেট তো চোখে পড়ছে না। সত্যি বলতে কি মহিলার সঙ্গে মালপত্র প্রায় কিছুই নেই। হয়তো উনি কেন্ডাল স্টেশনে নেমে যাবেন। নেমে গেলেই ভালো। কারণ, তাঁর আচরণ কর্নেলের কাছে ভীষণ অদ্ভুত লাগছে। মহিলার সঙ্গে যদি সামান্য কথাবার্তাও বলা যেত তা হলেও পরিস্থিতি অনেক সহজ হত।

ম্যাডাম!—আলাপ করার চেষ্টায় কর্নেল কিছুটা সামনে এগিয়ে বসলেন।

মহিলা কোনও উত্তর দিলেন না, তবে গুনগুন বন্ধ করে কর্নেলের দিকে সামান্য ঘুরে বসলেন। তাঁর কোলের বস্তুটি তখনও সযত্নে আড়াল করা রয়েছে। ওড়নার মধ্যে দিয়ে কর্নেলের চোখে পড়ল একটা ফ্যাকাসে মুখ এবং একজোড়া উদভ্রান্ত চোখ। ওড়না সাধারণত মহিলাদের দৃষ্টিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কর্নেল বিন্দুমাত্রও মোহ কিংবা আকর্ষণ অনুভব করলেন না। মহিলা নিজের কোলের দিকে তাকালেন, কোলের বস্তুটিকে আরও কাছে টেনে নিলেন, তারপর আগুন-ঝরা ভয়ানক চোখে তাকালেন কর্নেলের দিকে। যেন কোলের জিনিসটাকে তিনি কর্নেলের

pathagar.net

কাছ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। তারপর আবার মহিলাটি গুনগুন করে ঘুমপাড়ানি গান ধরেছেন। গানের কয়েকটা কথা বুঝতে পারলেন কর্নেল।

আর কাঁদে না সোনামনি, ছোট্ট খোকা রে—
আর কাঁদে না সোনা আমার...

ভীষণ কৌতূহল হল কর্নেল ইওয়ার্টের। কোলে আঁকড়ে রাখা বাচ্চাটাকে আরও কাছ থেকে দেখতে ইচ্ছে করল। রাতে ডিনারে বসে স্ত্রীর কাছে এই ঘটনাটা বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে। সুতরাং নিতান্ত কৌতূহলের তাড়নায় বিপরীতদিকের সিটে গিয়ে বসলেন কর্নেল। তারপর অতি ধীরে এগিয়ে গেলেন রহস্যময়ী মহিলার পাশটিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে একইসঙ্গে তিনটি ঘটনা ঘটল।

নিঃশব্দ আতঙ্কে মহিলার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। মুখটা স্পষ্ট করে না দেখতে পেলেও সে-দৃশ্য কর্নেল কোনওদিন ভুলবেন না।

কোলের জিনিসটাকে বাঁচানোর জন্য মহিলার দুটো হাত আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনে উঠল।

এক ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে ট্রেন কেঁপে উঠল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা থেমে গেল। কর্নেল ছিটকে পড়লেন মেঝেতে।

pathagar.net

চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল কর্নেলের । বুঝলেন, তিনি গুরুতর কোনও আঘাত পাননি—শুধু কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে মাত্র। আড়ষ্ট হাত-পায়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চারদিকে মালপত্র, ব্যাগ, সব ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃত সৈনিকের বীরধর্ম অনুযায়ী নিজের কথা আর না ভেবে সহযাত্রিণীকে সাহায্য করার জন্য মনযোগী হতেই তিনি অবাক হলেন।

মহিলা তাঁর জায়গায় নেই। যে-কোণটায় তিনি বসেছিলেন সেটা এখন খালি।

থমকে দাঁড়ানো ট্রেনের বাইরে শোনা যাচ্ছে হরেকরকম চিৎকার হট্টগোল। সন্দেহ নেই, সংঘর্ষ হওয়ামাত্রই মহিলা কামরা থেকে পালিয়েছেন। বাইরে রেল লাইনের ধারে রেলকর্মী ও যাত্রীদের যে-জটলা দেখা যাচ্ছে হয়তো তারই মধ্যে রয়েছেন তিনি।

দরজা খুলে বাইরে নেমে এলেন কর্নেল। ট্রেন বেলাইন হয়নি। নীচে নামতেই গার্ডের মুখোমুখি হলেন কর্নেল; কার্লাইল-এ এই লোকটির সঙ্গেই তাঁর কথা হয়েছিল। গার্ড তখন হাঁপাচ্ছে, মাথায় টুপি নেই, উশকোখুশকো চেহারা।

কিছু হয়নি তো, স্যার? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

কী হয়েছে, গার্ড?

এখনও বুঝতে পারছি না, স্যার। কপাল ভালো বলতে হবে আরও খারাপ

কিছু হয়নি। তা ছাড়া ট্রেনে লোকজনও বেশ কম।

কর্নেলের মনে পড়ল তাঁর সহযাত্রিণীর কথা।

আমার কামরায় যে-মহিলাটি ছিলেন—আশা করি তিনি ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাননি। কারণ দুর্ঘটনার ঠিক আগে তাঁকে কিছুটা নার্ভাস বলে মনে হয়েছিল।

কোন মহিলার কথা বলছেন, স্যার?

কর্নেল যতটা সম্ভব মহিলার বর্ণনা দিলেন।

উনি বোধহয় পেনরিথ থেকে উঠেছিলেন। আমি তখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

গার্ডের মুখে হতভম্ব শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল।

পেনরিথ-এ তো এরকম কেউ ওঠেনি, স্যার। সবাইকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সিটে বসিয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া গোটা বগিটা ঘুরেও দেখেছি, আপনি একাই ছিলেন, স্যার—আর ইয়ে, ঘুমোচ্ছিলেন—।

কী বাজে বকছ! নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করব?

ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের দিকে আঙুল তুলে দেখাল গার্ড।

তাঁর মতো কাউকে কি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, স্যার?

কর্নেল সেরকম কাউকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বললেন, উনি আমার কামরায় যে উঠেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে দেখে থাকবে! অল্প বয়েস, মুখে ওড়না, কোলে একটা বাচ্চা।

বাচ্চা, স্যার?

ইয়ে, মানে, বাচ্চাটাকে আমি ঠিক দেখিনি। যখন ওঁকে অনুরোধ করতে যাব যে, বাচ্চাটা আমাকে একবার দেখান, ঠিক তক্ষুনি দুর্ঘটনাটা ঘটল। কিন্তু ওঁর কোলে যে একটা কিছু ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেটাকে উনি দোল খাওয়াচ্ছিলেন, গান শোনাচ্ছিলেন গুনগুন করে।

গার্ডের মুখে একটা বিশ্রী সবুজ আভা ফুটে উঠল।

ওঃ ভগবান! সে আবার ফিরে এসেছে।

ফিরে এসেছে? তার মানে? উনি কি প্রায়ই এই ট্রেনে যাতায়াত করেন?

প্রায়ই করতেন, স্যার। তবে বহুদিন তাঁকে আর দেখিনি। আমরা ভেবেছিলাম সে চলে গেছে।

চলে গেছে—কোথায়? তুমি বড্ড হেঁয়ালি করে বলছ, গার্ড।

গার্ডের চোখে-মুখে ত্রাসের ছায়া পড়ল।

ওদিকে আমাকে ডাকছে, স্যার। আমি যাই।

শক্ত হাতে তাকে চেপে ধরলেন কর্নেল।

সবকিছু খুলে না বলে তুমি যেতে পারবে না! এই যুবতী মেয়েটা কে?

আচ্ছা, আপনি যখন না শুনে ছাড়বেন না, স্যার। বেশ ক'বছর আগে—

pathagar.net

ছ'বছর তো হবেই—এই ট্রেনে এক অল্পবয়েসি বর-বউ যাচ্ছিল। ওরা লন্ডনে যাচ্ছিল হানিমুন করতে। ওদের কামরায় আর কেউ ছিল না। এতে হয়তো ওরা খুশিই হয়েছিল। তবে ঠিক কী ঘটেছিল সেটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল।

কী হয়েছিল?

গার্ড কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলে চলল, ছেলেটি—মানে, মেয়েটির স্বামী—নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিল। গাড়ি তখন খুব জোরে ছুটছে। এমনসময় একটা মালগাড়ি ছুটে যায় এই ট্রেনের গা-ঘেঁষে। মালগাড়ি থেকে কোনও লোহা কিংবা তারের ফলা বেরিয়ে ছিল বাইরে। তাতে ছেলেটির মুন্ডুটা সাফ কাটা যায়, স্যার।

কর্নেল ইওয়ার্টের মুখের রং নজরে পড়ার মতো পালটে গেল।

ট্রেন যখন কেন্ডাল স্টেশনে এল তখন গার্ড মেয়েটিকে আবিষ্কার করে—ভাগ্য ভালো যে, আমি ছিলাম না। মেয়েটি তখন মুন্ডুহীন দেহটা নিয়ে দোলাচ্ছে, গান করছে, আদর করছে। মেঝে থেকে ধড়টাকে সে কোলে তুলে নিয়েছিল। ওঃ, তখন তার চেহারা যা হয়েছিল! তা ছাড়া বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। শুনেছি, তার কিছুদিন পরেই নাকি মারা যায়।

সে-রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ডিনারে বসে ভীষণ চুপচাপ ছিলেন কর্নেল ইওয়ার্ট। যখন মনে হল, এবারে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা স্ত্রীকে গুছিয়ে বলা যায়, তখন কর্নেল একে-একে সব বললেন। শেষে যোগ করলেন, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে, মহিলার কোলের বস্তুটিকে ভালো করে দেখার জন্য তিনি কাছে ঝুঁকে পড়ার আগেই ট্রেন দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল।

➤ *লালাবাই ফর দ্য ডেড*

pathagar.net

www.pathagar.net

অভিশাপ

এডওয়ার্ড লুকাস হোয়াইট

pathagar.net

'এ-কথা ঠিক যে, চোখে দেখা প্রমাণকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই,' টুম্বলি বললেন, 'আর যখন চোখ আর কানের মধ্যে কোনও বিবাদ থাকে না, তখন তো সন্দেহের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

'সবসময় তা হয় না,' ছোট্ট করে বলে উঠল সিঙ্গল্টন।

প্রত্যেকেই ঘুরে তাকাল সিঙ্গল্টনের দিকে। অগ্নি-আধারের দিকে পিছন ফিরে তার কাছাকাছি পাতা গালিচার ওপর দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল টুম্বলি। তার উপস্থিতির প্রভাব বরাবরের মতোই সারা ঘরে জাঁকিয়ে বসেছে। আর সিঙ্গল্টন, রোজকার মতো, ঘরের এককোণে যথাসম্ভব জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু যখন সে কথা বলে, তখন তা না শুনে উপায় থাকে না। সুতরাং, আমরা সকলেই ঘুরে তাকালাম তার দিকে। আমাদের প্রত্যাশাভরা নীরবতা যেন গল্পকারকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'আফ্রিকায় আমার চোখে দেখা, কানে শোনা, একটা ঘটনার কথা ভাবছিলাম—।'

ঘরের সবাই পলকে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে বসল, প্রতিটি চোখ সিঙ্গল্টনের ওপর নিবদ্ধ, নতুন কয়েকটা চুরুটে আগুন ধরানো হল। সিঙ্গল্টনও একটা ধরাল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা নিভে গেল, আর সে দ্বিতীয়বার সেটা ধরানোর চেষ্টা করল না।

১

পিগমিদের আবিষ্কারের আশায় আমরা তখন গ্রেট ফরেস্ট-এ ঘোরাঘুরি করছি। ভ্যান রিটেন-এর এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল, স্ট্যালিন ও অন্যান্যরা যেসব বামনদের আবিষ্কার করেছেন তারা সাধারণ নিগ্রো ও আসল পিগমিদের মিশ্রণে জন্ম নেওয়া বর্ণসঙ্কর ছাড়া আর কিছুই নয়। ভ্যান রিটেন-এর আশা ছিল, সে এমন এক জাতের মানুষ আবিষ্কার করবে, যারা বড়জোর ফুট-তিনেক লম্বা, কি তারও কম। কিন্তু তখনও আমরা সেরকম জাতের কোনও মানুষের সন্ধান পাইনি।

জঙ্গলে আদিবাসীদের সংখ্যা খুবই কম; শিকারও সচরাচর চোখে পড়ে না; শিকার ছাড়া খাদ্য বলতে আর কিছুই নেই; চারিদিকে গভীর ঘন স্যাঁতসেঁতে জঙ্গল। যেসব আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে তারা এই প্রথম সাদা চামড়ার মানুষ দেখেছে, এবং বেশিরভাগই কোনওদিন সাদা মানুষের নামও শোনেনি। আকস্মিকভাবে, একদিন সন্ধের মুখোমুখি, জনৈক ইংরেজ আমাদের তাঁবুতে এল। শ্রান্ত ক্লান্ত জীর্ণ চেহারা। তার কথা আমরা কারও কাছেই শুনিনি; সে কিন্তু আমাদের কথা শুনেছে এবং পাঁচদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে পায়ে হেঁটে আমাদের তাঁবুতে এসে পৌঁছেছে। তার গাইড ও কুলি দুজনের অবস্থাও একইরকম পরিশ্রান্ত।

ইংরেজ লোকটির নাম ইচাম। বিনয়ের সঙ্গে সে নিজের পরিচয় দিল, এবং আমাদের সঙ্গে বসে এত স্বাভাবিক শান্তভাবে খেতে লাগল যে, বিশ্বাসই করা যায় না, গত পাঁচ দিনে সে মাত্র তিনবার সামান্য কিছু খেয়েছে; এ-কথা আমাদের কুলিরা ইচামের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল। খাওয়াদাওয়ার পর ধূমপানে ব্যস্ত হয়ে সে তার আসার কারণ খুলে বলল।

'আমাদের বড়সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ,' ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে সে বলল, 'এইভাবে যদি চলতে থাকে তা হলে তাঁর বাঁচার কোনও আশা নেই। আমি ভাবছিলাম যদি...।'

স্পষ্ট সহজ সুরে কথাগুলো সে বললেও আমি লক্ষ করলাম, তার খোঁচা-খোঁচা গোঁফের নীচে ছোট-ছোট ঘামের ফোঁটা চকচক করছে। নির্দয় প্রকৃতির মানুষ ভ্যান রিটেনকে দেখে মনে হল না সে এতটুকু বিচলিত হয়েছে। সে একমনে শুনতে লাগল। আমি অবাক হলাম। কারণ সে এক কথায় সাফ প্রত্যাখ্যান করার মানুষ। অথচ দিব্যি ইচামের হোঁচট খাওয়া দ্বিধার ভরা কথার টুকরোগুলো শুনে চলেছে। এমনকী কয়েকটা প্রশ্নও করল।

'কে তোমার বড়সাহেব?'

'স্টোন,' তোতলা স্বরে বলল ইচাম।

আমরা দুজনেই তড়িৎপৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম।

'র‍্যাল্‌ফ স্টোন?' আমাদের ঠোঁট চিরে একইসঙ্গে বেরিয়ে এল।

ইচাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

কয়েক মিনিট আমি ও ভ্যান রিটেন চুপ করে রইলাম। ভ্যান রিটেন স্টোনকে কখনও না দেখলেও আমি ওর সঙ্গে কলেজে পড়েছি, অনেকদিন তাঁবুর বাইরে ধুনি জ্বেলে আমরা ওর বিষয়ে আলোচনাও করেছি। বছর দুয়েক আগে বালুন্ডা দেশের দক্ষিণ ল্যুবোতে এক আদিবাসী রোজার সঙ্গে ওর নাটকীয় শত্রুতার কথা আমাদের কানে এসেছিল। অবশেষে সেই ডাইনি রোজা স্টোনের কাছে পরাজিত হয়, এবং তার উপজাতির সকলেই উচিত শিক্ষা পায়। এমনকী জাদুকর রোজার বাঁশিটা ভেঙে-চুরে তার টুকরোগুলো স্টোনকে দেওয়া হয়। এ নিয়ে বালুন্ডা তখন বেশ সরগরম ছিল।

আমরা ভেবেছিলাম, স্টোন আফ্রিকা ছেড়ে চলে গেছে। আর যদি তা নাও গিয়ে থাকে তা হলে দূর কোনও প্রান্তে রয়েছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখছি সে আমাদের কাছাকাছিই রয়েছে, এবং সম্ভবত আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য বানচাল করে দেবে।

২

ইচামের মুখে স্টোনের নাম শুনতেই আমার সমস্ত পুরোনো কথা মনে পড়তে লাগল। মনে আছে, দ্বিতীয় বিয়ের কিছুদিন পরেই ও অন্ধকার মহাদেশ আবিষ্কারের নেশায় ঘরছাড়া হয়েছিল। ভ্যান রিটেন মনে-মনে যাই ভাবুক মুখে প্রশ্ন করল, 'ল্যুবোতে স্টোনের সঙ্গে তুমি ছিলে?'

'না,' ইচাম বলল, 'ওয়ার্নার ছিল। সে মারা গেছে। আমি স্টোনের দলে ঢুকেছি স্ট্যান্‌লি জলপ্রপাতের কাছে।'

'ওর সঙ্গে আর কে কে আছে?'

'শুধু জাঞ্জিবারের বেয়ারা আর চাকর বাকর,' ইচাম উত্তর দিল।

'বেয়ারাগুলো কোন জাতের?' ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

'মং-বাটু,' ইচাম সহজ সুরে বলল।

এতে আমি আর ভ্যান রিটেন দারুণ অবাক হলাম। কোনও দলের নেতা হওয়ার যে-জন্মগত স্বাভাবিক গুণ স্টোনের ছিল, এ যেন তার এক নতুন প্রমাণ। কারণ আজ পর্যন্ত, তাদের দেশের বাইরে মং-বাটুদের নিয়ে কেউ বেয়ারার কাজ করাতে পারেনি। তা ছাড়া, খুব দুর্গম বা দূরদেশ অভিযানেও তাদের পাওয়া যেত না।

'মং-বাটুদের মধ্যে তোমরা কতদিন ছিলে?' ভ্যান রিটেনের পরের প্রশ্ন।

'কয়েক হপ্তা—' ইচাম উত্তর দিল, 'স্টোন ওদের কথাবার্তা ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই মং-বাটুরা বালুন্ডা জাতের একটা শাখা। এবং পরে ওদের আচার-ব্যবহার দেখে তাঁর সে-ধারণা আরও জোরদার হয়েছিল।

'তোমরা কী খেয়ে বেঁচে আছ?' ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

'বেশিরভাগই শিকারের ওপর নির্ভর করে।' অস্ফুট স্বরে ইচাম বলল।

'স্টোনের এই অবস্থা কতদিন?'

pathagar.net

'একমাসের কিছু বেশি।' একটু থেমে ইচাম যোগ করল, 'আমার নিজের শরীরটাও খুব ভালো ঠেকছে না...।'

'তোমাদের সাহেবের আসলে হয়েছেটা কী?' ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

'কার্বাঙ্কলের মতো বড়-বড় ফোঁড়া হয়েছে।'

'এরকম দু-একটা ফোঁড়া আর তেমন কী—' ভ্যান রিটেন মন্তব্য করল।

'এগুলো ঠিক কার্বাঙ্কল নয়,' বিশদ হতে চাইল ইচাম : 'তা ছাড়া একটা দুটো তো হয়নি, একসঙ্গে অনেকগুলো করে হচ্ছে। কখনও পাঁচটা কিংবা সাতটা—এইরকম। এগুলো যদি সত্যিই কার্বাঙ্কল হত, তা হলে সাহেব বোধহয় আর বাঁচতেন না। তবে অন্যদিক থেকে ওগুলো আবার কার্বাঙ্কলের চেয়েও খারাপ।'

'তার মানে?'

'মানে—' একটু ইতস্তত করে ইচাম বলল, 'কার্বাঙ্কলের মতো ফোঁড়াগুলো তত গভীর বা ছড়ানো নয়, সেরকম যন্ত্রণাও নেই, জ্বরও হয় না। কিন্তু এই রোগ থেকে মনে হয় মানসিক রোগ দেখা দেয়। প্রথমটার বেলা আমি পট্টি বেঁধে দিয়েছি, কিন্তু অন্যগুলো তিনি খুব কায়দা করে আমাদের নজর থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। ওগুলো খুব ফুলে উঠলে স্টোন আস্তানা ছেড়ে বাইরে বেরোন না, আর আমাকে পট্টি পালটাতেও দেন না, বা কাছে থাকতেও বলেন না।'

'তোমাদের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার কাপড় কীরকম আছে?' ভ্যান রিটেন প্রশ্ন করল।

'আছে মোটামুটি—' চিন্তিত স্বরে ইচাম বলল, 'কিন্তু উনি ওসব ব্যবহার করতে চান না। একই ব্যান্ডেজ বারবার ধুয়ে ব্যবহার করেন।'

'আর ফোঁড়াগুলোর কী চিকিৎসা করছে?'

'ক্ষুর দিয়ে কেটে সমান করে দিচ্ছেন।'

'কী?' প্রায় চিৎকার করে উঠল ভ্যান রিটেন।

ইচাম কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু একচোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'কিছু মনে কোরো না,' ভ্যান রিটেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তুমি আমাকে ভীষণ চমকে দিয়েছিলে। না, ওগুলো তা হলে কার্বাঙ্কল নয়। হলে অনেক আগেই স্টোন মারা যেত।'

'সে তো আপনাকে আগেই বলেছি,' অস্ফুটভাবে বলল ইচাম।

'স্টোন নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে,' অবাক স্বরে মন্তব্য করল ভ্যান রিটেন।

'ঠিক তাই,' ইচাম বলল, 'আমার কথাবার্তা কিছু শুনছেন না।'

'এরকমভাবে ক'টা কার্বাঙ্কলের চিকিৎসা ও করেছে?'

'দুটো—অন্তত আমি তাই জানি।' মাথা নিচু করে বলল ইচাম, যেন লজ্জা পেয়েছে, 'কুঁড়েঘরের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে আমি দেখেছি। সাহেব হয়তো ভয় পেয়ে এসব কাণ্ড করছেন, এই কথা ভেবে আমি সবসময় তাঁর ওপর নজর রাখার

pathagar.net

চেষ্টা করেছি।...আমার বিশ্বাস, বাকি ফোঁড়াগুলোও উনি একইভাবে চিকিৎসা করেছেন।'

'কতগুলো ফোঁড়া হয়েছে?'

'অনেক।' অস্ফুটে বলল ইচাম।

'খাওয়াদাওয়া কীরকম করছে?' ভ্যান রিটেন জিগ্যেস করল।

'একেবারে নেকড়ের মতো। দুটো বেয়ারার চেয়েও বেশি।' ইচাম বলল।

'হাঁটতে পারছে?'

'সামান্য হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারেন, তবে যন্ত্রণায় চিৎকার করেন,' সহজ গলায় ইচাম জবাব দিল।

'জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে?'

'মাত্র দুবার,' ইচাম বলল, 'প্রথম ফোঁড়াটা ফেটে যাওয়ার পর একবার, আর পরে একবার। তখন উনি কাউকে কাছে আসতে দেন না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট শুনতে পেতাম, উনি কথা বলছেন, একটানা। এতে আদিবাসীরা ভীষণ ভয় পেয়েছিল।'

'প্রলাপ বকছে কি আদিবাসীদের ভাষায়?' ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

'না, তবে ওই জাতীয় অন্য কোনও ভাষায়। হামিদ বুরগাশ বলছিল, উনি বালুন্ডা ভাষায় কথা বলছিলেন। বালুন্ডা ভাষা আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হচ্ছিল কয়েকটা শব্দের সঙ্গে মং-বাটু শব্দের মিল আছে। যাই হোক, মং-বাটু বেয়ারারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল।' একটু থেমে ইচাম আবার বলল, 'শুধু ওরা নয়, জাঞ্জিবারের লোকেরাও ভয় পেয়েছে; এমনকী হামিদ বুরগাশ আর আমিও বাদ পড়িনি। তবে আমাদের ভয়ের কারণ অন্য। স্টোনসাহেব দুরকম গলায় কথা বলছিলেন।'

'দুরকম গলায়?' ভ্যান রিটেন যেন প্রতিধ্বনি তুলল।

'হ্যাঁ,' ইচাম বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল : 'দুরকম গলায়; যেন দুজন লোক কথা বলছে। একটা তাঁর নিজের গলা, আর অন্যটা সরু তীক্ষ্ণ স্বর। এরকম স্বর আমি কখনও শুনিনি। স্টোনসাহেবের কথার দু-একটা শব্দ আমি বুঝতে পেরেছিলাম —অনেকটা আমার জানা মং-বাটু শব্দের মতো। যেমন, নেক্রু, মিটাবাবা আর নিদো— এগুলোর মানে হল মাথা, কাঁধ আর ঊরু; সরু গলায় যেসব চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম, তার মধ্যে খুন, মৃত্যু, ঘৃণা—এই শব্দ তিনটে আমি পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি। হামিদ বুরগাশও এই কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। ও মং-বাটু ভাষা আমার চেয়ে অনেক ভালো জানে।'

'বেয়ারারা কী বলছিল?' ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

'ওরা খালি বলছিল, ''লুকুন্ডু, লুকুন্ডু!'' এ-শব্দটার মানে আমি জানতাম না; হামিদ বুরগাশ বলল যে, এটা মং-বাটু শব্দ—মানে চিতাবাঘ।' ইচাম বলল।

'না, এর মানে, ডাকিনীবিদ্যা,' ভ্যান রিটেন বলল। তারপর প্রশ্ন করল, 'দুটো স্বর কি একইসঙ্গে শোনা যাচ্ছিল, না একটা অন্যটার উত্তর দিচ্ছিল?'

ইচামের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভাঙা গলায় উত্তর দিল, 'কখনও-কখনও দুটো স্বরই একসঙ্গে শোনা যাচ্ছিল।'

'একসঙ্গে!' ভ্যান রিটেনের ঠোঁট চিরে বেরিয়ে এল।

'শুনে তো সবার ওইরকমই মনে হয়েছিল।' একটু থামল ইচাম, ইতস্তত করল, দিশেহারাভাবে আমাদের দিকে দেখল।...তারপর জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, বলুন তো, কোনও মানুষ কি একইসঙ্গে কথা বলতে আর শিস দিতে পারে?'

'তার মানে?' ভ্যান রিটেন প্রশ্ন করল।

'স্টোনের কথা আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম—গম্ভীর, ভারি, শান্ত কণ্ঠস্বর। আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ জোরালো এক শিসের শব্দ—সেই শব্দের সঙ্গে মেশানো রয়েছে এক অদ্ভুত শ্বাসের টান। জানেন তো, যতোই জোরে একটা বুড়ো লোক শিস দিক না কেন, তার সুর কোনও ছেলে, বাচ্চা মেয়ে বা যুবতীর শিসের সুরের চেয়ে আলাদা। যে-কোনও কারণেই হোক, বয়স্ক লোকেদের শিসের সুর অনেক ভারি হয়। একটা খুব ছোট্ট মেয়ে যদি একটানা শিস দিয়ে যায়, তা হলে যেরকম শোনায়, ওই শিসের শব্দটা ঠিক সেইরকম। তবে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও তীব্র; আর স্টোনের গম্ভীর গলা ছাপিয়ে ওটা শোনা যাচ্ছিল।'

'তোমরা ওর কাছে গিয়েছিলে?' ভ্যান রিটেন জোরালো উত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল।

'না, যাইনি।' বলল ইচাম, 'কারণ তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, ওই সময়ে কেউ যেন তাঁর কাছে না যায়। যদি যায়, তা হলে তাকে মরতে হবে। তাঁর কথার চেয়েও আচরণে আমরা বেশি ভয় পেয়েছি। এ যেন কোনও রাজা তাঁর মৃত্যুশয্যার পবিত্র নির্জনতা রক্ষা করতে আদেশ করছেন। এক কথায়, সে-আদেশ অমান্য করা যায় না।'

'ও—' ভ্যান রিটেন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল।

'সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ,' অসহায় সুরে আবার বলল ইচাম, 'আমি ভাবছিলাম, যদি আপনারা...''

স্টোনের প্রতি ইচামের মমতা, ভালোবাসা, তার রীতিমাফিক আচরণের খোলস ছাপিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, স্টোনের পুজোই ইচামের একমাত্র ব্রত।

অন্যান্য অনেক দক্ষ মানুষের মতো ভ্যান রিটেনের মধ্যেও কিছুটা কঠিন স্বার্থপরবোধ রয়েছে। এবারে সেটা প্রকাশ পেল। সে বলল, আমরাও স্টোনের মতো প্রাণ হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি; দুজন অভিযাত্রীর মধ্যে রক্ত ও অনুভূতির বন্ধন সে অস্বীকার করে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মরণাপন্ন একজন অভিযাত্রীর জন্য অন্য কোনও অভিযাত্রী দলের মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াটা নেহাতই বোকামি মাত্র, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

pathagar.net

৩

ভ্যান রিটেনের যুক্তি-তর্কের সামনে ইচাম নির্বিকার অথচ অপরাধী ভঙ্গিতে বসে রইল। যেন প্রধান শিক্ষকের সামনে কোনও ইস্কুলের ছেলে চুপচাপ বকুনি খেয়ে চলেছে। অবশেষে ভ্যান রিটেন বলল, 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি পিগমিদের খোঁজে এসেছি। শুধুই পিগমিদের খোঁজে।'

'তা হলে দেখুন তো, এগুলো হয়তো আপনার কৌতূহলের খোরাক জোগাতে পারে।' খুবই শান্ত গলায় ইচাম বলল।

খাটো জামার পাশ-পকেট থেকে দুটো জিনিস বের করে সে ভ্যান রিটেনের হাতে দিল। জিনিস দুটো গোল, আকারে কুলের চেয়ে সামান্য বড়, পীচ ফলের চেয়ে অল্প ছোট। হাতের চেটোয় মুঠো করে ধরার পক্ষে ঠিক মাপের। জিনিস দু-টোর রং কালো। প্রথমটা আমি ওগুলো ভালো করে দেখার চেষ্টা করিনি।

'পিগমি!' অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল ভ্যান রিটেন, 'সত্যিকারের পিগমিই বটে। আর, এরা দেখছি দু-ফুটের বেশি লম্বা হবে না। তুমি বলতে চাও এগুলো প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মাথা?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না,' ইচাম সুষম স্বরে বলল, 'আপনি নিজের চোখেই দেখুন।'

একটা মাথা ভ্যান রিটেন আমার দিকে এগিয়ে দিল। অস্তায়মান সূর্যের আলোয় সেটা খুব কাছ থেকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম। মাথাটা শুকিয়ে নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং পেশিগুলো অসম্ভব শক্ত। কেটে নেওয়া গলার চামড়া যেখানে কুঁচকে ভাঁজ হয়ে রয়েছে সেখান থেকে কশেরুকার অংশবিশেষ বাইরে বেরিয়ে আছে। ছুঁচলো চোয়ালের ওপর খুদে থুতনিটুকু বেশ চোখে পড়ে, টান-টান হয়ে সরে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁকে ছোট-ছোট সাদা দাঁত সমানভাবে সাজানো, ছোট নাকটা চ্যাপটা, কপাল উঁচু ও চওড়া, লিলিপুট-মাথার মসৃণ চামড়ার ওপর এখানে ওখানে চোখে পড়ে থোকা-থোকা রেশমি চুলের বনসাই ঝোপ। না বাচ্চা, ছেলেমানুষ বা যুবক—এরকম কোনও ছাপই মুখটার মধ্যে নেই, বরং কোনও প্রৌঢ়ের বয়েসের ছাপই সেখানে চোখে পড়ে।

'এগুলো কোত্থেকে পেয়েছ?' ভ্যান রিটেন প্রশ্ন করল।

'জানি না,' ইচামের নিখুঁত উত্তর শোনা গেল, 'ওষুধের খোঁজে স্টোনসাহেবের জিনিসপত্র হাতড়াতে গিয়ে এগুলো পেয়েছি। উনি কোত্থেকে পেয়েছেন তা বলতে পারছি না। তবে এটুকু শপথ করে বলব, এই এলাকায় ঢোকার সময় ওইগুলো তাঁর সঙ্গে ছিল না।'

'ঠিক বলছ?' বড়-বড় চোখ ইচামের চোখে স্থির রেখে ভ্যান রিটেন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলছি,' অস্ফুটে জবাব দিল ইচাম।

pathagar.net

'তোমার অজান্তে সে ওগুলো পেল কেমন করে?' ভ্যান রিটেন সন্দেহ প্রকাশ করল।

'এক-একসময় আমরা শিকারে বেরিয়ে দশদিন পর্যন্ত আলাদা থেকেছি।' ইচাম বলল, 'তা ছাড়া স্টোনসাহেব কম কথার মানুষ। কী করছেন না করছেন আমাকে কিছু বলেননি। আর হামিদ বুরগাশ মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। তার লোকজনকেও কড়া শাসনে রাখে।'

'এই মাথাগুলো তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ?'

'খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি।'

ভ্যান রিটেন তার নোটবই বের করল, একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সেটা ভাঁজ করে সমান তিনভাগে ভাগ করল। এক টুকরো আমাকে দিল, আর-এক টুকরো দিল ইচামকে।

'আমি মনে-মনে একটা জিনিস ভেবেছি,' ভ্যান রিটেন বলল, 'সেটা খতিয়ে দেখার জন্যে আমি চাই, মাথাগুলো দেখে আমাদের যা মনে হচ্ছে সেটা আমরা প্রত্যেকে এই কাগজে লিখে ফেলি। তারপর তিনটে লেখা মিলিয়ে দেখা যাবে।'

ইচামকে একটা পেনসিল দিলাম; সে লিখতে শুরু করল। তার লেখা হয়ে গেলে পেনসিলটা সে আবার আমাকে ফিরিয়ে দিল। আমি লেখা শেষ করলাম।

'তিনটি লেখা পড়ো,' নিজের লেখাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভ্যান রিটেন বলল।

ভ্যান রিটেন লিখেছে : বুড়ো বালুন্ডা রোজা।

ইচাম লিখেছে : বুড়ো মং-বাটু রোজা।

আর আমি লিখেছি : বুড়ো কাটোংগ্যে জাদুকর।

'দেখেছ!' ভ্যান রিটেন উত্তেজিত হয়ে বলল, 'পিগমিদের সঙ্গে এই মাথাগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' ইচাম বলল।

'অথচ তুমি বলছ এগুলো স্টোনের কাছে আগে ছিল না?'

'না। এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।' ইচাম জোরের সঙ্গে বলল।

'ব্যাপারটা নিয়ে তা হলে একটু খোঁজ করা দরকার,' ভ্যান রিটেন বলল, 'চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আর সবার আগে, আমি স্টোনকে বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

সে হাত বাড়িয়ে ধরাতেই প্রচণ্ড আবেগে ইচাম তার হাত মেলাল। ইচামের চোখে-মুখে তখন শুধুই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছিল।

pathagar.net

৪

একমাত্র উৎকণ্ঠার ঘোরেই হয়তো ইচাম পাঁচদিনে আমাদের তাঁবুতে এসে পৌঁছতে পেরেছিল; কারণ ফেরার সময় চেনা পথ হওয়া সত্ত্বেও এবং আমাদের দলের সাহায্য পেয়েও একই রাস্তা পেরোতে তার আটদিন সময় লাগল।

দেখলাম, স্টোনকে বেশ যত্ন-আত্তির মধ্যেই রাখা হয়েছে। ইচামের নির্দেশে উঁচু 'জারিবা' কাঁটাগাছ দিয়ে কুঁড়েঘরগুলো ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কুঁড়েঘরগুলো বেশ শক্তপোক্ত ভাবে তৈরি, মাথার ওপর খড়ের ছাউনি দেওয়া। আর স্টোনের ঘরটা যতখানি ভালোভাবে করা সম্ভব ততখানি যত্ন নিয়েই তৈরি করা হয়েছে। হামিদ বুরগাশ একাই মং-বাটু দলটাকে ধরে রেখেছে। একটা লোকও দল ছেড়ে পালায়নি, এবং তার নির্দেশে নিয়ম-শৃঙ্খলা দিব্যি মেনে চলছে। এ ছাড়া সে একজন করিৎকর্মা পরিষেবক ও বিশ্বাসী ভৃত্য।

দুজন জাঞ্জিবারবাসী মোটামুটি শিকার ধরে গোটা দলটাকে উপোসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

স্টোন একটা ক্যাম্বিশের খাটে শুয়েছিল; খাটের পাশেই একটা খাটো ক্যাম্বিশের টেবিল। তার ওপরে একটা জলের বোতল, কয়েকটা ওষুধের শিশি, স্টোনের হাত-ঘড়ি ও খাপে ভরা ক্ষুর।

স্টোনকে দেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সবল বলেই মনে হল, কিন্তু সে যেন অন্য কোনও জগতে রয়েছে—অচেতন নয়, তবে এক ঘোরের মাঝে ডুবে রয়েছে। আমরা যে ঘরে ঢুকেছি, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা যেন সে দেখতেই পাচ্ছে না। স্টোনকে দেখামাত্রই আমি চিনতে পারলাম। অবশ্য ওর তারুণ্যের তেজ ও সৌন্দর্য কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু মাথার সোনালি ঢেউখেলানো চুল এখনও সুপ্রচুর, চোয়ালের রেখায় দৃঢ়তার ছাপ, মুখে অসুস্থতাজনিত কয়েকদিনের সোনালি দাড়ি। ওর শরীর এখনও বিশাল, বুকের ছাতি প্রশস্ত। চোখের তারা ঘোলাটে, আর মুখ থেকে প্রলাপের যেসব টুকরো শোনা যাচ্ছে তা নিতান্তই অর্থহীন শব্দাংশ মাত্র।

স্টোনের গায়ের চাদর সরিয়ে ব্যান্ডেজ খুলতে ভ্যান রিটেনকে সাহায্য করল ইচাম। ভ্যান রিটেন এবারে ভালো করে তাকে দেখল। বহুদিন শয্যাশায়ী কোনও মানুষের তুলনায় স্টোনের স্বাস্থ্য বেশ ভালোই মনে হল। হাঁটু, কাঁধ ও বুক ছাড়া শরীরের আর কোথাও কোনও ক্ষতের দাগ নজরে পড়ল না। দু-হাঁটুতে ও হাঁটুর ঠিক ওপরে অসংখ্য বৃত্তাকার শুকনো ক্ষতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। দুটো কাঁধের কাছেও একই ধরনের অজস্র ক্ষতচিহ্ন। দু-তিনটে ক্ষত দেখে মনে হল সদ্য-সদ্য করা হয়েছে, আর চার-পাঁচটা ক্ষত এখনও ভালো করে সেরে ওঠেনি। বুকের দুপাশের পেশির ওপর দু-দুটো টাটকা ফোঁড়া দেখা গেল। বাঁ-দিকেরটা ডানদিকের চেয়ে একটু ওপরে ও শরীরের পাশ ঘেঁষে বেড়ে উঠেছে। না, জিনিসগুলো ঠিক ফোঁড়া বা কার্বাঙ্কল নয়; তবে কোনও শক্ত ভোঁতা পিণ্ড যেন স্টোনের স্বাস্থ্যমণ্ডিত মাংস ও চামড়া ভেদ

করে মাথা তুলেছে। পিণ্ডের চারপাশটা কিন্তু ফুলে ওঠেনি।

'এ-দুটো এখন কাটব না,' ভ্যান রিটেন বলল; ইচামও সায় দিল তার কথায়।

সূর্যাস্তের ঠিক আগে ওকে আমরা আবার দেখলাম। সে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। বুকের ছাতি বিশাল ও শক্তিশালী, কিন্তু সেই ঘোরটা যেন এখনও কাটেনি। ইচামকে ওর কাছে রেখে আমরা পাশের কুঁড়েঘরে রাত কাটাতে গেলাম। জঙ্গলের যে-নৈশগুঞ্জন কানে এল তা গত কয়েক মাসে শোনা শব্দের চেয়ে কিছু নতুন নয়, এবং তাড়াতাড়িই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

৫

ঘন জমাট অন্ধকারে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি জেগে রয়েছি এবং কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছি। দুটো কণ্ঠস্বর আমার কানে এল ঃ একটা স্টোনের, অন্যটা শ্বাস টানা হিসহিসে স্বর। প্রথম স্বরটা স্টোনের বলে চিনতে পারলেও দ্বিতীয় স্বরটা আমার অচেনা। সেই স্বরের শক্তি সদ্যোজাত কোনও শিশুর কান্নার শব্দের চেয়েও অনেক কম, কিন্তু তার মধ্যে দূর-দূরান্তে পৌঁছে যাওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। কান পেতে আছি, অন্ধকারে ভ্যান রিটেনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। একটু পরে সেও বুঝতে পারল আমি জেগে রয়েছি, শুনছি। ইচামের মতো আমিও বালুন্ডা ভাষা খুব অল্পসল্পই জানি, কিন্তু তবুও দু-একটা শব্দ বেশ বুঝতে পারলাম। ক্ষণস্থায়ী নীরবতায় যতিচিহ্নিত কথোপকথন শুনতে লাগলাম একমনে।

তারপর হঠাৎই দুটো গলা একসঙ্গে উঠে শোনা গেল ঃ স্টোনের গম্ভীর মেজাজি স্বর, যেন সে সম্পূর্ণ সুস্থ, আর সেই তীক্ষ্ণ হিসহিসে কণ্ঠ—দুজনেই একসঙ্গে তাড়াহুড়ো করে কথা বলছে, দুটো মানুষ ঝগড়া করছে।

'আমি আর পারছি না,' বলল ভ্যান রিটেন, 'চলো গিয়ে দেখি।'

তার কাছে একটা চোঙাকৃতি বৈদ্যুতিক নৈশবাতি ছিল। ভ্যান রিটেন সেটা হাতড়ে বের করল, বোতাম টিপে আমাকে সঙ্গে আসতে বলল। কুঁড়েঘরের বাইরে বেরিয়ে সে আমাকে চুপচাপ দাঁড়াতে ইশারা করল। সহজাত প্রবৃত্তিবশে আলোটা নিভিয়ে দিল, যেন আলো জ্বালানোয় ওর শুনতে অসুবিধে হচ্ছে।

বেয়ারাদের জ্বালানো ধুনির হালকা আলো ছাড়া আমরা মোটামুটি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে। গাছের পাতার গোলকধাঁধা ভেদ করে তারার আলো অতিকষ্টে ঠিকরে এসে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে বহতা নদীর অস্ফুট ছলছল শব্দ। দুটো স্বর একইসঙ্গে আমরা শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎই তীক্ষ্ণ হিসহিসে স্বরটা এক ক্ষুরধার চেরা শিসের শব্দে পালটে গেল। স্টোনের অনুযোগের খাপছাড়া কথার মাঝেই পথ কেটে নিয়ে সেই শিস নির্লজ্জ বিদ্রোহী ঢঙে পা ফেলে যেন এগিয়ে চলেছে।

'ওঃ ভগবান!' ভ্যান রিটেন অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল।

হঠাৎই সে আলোটা জ্বালিয়ে দিল।

pathagar.net

ইচামকে আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। স্বাভাবিক, কারণ, এতদিনের দায়িত্বের বোঝা আজ ভ্যান রিটেনের কাঁধে তুলে দিতে পেরে সে এই মুহূর্তে দীর্ঘদিনব্যাপী দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রমের ক্লান্তির শিকার হয়ে নিজেকে গভীর অচেতনতার হাতে সঁপে দিয়েছে।

শিসের শব্দ এখন থেমে গেছে, এবং দুটো স্বর আবার একসঙ্গে শোনা যাচ্ছে। দুটো স্বরই ভেসে আসছে স্টোনের খাট থেকে। কেন্দ্রীভূত উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, স্টোন সেই আগের মতোই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, শুধু তার হাত দুটো এখন ওপর দিকে রাখা এবং গায়ের চাদর তুলে বুকের ব্যান্ডেজটা সে ছিঁড়ে ফেলেছে।

তার ডান বুকের ফোলা পিণ্ডটা ফেটে গেছে। ভ্যান রিটেন সেটা লক্ষ করে আলো ফেলতেই আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তার গায়ের মাংস ফুঁড়ে একটা মাথা বেরিয়ে এসেছে। মাথাটা ইচামের দেখানো শুকনো নমুনার মতো, যেন লিলিপুট সাইজের কোনও বালুন্ডা রোজের মাথা। রং কুচকুচে কালো, আলো পড়ে চকচক করছে; খুদে খুদে পাপী চোখ দুটোর সাদা অংশ ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। নিগ্রোদের মতো পুরু লাল ঠোঁটজোড়া দেখলেই ঘেন্না হয়; সেই ঠোঁট সরে গিয়ে চোখে পড়ছে ছোট-ছোট ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। কালো মাথাটার ছোট্ট খুলির ওপরে থোকা-থোকা আঁশের মতো চুল। ওইটুকু মুখে নিখুঁতভাবে সমস্ত কিছু আমাদের নজরে পড়ল। চরম বিদ্বেষে মাথাটা এপাশ-ওপাশ ঘুরছে এবং সেই অদ্ভুত কৃত্রিম হিসহিসে স্বরে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। স্টোন তারই মাঝে বাধা দিয়ে অর্ধস্ফুটভাবে নানান প্রলাপ বকছে।

স্টোনের দিক থেকে ফিরে ভ্যান রিটেন অনেক কষ্টে ইচামকে জাগিয়ে তুলল। জেগে উঠে সব দেখে-শুনে ইচাম হতবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইল।

'তুমি ওকে দুটো ফোঁড়া কেটে ফেলতে দেখেছ?' ভ্যান রিটেন জিগ্যেস করল।

কোনওরকমে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ইচাম।

'তাতে কি খুব রক্ত বেরিয়েছিল?' ভ্যান রিটেনের স্বর উৎকণ্ঠিত।

'না, খুব অল্প,' ইচাম উত্তর দিল।

'ওর হাত দুটো চেপে ধরো,' ইচামকে নির্দেশ দিল ভ্যান রিটেন।

স্টোনের ক্ষুরটা তুলে নিয়ে হাতের আলোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। স্টোনকে দেখে মনে হল না, সে আলো দেখতে পাচ্ছে বা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে। কিন্তু সেই ছোট্ট মাথাটা অস্থিরভাবে আমাদের লক্ষ করে চিৎকার করতে লাগল।

ভ্যান রিটেনের হাত অটল স্থির। সে ক্ষুরের আঘাত করল নিশ্চিত অথচ ধীর শান্ত ভঙ্গিতে। আশ্চর্যরকম অল্প রক্তপাত হল স্টোনের শরীর থেকে। তখন ভ্যান রিটেন সাধারণ ক্ষতের মতো করে সেখানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

যে-মুহূর্তে আঁচিলের মতো কালো মাথাটা কেটে ফেলা হল সেই মুহূর্তেই

স্টোনের প্রলাপ বন্ধ হয়ে গেল। স্টোনের সবরকম পরিচর্যা সেরে ভ্যান রিটেন আমার হাত থেকে আলোটা প্রায় ছিনিয়েই নিল। তারপর বেশ করে খাটের আশেপাশে মেঝেটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল, ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় পিস্তলের বাঁটটা দু-একবার মেঝেতে ঠুকল।

আমরা আমাদের কুঁড়েঘরে ফিরে এলাম, কিন্তু সে-রাতে আর ঘুমোতে পেরেছি কিনা সন্দেহ আছে।

৬

পরদিন দুপুর নাগাদ প্রকাশ্য দিনের আলোয় স্টোনের ঘর থেকে আমরা আবার দুটো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ইচামকে তার প্রহরার জায়গায় ঘুমন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। বুকের বাঁ-দিকের ফোঁড়াটা এবার ফেটে গেছে, এবং আবলুষ কাঠের মতো চকচকে কালো অবিকল আর-একটা মাথা সেখানে দেখা দিয়েছে। মাথাটা চঞ্চলভাবে ছটফট করছে আর মিহি গলায় অবিরাম বকবক করছে। সেই মিহি কথার স্রোতটা বাধা দিয়ে মাঝে-মাঝে স্টোনের ভারি কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করা প্রলাপের অংশ শোনা যাচ্ছে। ইচাম ঘুম ভেঙে উঠল, এবং আমরা তিনজনে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে সব দেখতে লাগলাম।

ভ্যান রিটেন সামনে এগিয়ে গেল। স্টোনের ক্ষুরটা তুলে নিয়ে খাটের পাশে হাঁটুগেড়ে বসল। পুঁচকে মাথাটা তাকে লক্ষ করে হিসহিসে তীব্র স্বরে খিঁচিয়ে উঠতে লাগল।

তখনই হঠাৎই স্টোন ইংরেজি ভাষায় কথা বলে উঠল।

'আমার ক্ষুর হাতে...কে তুমি?'

চমকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল ভ্যান রিটেন।

এখন স্টোনের চোখ অনেক উজ্জ্বল, অনেক পরিষ্কার। সে এখন কুঁড়েঘরের চারদিকে চঞ্চল চোখে তাকাচ্ছে।

'সব শেষ,' সে বলল, 'সব শেষ হয়ে এসেছে—আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি। ইচামকে যেন সত্যি-সত্যি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সিঙ্গল্‌টন! ওঃ, সিঙ্গল্‌টন! আমার ছোটবেলার সব প্রেতাত্মারা আজ আমার মৃত্যু দেখতে এসেছে। আর তুমি, অচেনা প্রেতাচ্ছায়া...কালো দাড়ি, হাতে আমার ক্ষুর! ওঃ, ভগবান!'

'আমি ভূত নই, স্টোন,' আমি কোনওরকমে বললাম, 'আমি বেঁচে আছি। ইচাম আর ভ্যান রিটেনও সত্যিকারের বেঁচে আছে। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'ভ্যান রিটেন?' অবাক বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'যাক, আমার অসমাপ্ত কাজ তা হলে সুযোগ্য হাতেই পড়বে। ভাগ্য তোমার সহায় হোক, ভ্যান রিটেন।'

ভ্যান রিটেন তার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

pathagar.net

'এক মিনিট একটু নড়াচড়া বন্ধ করো দেখি,' প্রবোধ দেওয়ার সুরে সে বলল, 'চিমটি কাটার মতো সামান্য ব্যথা লাগবে মাত্র।'

'এরকম অনেক চিমটি কাটার ব্যথা আমি সহ্য করেছি,' পরিষ্কার স্বরে উত্তর দিল স্টোন, 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। নিশ্চিন্তে মরতে দাও। সর্পদানব হাইড্রাও এর কাছে কিছু না। তুমি বড় জোর দশটা, একশোটা, হাজারটা মাথা কেটে ফেলতে পারো, কিন্তু অভিশাপ তো আর কেটে ফেলতে বা তুলে দিতে পারবে না। যা প্রতিটি হাড়ের মজ্জায়-মজ্জায় ঢুকে গেছে তা কি মাংস কেটে বের করা যাবে? আমাকে নিয়ে আর কাটা-ছেঁড়া করবে না, কথা দাও!'

তার স্বরে ছেলেবেলাকার সেই আদেশের সুর। এই সুর আর সবাইয়ের মতো ভ্যান রিটেনকেও বিচলিত করল।

'কথা দিলাম,' ভ্যান রিটেন বলল।

এই শব্দ দুটো উচ্চারণ করামাত্র স্টোনের চোখ আবার ঝাপসা হয়ে এল। তাকে ঘিরে আমরা তিনজন বসে রইলাম। দেখতে লাগলাম, সেই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত খুদে দানবটা কীভাবে ধীরে-ধীরে স্টোনের মাংস ভেদ করে বেড়ে উঠছে। একসময় দুটো সরু-সরু বীভৎস কালো হাত বেরিয়ে এল বাইরে। তাতে ছোট ফুটকির মতো নখের আকৃতি পর্যন্ত নিখুঁত, আর হাতের চেটোর গোলাপি রং কী ভয়ঙ্কররকম স্বাভাবিক। হাত দুটো এলোপাথাড়ি ছুড়তে-ছুড়তে ডানহাতটা এগিয়ে গেল স্টোনের চিবুকের কাছে। টান মারল সোনালি দাড়িতে।

'আমি আর সইতে পারছি না,' চিৎকার করে উঠল ভ্যান রিটেন, ক্ষুরটা আবার তুলে নিল হাতে।

সেই মুহূর্তে স্টোনের চোখ খুলে গেল, কঠিন দৃষ্টিতে যেন আগুন জ্বলছে।

'ভ্যান রিটেন তার কথার খেলাপ করবে?' স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল সে, 'কক্ষনও না!'

'কিন্তু তোমাকে যে বাঁচাতেই হবে,' রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে ভ্যান রিটেন বলল।

'আমাকে আর বাঁচানোর প্রশ্ন ওঠে না। আমার সব দুঃখ-কষ্ট এখন শেষ হতে চলেছে,' স্টোন বলল, 'আমার সময় এসে গেছে। এই অভিশাপ আমাকে বাইরে থেকে দেওয়া হয়নি; এ অভিশাপ জন্ম নিয়েছে আমার শরীরের ভেতর থেকে—যেমন এই ভয়ঙ্কর খুদে মানুষটা। আমি এবার চলি—।'

তার চোখ বুজে এল। আমরা অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলাম। এঁটুলি পোকার মতো কালো কুচকুচে খুদে-মানুষটা তীক্ষ্ণ স্বরে তখনও রাশি-রাশি কথা ছুড়ে দিচ্ছে।

মুহূর্ত কয়েক পরেই স্টোন আবার কথা বলল, 'সবরকম ভাষা তুমি জানো?' তার গলার স্বর এখন আরও ভারি হয়ে এসেছে।

তখন সেই ক্রমে-বেরিয়ে-আসা লিলিপুট দানব হঠাৎই ইংরেজি ভাষায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, সবরকম জানি বটে, বাবু,' তার ছোট্ট জিভ বেরিয়ে এল বাইরে, ঠোঁট

pathagar.net

কেঁপে উঠল, মাথা নাড়তে লাগল এপাশ-ওপাশ। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, অদ্ভুত প্রাণীটির সুতোর মতো সরু-সরু পাঁজরগুলো ওঠা-নামা করছে—যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে কাঁপছে।

'ও কি আমাকে ক্ষমা করেছে?' চাপা রুদ্ধ কণ্ঠে জিগ্যেস করল স্টোন।

'যদ্দিন দেওদারু গাছের পাতায় শ্যাওলা দুলবেক, তদ্দিন লয়,' মাথাটা চিঁ-চিঁ করে বলল, 'যদ্দিন পঁচারট্রেন হ্রদের ওপর তারা ঝিলিক মারবেক, তদ্দিন লয়।'

আর তখুনি স্টোন এক ঝটকায় কাত হয়ে গেল একপাশে। পরমুহূর্তেই সে মারা গেল।

৭

সিঙ্গল্‌টনের কণ্ঠস্বর থামতেই সারা ঘরে কিছুক্ষণের জন্য নেমে এল নিথর নিস্তব্ধতা। আমরা পরস্পরের শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। টুম্‌লি বোকার মতো সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'তুমি নিশ্চয়ই সেই লিলিপুট প্রাণীটাকে কেটে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছ?'

সিঙ্গল্‌টন কঠোর অভিব্যক্তি নিয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল।

'স্টোনকে আর কোনওরকম কাটা-ছেঁড়া না করেই আমরা কবর দিয়েছিলাম।' সে বলল।

বিচারবুদ্ধিহীন টুম্‌লি বলে উঠল, 'কিন্তু, গোটা ব্যাপারটাই একেবারে অবিশ্বাস্য!'

সিঙ্গল্‌টনের মুখের পেশি কঠিন হল।

'আমি আশা করিনি তুমি এ-কাহিনি বিশ্বাস করবে,' সে বলল, 'কারণ, প্রথমেই তো ভাই বলে নিয়েছি, নিজের চোখে দেখেও, কানে শুনেও, ওই ঘটনার কথা আবার যখন ভাবি, তখন নিজেই আর বিশ্বাস করতে পারি না।'

pathagar.net

ট্রেনের যাত্রী

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

লন্ডন ছেড়ে রওনা হওয়ার আশায় এক ভদ্রলোক সকালবেলা ইউস্টন স্টেশনে এলেন। সঙ্গে তাঁর কিছু কাগজপত্র ছিল—ইচ্ছে ছিল ট্রেনে যেতে-যেতে সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নেবেন। সুতরাং গার্ডসাহেবকে তিনি প্রশ্ন করলেন, একটা কামরা কি খালি পাওয়া যাবে?

ট্রেনে তেমন ভিড় নেই। ফলে 'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, স্যার,' বলে গার্ডসাহেব ভদ্রলোককে তুলে দিলেন এক খালি কামরায় এবং যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজায় চাবি দিয়ে গেলেন। ট্রেন সবে চলতে শুরু করেছে, এমনসময় একটা ব্যাগ হাতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক তড়িঘড়ি ঢুকে পড়লেন সেই কামরায়। প্রথম যাত্রী সামান্য বিরক্তি নিয়ে ভাবলেন, গার্ডসাহেব হয়তো দরজায় ঠিকমতো চাবি লাগাননি।

একটু পরেই দুজনে আলাপচারিতায় মগ্ন হলেন। কথায়-কথায় জানা গেল, দ্বিতীয় ব্যক্তি রেল কোম্পানির একজন পরিচালক, এবং বর্তমানে নতুন একটি শাখা রেল-লাইন খোলার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তিনি আরও বললেন, 'জানেন আমার ব্যাগে কত টাকা আছে?'

প্রথম যাত্রীকে নিরুত্তর দেখে তিনি নিজেই বললেন, 'সত্তর হাজার পাউন্ড। নতুন রেল লাইন খোলার কাজে লাগাব; এটা ওখানে কাছাকাছি কোনও ব্যাঙ্কে জমা দেব।'

'এত টাকা সঙ্গে নিয়ে একা চলাফেরা করতে আপনার ভয় করছে না?' প্রথম যাত্রী অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

pathagar.net

'না, না,' হালকা উত্তর পাওয়া গেল : 'কে আর জানতে পারছে! তা ছাড়া, কেই-বা এ-টাকা লুট করবে? আপনাকে বললাম বলে আপনি নিশ্চয়ই সে-কাজ করবেন না? না, ওসব ভয় আমার একটুও নেই।'

তাঁদের কথাবার্তা চলতে লাগল। একসময় ব্যাগ-হাতে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো কথা, যে-বাড়িতে আপনি যাচ্ছেন, সেটা আমার চেনা। ওই বাড়ির মালিকের বউ হল আমার ভাইঝি। আপনি ওকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দয়া করে বলবেন পরের বার যখন আমি যাব, তখন যেন ''ব্লু রুম''-এ অত আগুন না জ্বালায়। গতবারে আগুনের তাপে একদম ভাজা হয়ে গেছি। ওঃ! আমার স্টেশন এসে গেছে।'

এই কথা বলেই বয়স্ক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নামার তোড়জোড় করতে লাগলেন। কিন্তু নামার আগে প্রথমজনের হাতে একটা কার্ড দিলেন তিনি। তাতে 'ডোয়েরিংহাউস' নামটা লেখা। তারপর ট্রেন থেকে নেমে রওনা হলেন। তাঁর সহযাত্রী আয়েস করে বসে জানলা দিয়ে দেখলেন, প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ব্যাগ হাতে তিনি এগিয়ে চলেছেন। সেই মুহূর্তে হঠাৎ প্রথম যাত্রীর নজরে পড়ল, তাঁর পায়ের কাছে, মেঝেতে, একটা চুরুটের বাক্স পড়ে আছে। সেটা তুলে নিতেই বাক্সের গায়ে 'ডোয়েরিংহাউস' নামটা তার চোখে পড়ল। ট্রেন ছাড়তে তখনও মিনিট-দুয়েক দেরি দেখে একলাফে ট্রেন থেকে নেমে মিস্টার ডোয়েরিংহাউসকে ধরার জন্য প্ল্যাটফর্ম ধরে তিনি ছুটতে শুরু করলেন—যদি তাঁর চুরুটের বাক্সটা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

হঠাৎ তাঁর এক ঝলক নজরে পড়ল, প্ল্যাটফর্মের শেষে একটা লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে মিস্টার ডোয়েরিংহাউস তার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। নতুন লোকটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার মাথায় বালি রং চুল, এবং এদিকে ফিরেই সে ডোয়েরিংহাউসের সঙ্গে কথা বলছে।

প্রথম যাত্রী আরও কিছুটা এগোতেই তাঁদের দুজনকে আর দেখা গেল না। এক বিচিত্র উপায়ে তাঁরা যেন মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ভালো করে চারপাশে তাকিয়েও তাঁদের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। তখন তিনি কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কুলিকে প্রশ্ন করলেন, 'ভাই, ওইখানে যে-দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, ওঁরা কোনদিকে গেলেন দেখেছ?'

'না, বাবু,' হতভম্ব কুলি উত্তর দিল, 'ওখানে তো কোনও লোককে দেখিনি। আর এপাশ দিয়েও কেউ যায়নি।'

ট্রেন তখন ছাড়ার বাঁশি দিয়েছে। ফলে ভদ্রলোক আর কোনওরকম খোঁজখবরের চেষ্টা না করে বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে ফিরে গেলেন নিজের কামরায়।

সন্ধেবেলা তিনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছলেন। নৈশভোজের পোশাক পরে বসার ঘরে ঢুকতেই দেখলেন বহু অতিথির সমাবেশ। খেতে বসে তাঁর মনে পড়ল ডোয়েরিংহাউসের অনুরোধের কথা। ফলে গৃহকর্ত্রীকে লক্ষ করে তিনি বললেন, 'ট্রেনে আপনার এক কাকার সঙ্গে আলাপ হল। উনি আপনাকে বলতে বলেছেন....।'

এবং বাকি খবরটুকু তিনি দিলেন।

ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হল যেন ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মুখের খুশির আলো দপ করে নিভে গেল। তাঁর স্বামীর অবস্থাও একইরকম। ব্যাপার-স্যাপার দেখে অতিথি ভদ্রলোক অনুমান করলেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব অস্বাভাবিক কিছু বলে ফেলেছেন। কিন্তু সেটা যে কী, বা কেন অস্বাভাবিক, তা তিনি শত চেষ্টাতেও বুঝে উঠতে পারলেন না। যাই হোক, যখন খাওয়া শেষ করে সমস্ত অতিথি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, তখন ভদ্রমহিলার স্বামী তাঁকে ডেকে একপাশে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমার স্ত্রীকে যে-কথা আপনি শোনালেন তা ভারি অদ্ভুত—মানে, ওর ওই কাকার কথা বলছি। আসলে ব্যাপার হল, ওর কাকা বেশ কিছুদিন হল উধাও হয়ে গেছেন, কেউ তাঁর খোঁজ জানে না। আরও খারাপ হল, উনি সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন। পুলিশ তাঁর খোঁজ এখনও করে চলেছে। বুঝতেই পারছেন, এগুলো ঠিক সবার সমানে আলোচনা করার মতো নয়, তাই আমরা তখন চমকে গিয়েছিলাম।'

ঘটনাচক্রে অতিথিদের মধ্যে রেল কোম্পানির আরও দুজন পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। খাওয়ার সময় ভদ্রলোকের মুখে ওইসব কথা শুনে তাঁরা পরে তাঁর কাছে এলেন। বললেন, ট্রেনে যে-লোকটির সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন তার সম্পর্কে আর কিছু তিনি বলতে পারেন কিনা।

'না,' উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, 'তাঁর সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলেছি মাত্র এবং যতদূর মনে হয়, যে-স্টেশনে উনি নেমে যান, সেখানে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে উনি আর-একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন...।'

পরিচালক দুজন নানারকমভাবে চেষ্টা করেও ভদ্রলোকের কাছ থেকে আর কোনও নতুন তথ্য পেলেন না। অবশেষে তাঁরা অনুরোধ করলেন, 'রেল কোম্পানির পরিষদের সামনে হাজির হয়ে আপনি যদি এ-কাহিনি শোনান তা হলে খুব উপকার হয়। দয়া করে এই অনুরোধটুকু রাখুন।'

ভদ্রলোক রাজি হলেন। এবং সেইমতো দিনও ঠিক হয়ে গেল।

পরিষদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র কাহিনি শোনাতে-শোনাতে হঠাৎই অবাক স্বরে চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক, 'ওই তো, উনিই সেদিন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মিস্টার ডোয়েরিংহাউসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওই যে—বালি রং চুল ভদ্রলোক।'

পরিচালকদের মধ্যে ওই বর্ণনা মতো সত্যিই এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি রেল কোম্পানির কোষাধ্যক্ষ, এবং আচমকা অভিযোগে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'না, না, আমি সেখানে থাকতেই পারি না। আমি তখন ছুটিতে ছিলাম—।'

এই ঘটনায় পরিচালকমণ্ডলী যথেষ্ট অবাক হলেন, এবং তাঁরা জোর করলেন যে, পুরোনো খাতাপত্র খুলে পরীক্ষা করে দেখা হোক, সত্যিই কোষাধ্যক্ষ তখন ছুটিতে ছিলেন কি না। পরীক্ষায় প্রমাণ হল, কোষাধ্যক্ষ মিথ্যে বলেছেন। তখন সকলে মিলে তাঁকে খুঁটিয়ে জেরা করতে শুরু করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষকে তাঁরা

স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করলেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, মিস্টার ডোয়েরিংহাউসকে তিনি খুন করেছেন—যদিও তাঁর সে-ইচ্ছে ছিল না। সত্তর হাজার পাউন্ড নিয়ে তাঁর ট্রেনে রওনা হওয়ার কথা কোষাধ্যক্ষ জানতেন। সেই স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তিনি ডোয়েরিংহাউসকে একটা নির্জন পথে যেতে রাজি করান। কোষাধ্যক্ষের উদ্দেশ্য ছিল ডোয়েরিংহাউসকে মেরে অজ্ঞান করে টাকার ব্যাগ নিয়ে সরে পড়া, কিন্তু পড়ে যাওয়ার সময় ডোয়েরিংহাউস একটা পাথরে আঘাত পেয়ে মারা যান।

চুরুটের বাক্সের রহস্য ভেদ হল আরও বিচিত্রভাবে। মিস্টার ডোয়েরিংহাউস যেদিন টাকার ব্যাগ নিয়ে রওনা হয়েছিলেন তার পরদিন থেকেই ট্রেনের ওই কামরাটা মেরামতের জন্য খুলে নেওয়া হয়। আবার ডোয়েরিংহাউসের রহস্যময় পুনরাবির্ভাবের দিনেই ওটা সারিয়ে আবার চালু করা হয়েছিল। ইউস্টন স্টেশনের সেই গার্ডসাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সেদিন তিনি কামরায় একজন ভদ্রলোককে রেখেই দরজায় বাইরে থেকে চাবি দিয়েছিলেন। এতে ভেতরের লোক হাতল ঘুরিয়ে বেরোতে পারলেও বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে পারার কথা নয়। আর, তিনি ওই কামরা ছেড়ে আসামাত্রই ট্রেন চলতে শুরু করেছিল।

➤ *দ্য প্যাসেঞ্জার উইথ দ্য ব্যাগ*

pathagar.net

আবার আমি এসেছি!

www.pathagar.net

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স-কে লেখা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই তারিখের একটি চিঠির প্রতিলিপি; চিঠির লেখক চার্লস জি. এস.—এস্কোয়ার

pathagar.net

প্রিয় লর্ড হ্যালিফ্যাক্স,

আপনার অনুরোধ মতো একটুও রং না চড়িয়ে আমার সাদামাটা গল্পটা জানাচ্ছি। বাড়িটার নাম, '...নিবাস'। বিশ্বাস করে আপনাকে নামটা বললাম, কিন্তু অনুরোধ রইল, যদি কখনও এ-ঘটনা আপনি কোনও পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তা হলে আমার এবং বাড়িটার নাম, দুই-ই দয়া করে গোপন রাখবেন। ভুতুড়ে ঘটনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গল্পের মধ্যে শুধু সেগুলোরই আমি দাম দিই যেগুলো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শোনা। এ ছাড়া অন্যান্য সব কাহিনি প্রচারের পথে এত বেশি ডালপালা গজিয়ে ফ্যালে যে, তার মধ্যে কতটুকু যে সত্যি তা নিছকই অনুমানের ব্যাপার হয়ে পড়ে।

আমার অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর তাতে সন্দেহ নেই। আর সেইজন্যেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোনওরকম ভৌতিক কাণ্ডকারখানার মধ্যে আর কোনওদিন আমি মাথা গলাচ্ছি না।

যে-বাড়িটার কথা বলছি, সেটা একটা পুরোনো জর্জীয় প্রাসাদ। বাড়িটা তৈরি হয় ১৭৪০ সাল নাগাদ, এবং ওই বাড়িতে বসে নেলসন লেডি হ্যামিলটনকে অনেক চিঠিই লিখেছেন, যার শুরু হয়েছে 'প্রিয় নিবাস' বলে। আমি ও আমার নিমন্ত্রণকর্তা, দুজনে তখন সমুদ্রে নৌকোবিলাসে ব্যস্ত ছিলাম। ফিরে এসে দেখি, তাঁর আত্মীয়স্বজনে

বাড়ি টইটম্বুর—ওরা সব কয়েকদিন থাকবে বলে এসেছে। ড্রেসিংরুমে আমার শোওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এর আগে একবার এসে শুনেছিলাম বাড়িটা নাকি ভুতুড়ে এবং বাড়ির সব মেয়েরাই এক অদ্ভুত ছায়ামূর্তিকে ভেসে বেড়াতে দেখেছে। ওদের বিশ্বাস সে নাকি ঠাকুমার মা। বাড়ির চাকরবাকরেরা এসব দেখে ভয় পেয়ে বেশিদিন থাকতে চায় না। সবই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে নৌকো বেয়ে এসে খুবই ক্লান্ত লাগছিল এবং আমি শুতে যাওয়ার আগে ভূতের ব্যাপারে কোনওরকম আলোচনা হয়নি।

মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেল। স্পষ্ট টের পেলাম, এক অপার্থিব ছায়া আমাকে ঘিরে রয়েছে। হঠাৎ আমার বিছানার ঠিক পাশেই আবির্ভূত হল এক বৃদ্ধ মানুষ কিংবা এক মহিলার ছায়ামূর্তি। তার ভয়ঙ্কর মুখ আমারই ওপর ঝুঁকে রয়েছে। আমি যে সম্পূর্ণ জেগেই ছিলাম তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমি যেন মুহূর্তে পঙ্গু হয়ে গেছি, হাত-পা একচুল নড়ানোর ক্ষমতা আমার নেই। শুধু অপলকে চেয়ে রয়েছি সেই কালান্তক পিশাচের দিকে, আর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করছি, এই অমানুষিক অবস্থা থেকে একটিবার যদি রেহাই পাই তা হলে জীবনে আর কোনওদিন প্রেতচক্র, প্ল্যানচেট, এসবে ভুলেও নাক গলাব না। কারণ, চোখের সামনে এই বাস্তব-ছায়াময় আবির্ভাব এতই ভয়ঙ্কর যে, ভাষার বর্ণনা করা যায় না।

পরদিন সকালে নিমন্ত্রণকর্তাকে একান্তে ডেকে সমস্ত ঘটনা বললাম। উনি বললেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ তিনি ছাড়া এ-বাড়ির প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও সময় একধরনের ছায়ামূর্তিকে দেখেছে।

এরপর বিশ বছর কেটে গেছে এবং ঘটনাটা আমি প্রায় ভুলেই গেছি। ওই বাড়িতে অনেকবার যাতায়াত করেছি কিন্তু আর কিছুই দেখিনি। তারপর একদিন আবার আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গেলাম। বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণকর্তা একা ছিলেন। দুজনে কিছুক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলে বেশ রাত করেই শুতে গেলাম। দাঁতের ব্যথায় আমি বেশ কষ্ট পাচ্ছিলাম। সুতরাং, বিছানায় শুয়েও একফোঁটা ঘুম এল না। প্রথমবারে এ-বাড়িতে এসে যে-ঘরে ছিলাম, এ-ঘরটা বাড়ির সে অংশে নয়, অন্য দিকে।

সময়টা ছিল গরমের শুরু; কিন্তু কেন জানি না হঠাৎই আমার কেমন শীত-শীত করতে লাগল। আমার পা থেকে শুরু করে সারা দেহ যেন বরফ হয়ে যাচ্ছে। শত জামাকাপড় গায়ে চাপানো সত্ত্বেও ঠান্ডা ভাবটা দ্রুত বেড়ে চলল; মনে হল, এই বুঝি আমার হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে, এবং এরই নাম বোধহয় মৃত্যু।

ঠিক তখনই একটা অপার্থিব কণ্ঠস্বর, যা কানে শোনা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়, যেন আমাকে লক্ষ করে বারবার বলতে লাগল, 'আবার আমি এসেছি। আবার আমি এসেছি—কুড়ি বছর পরে।'

হুবহু বিশ বছর আগের অনুভূতি আমার মনে জেগে উঠল। সাহস জুগিয়ে মনে-মনে বলে উঠলাম, 'এবার আমাকে পুরো ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে হবে, জানতে হবে। আগের বার আমি ভুল দেখেছিলাম, নাকি সত্যিই ভূত বলে কিছুর

pathagar.net

অস্তিত্ব আছে। আমি যে জেগে রয়েছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, আমার দাঁতের যন্ত্রণা স্পষ্ট টের পাচ্ছি।'

অপার্থিব সেই অশরীরী নিঃশব্দ স্বরে আবার আমাকে বলল, 'ফিরে তাকাও, ফিরে তাকাও।'

এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই হল। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন এক অপরিসীম আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, ঘরের এক কোণে অদ্ভুত এক আলোর স্তম্ভ সর্পিল গতিতে ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে চলেছে। সে-আলোর রং সাদা। আমি অপলকে দেখতে লাগলাম, ওটা ধীরে-ধীরে আমার কাছে এগিয়ে আসছে।

'আবার আমি এসেছি।' অশরীরী স্বর বারবার বলতে লাগল।

বিছানার পাশে রাখা দেশলাইয়ের দিকে হাত বাড়ালাম। ওটা যতই আমার কাছে এগিয়ে আসছে ততই ক্ষিপ্রতায় মানুষের আকার নিতে শুরু করেছে। খুব কাছে এসে, আমার চোখের ঠিক সামনে, ওটা বিশ বছর আগেকার ছায়ামূর্তির রূপ নিল। না, কোনওরকম ভুল আমি দেখিনি। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে চিৎকার করে উঠলাম, 'কে তুমি?'

কোনও উত্তর না পেয়ে তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে একটা মোমবাতি ধরালাম।

পরদিন সকালে নিমন্ত্রণকর্তাকে আমার ভাগ্যে কী ঘটেছে জানালাম। উনি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, এবং আমি আসার আগে সপ্তাহ-তিনেকের মধ্যে এ বাড়িতে ঘটে যাওয়া রহস্যময় দুটো ঘটনার বর্ণনা দিলেন।

প্রথম ঘটনার সময় উনি ড্রেসিংরুমে ছিলেন। এমন সময় একজন চাকর এসে খবর দেয় তাঁর এক বন্ধু দেখা করতে এসেছেন। উনি তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে শুরু করেন, এবং প্রথম সারি শেষ করে দ্বিতীয় সারির ধাপে পা দেওয়ার জন্য বাঁক নিতেই উনি লক্ষ করেন, একটা লোক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। আমার বন্ধু তৎক্ষণাৎ তাল সামলাতে না পেরে মুখোমুখি ধাক্কা এড়াতে দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দেন এবং ছুটে আসা লোকটিকে সরাসরি ভেদ করে পার হয়ে যান।

দ্বিতীয় ঘটনার সন্ধ্যায় নৌবাহিনীর এক অফিসার তাঁর বাড়িতে বিলিয়ার্ড খেলতে আসেন এবং সঙ্গে নিজের পোষা কুকুরটিকে নিয়ে আসেন। কুকুরটা টেবিলের নীচে শুয়েছিল। হঠাৎই সে লাফিয়ে উঠে ঘরের কোণে অদৃশ্য কিছুর দিকে তাকিয়ে তারস্বরে ঘেউঘেউ করতে শুরু করে। চিৎকার করতে-করতে ওটার মুখ থেকে ফেনা ঝরতে লাগল, গায়ের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। তাঁরা কুকুরটাকে শান্ত করতে বৃথাই চেষ্টা করতে লাগলেন। টেবিলের নীচ থেকে বেরিয়ে ওটা ঘরের সেই কোণ লক্ষ্য করে হঠাৎ-হঠাৎ ছুটে যেতে লাগল, আবার পিছিয়ে আসতে লাগল। আমার বন্ধু, কিংবা সেই নৌ-অফিসার কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি।

➤ *'হিয়ার আই অ্যাম এগেইন!'*

pathagar.net